রজত জয়ন্তী সংস্করণ

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

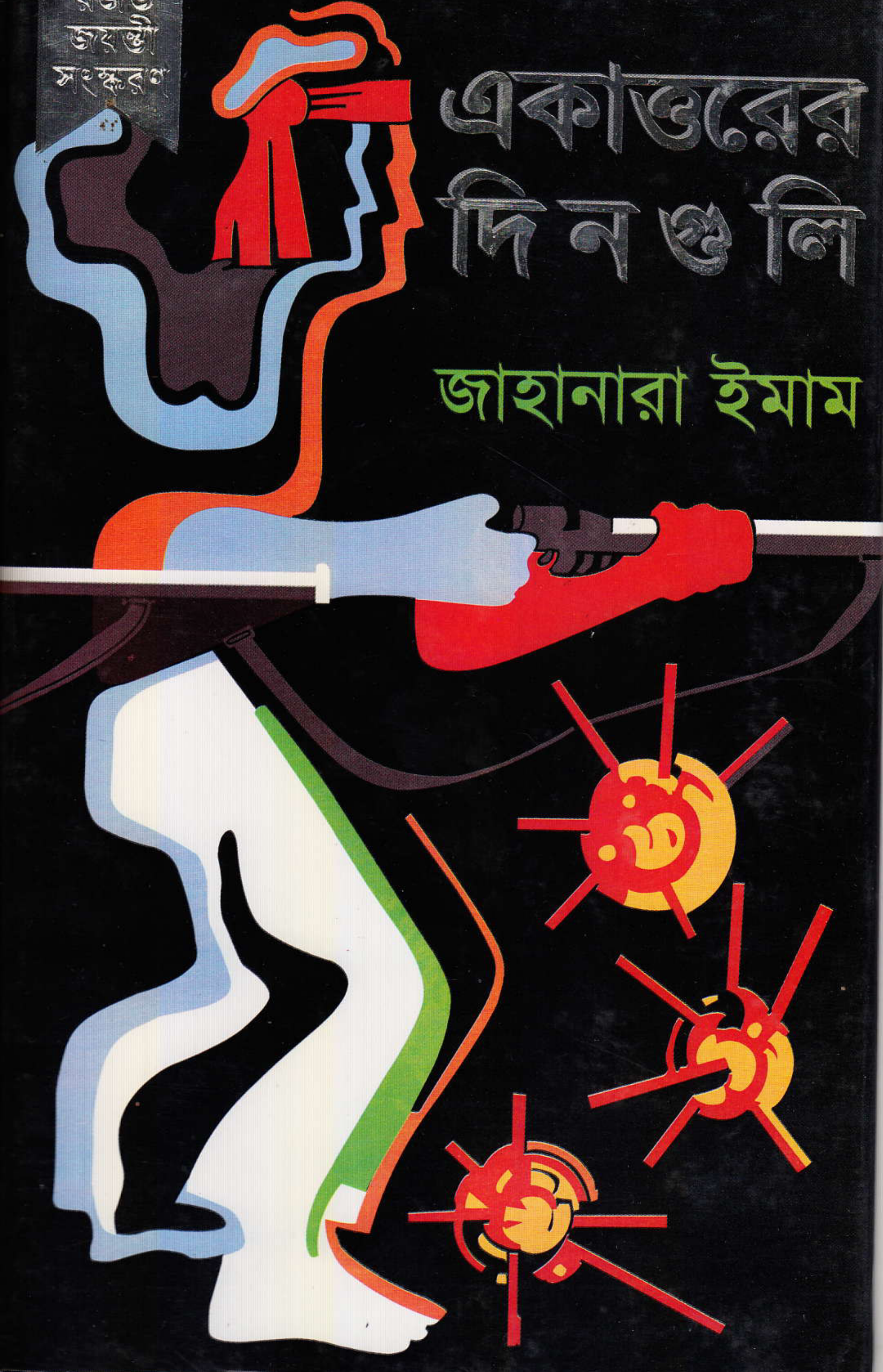

একাত্তরের দিনগুলি ॥ জাহানারা ইমাম

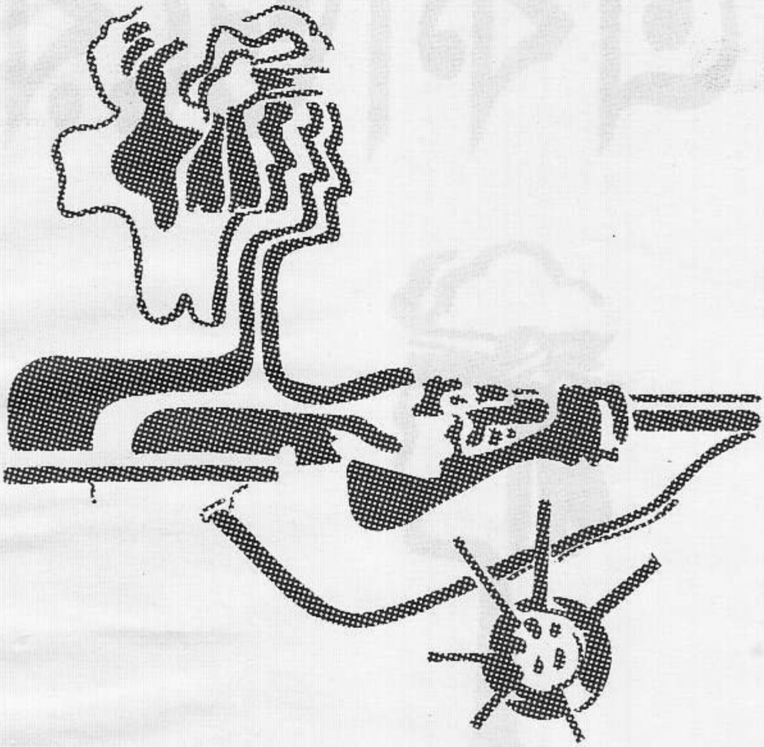

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একাত্তরের

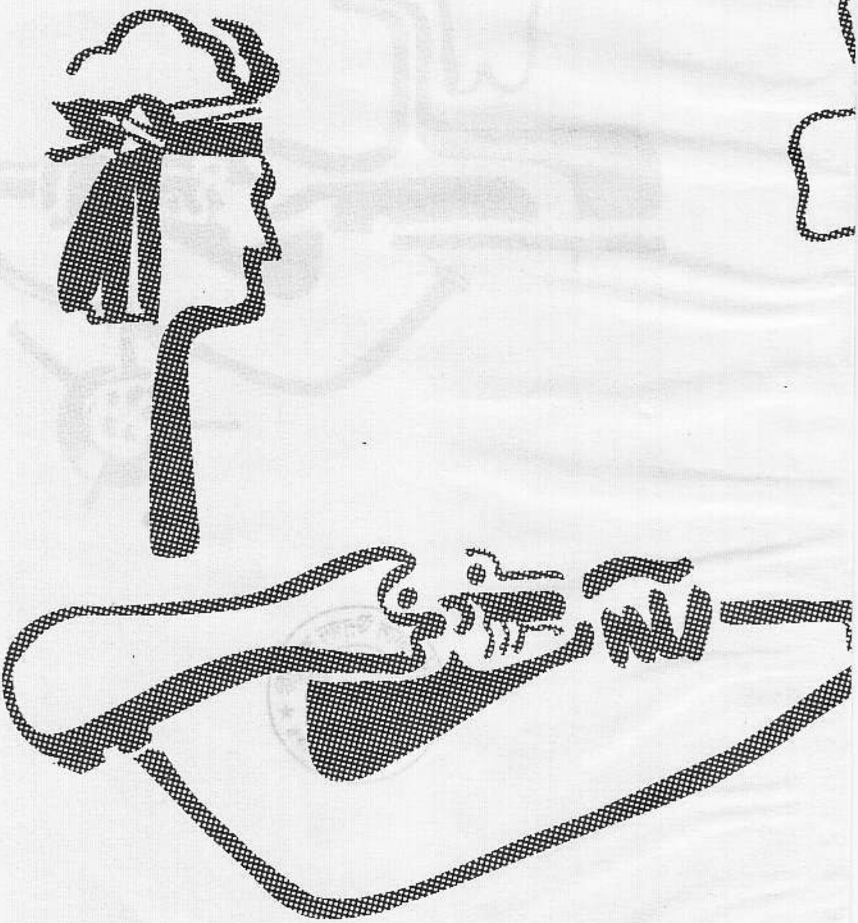

দিনগুলি

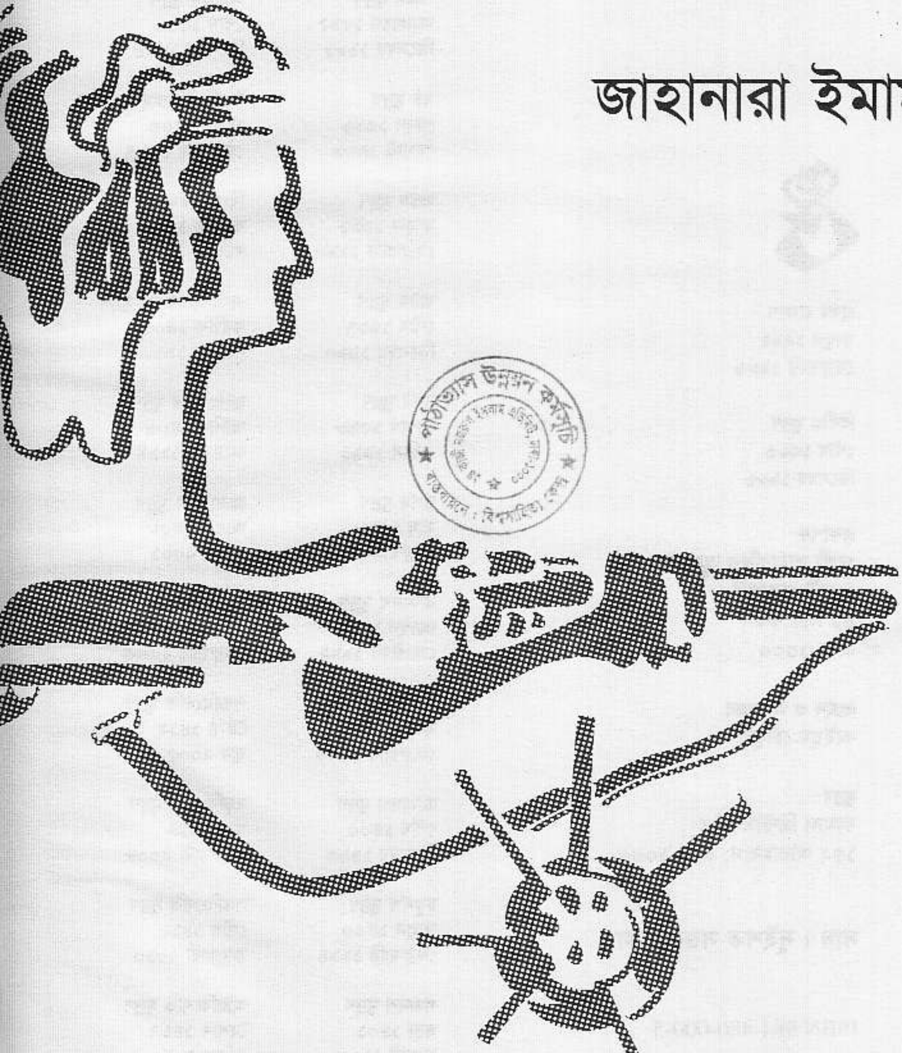

পাঠাগার উন্নয়ন কর্মসূচি

জাহানারা ইমাম

সন্ধানী প্রকাশনী

EKATTORER DINGULEE
(Memoirs of the Days of
Bangladesh Liberation War. 1971)
by Jahanara Imam

গ্রন্থস্বত্ব
'একাত্তরের দিনগুলি' স্মারক ট্রাস্ট

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯২
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৩৯৩
ডিসেম্বর ১৯৮৬

প্রকাশক
গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ
সন্ধানী প্রকাশনী
৪১ নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
কামাল প্রিন্টার্স প্রেস
১৫২ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

দাম : দুইশত সত্তর টাকা

ISBN 984-480-000-5

তৃতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৯৪
এপ্রিল ১৯৮৮

চতুর্থ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৩৯৪
আগস্ট ১৯৮৮

পঞ্চম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫
ডিসেম্বর ১৯৮৮

ষষ্ঠ মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৯৬
আগস্ট ১৯৮৯

সপ্তম মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৩৯৬
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

অষ্টম মুদ্রণ
পৌষ ১৩৯৭
ডিসেম্বর ১৯৯০

নবম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৯৮
এপ্রিল ১৯৯১

দশম মুদ্রণ
মাঘ ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

একাদশ মুদ্রণ
আশ্বিন ১৩৯৯
সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দ্বাদশ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৩৯৯
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

ত্রয়োদশ মুদ্রণ
পৌষ ১৪০০
ডিসেম্বর ১৯৯৩

চতুর্দশ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪০০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

পঞ্চদশ মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪০১
আগস্ট ১৯৯৪

ষোড়শ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪০১
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

সপ্তদশ মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৪০২
আগস্ট ১৯৯৫

অষ্টাদশ মুদ্রণ
পৌষ ১৪০৩
ডিসেম্বর ১৯৯৬

উনবিংশতিতম মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪০৩
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

বিংশতিতম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪০৪
নভেম্বর ১৯৯৭

একবিংশতিতম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪০৫
নভেম্বর ১৯৯৮

দ্বাবিংশতম মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪০৬
অক্টোবর ১৯৯৯

ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ
আষাঢ় ১৪০৮
জুলাই ২০০১

চতুর্বিংশ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪০৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

পঞ্চবিংশতি মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১২
জুন ২০০৫

ষড়বিংশতি মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৪
ফেব্রুয়ারী ২০০৮

সপ্তবিংশতি মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৬
জানুয়ারী ২০১০

অষ্টাবিংশতি মুদ্রণ
বৈশাখ ১৪১৭
এপ্রিল ২০১০

মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও জীবিত গেরিলার উদ্দেশে

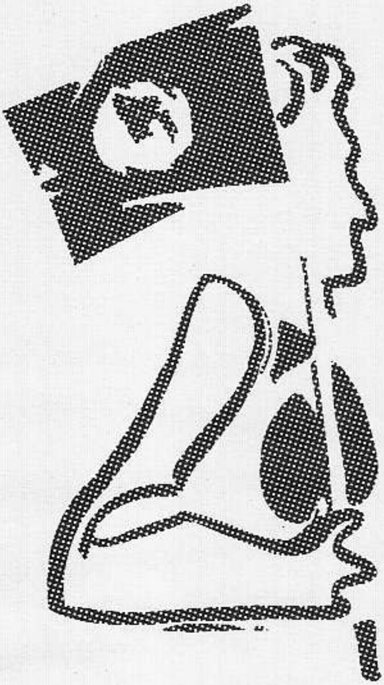

মার্চ

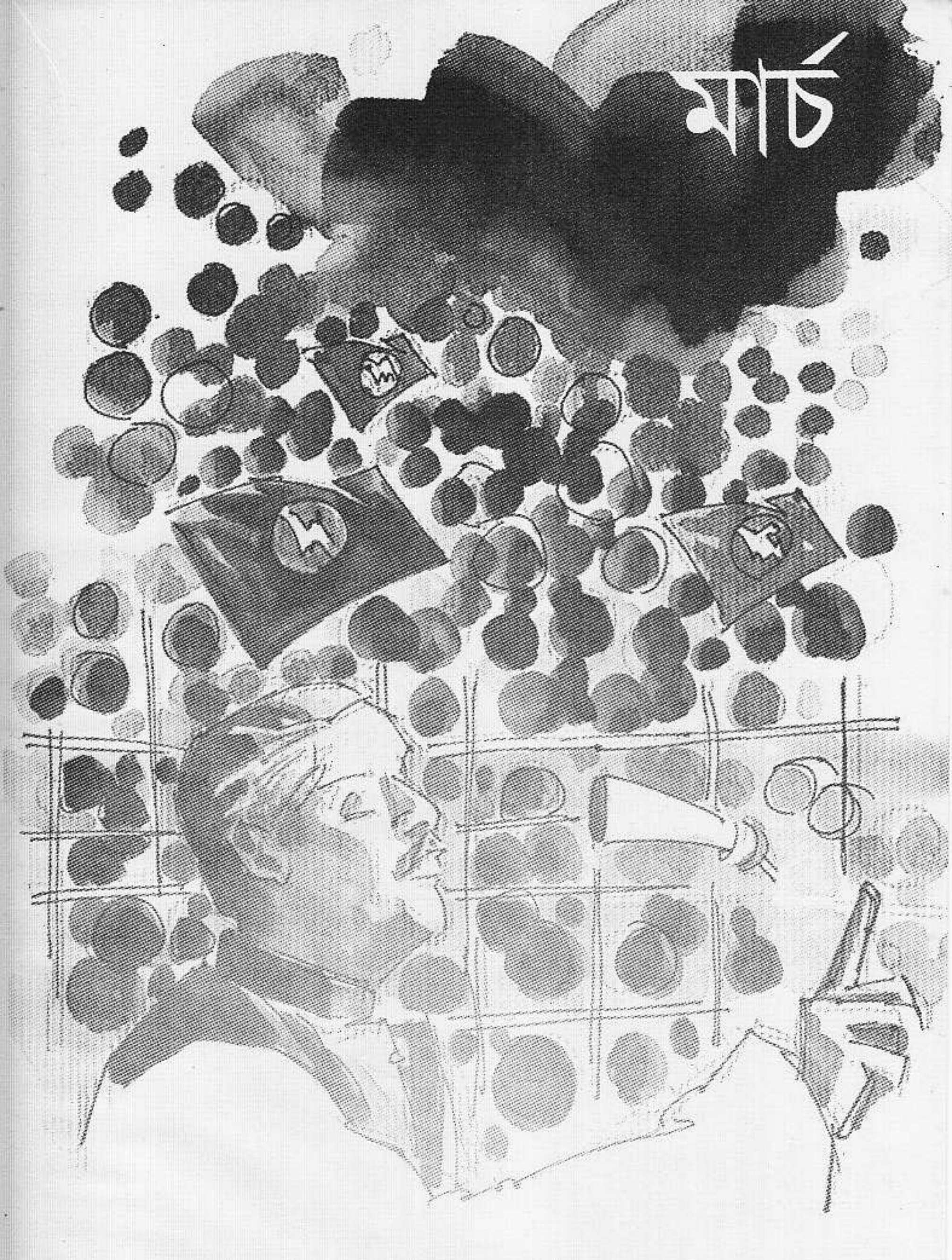

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

১ মার্চ
সোমবার ১৯৭১

আজ বিকেলে রুমী ক্রিকেট খেলা দেখে তার বন্ধুদের বাসায় নিয়ে আসবে হ্যামবার্গার খাওয়ানোর জন্য।

গোসল সেরে বারোটার দিকে বেরোলাম জিন্না এভিনিউয়ের পূর্ণিমা স্ন্যাকবার থেকে ডিনার-রোল কিনে আনার জন্য।

দু'ডজন ডিনার-রোল কিনে সোজা চলে এলাম বাড়ির কাছে নিউ মার্কেটে। গত দুই সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রায়ই বিভিন্ন দোকানে খোঁজ করি পূর্ব পাকিস্তানের তৈরি সাবান, তেল, টুথপেস্ট, বাসন-মাজা পাউডার; কিন্তু পাই না। একমাত্র ইভা বাসন-মাজা পাউডারটাই এখানকার তৈরি—বলা যেতে পারে সবে ধন নীলমণি। পিয়া নামের এক ঢাকাই টুথপেস্ট বাজারে বের হবো-হবো করে এখনও বের হতে পারছে না, আল্লাই মালুম কি কঠিন বাধার জন্য!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা। দরজা খুলে দিয়েই বারেক জানাল : 'সাবরে ফুন করেন আম্মা। খাবার-দাবার কিন্যা রাখতে কইছে। কই জানি গুণ্ডগোল লাগছে।'

গণ্ডগোল ? তা লাগতেই পারে। গত দু'মাস থেকেই তো ঢাকা তপ্ত কড়াই হয়ে রয়েছে। অফিসে ফোন করতেই শরীফ জানাল : 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেলা একটার সময় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শহরে সব জায়গায় হৈচৈ পড়ে গেছে। লোকেরা দলে দলে অফিস-আদালত ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানকার সব দর্শক শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এখানে মতিঝিলে তো দারুণ হৈচৈ হচ্ছে চারদিকে। কেন, নিউ মার্কেটের দিকে কিছু দেখ নি?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'ঐ সময়টা আমি পেছন দিকের দোকানগুলোয় ছিলাম, ঠিক খেয়াল করি নি। ওখানকার লোকেরা হয়ত এখনো শুনে ওঠে নি।' তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুমী-জামী যে স্টেডিয়ামে!'

শরীফ বলল, 'চিন্তা করো না। ওরা বেরিয়েই আমার অফিসে এসেছিল। জামীকে এখানে রেখে রুমী ওর বন্ধুদের কাছে গেছে। শোনো, বেশ গোলমাল হবে। এখানে অল-রেডি মিছিল বেরিয়ে গেছে। বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়ামের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খবর পেলাম। গোলমাল বাড়লে কারফিউ দিয়ে দিতে পারে। ঘরে খাবার-দাবার আছে কিছু? না থাকলে এক্ষুণি কিনে রাখ।'

তক্ষুণি আবার বেরোলাম। এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি—দু'পাশের ছোট ছোট দোকানগুলোতে লোকজনের অস্বাভাবিক ভিড়। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে কেনাকাটা করছে। দোকানীরা দিয়ে সারতে পারছে না। আমিও দুতিনটে দোকান ঘুরে, ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করে, টোস্ট বিস্কুট, চানাচুর, দেশলাই, মোমবাতি, গুঁড়ো দুধ, ব্যাটারি এসব কিনলাম। বাড়িতে এসেই বারেকের হাতে খালি কেরোসিনের টিন আর সুবহানের হাতে খালি বস্তা ধরিয়ে পাঠিয়ে দিলাম কেরোসিন আর চাল কেনার জন্য।

এইসব করতে করতে শরীফ আর জামী এসে গেল অফিস থেকে। প্রায় তিনটে বাজে। টেবিলে বেড়ে রাখা খাবারের ঢাকনা তুলে খেতে বসে জিগ্যেস করলাম, 'আর খবর কি?'

'শেখ মুজিব হোটেল পূর্বাণীতে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। আসার সময় দেখি হোটেলের সামনে তিনটে রাস্তাই একেবারে মেইন রোড পর্যন্ত লোকে ঠাসা। সবার হাতে লোহার রড আর বাঁশে লাঠি। অফিস থেকে বেরিয়ে দৈনিক পাকিস্তানের দিক দিয়ে গাড়ি নিতে পারলাম না ভিড়ের চোটে। শেষে গভর্নমেন্ট হাউসের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গুলিস্তান ঘুরে এসেছি। রুমী এখনো ফেরেনি?'

এবার আমিই শান্তস্বরে বললাম, 'এই হৈচৈতে কোথাও আটকে গেছে মনে হয়। খেলার শেষে বন্ধুদের নিয়ে হ্যামবার্গার খেতে আসার কথা। এখন খেলা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, হয়ত আগেই আসবে।'

চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল। রুমীর দেখা নেই। সাড়ে চারটের মধ্যে দুই ডজন হ্যামবার্গার বানিয়ে আভ্‌নয়ে মৃদু গরমে রেখে দিয়েছি।

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত এসে গেল। রুমী এল আটটারও পরে। একা। বিকেল-সন্ধ্যে বাগানে পায়চারি করতে করতে আমার রাগ উপে উদ্বেগ দানা বাঁধছিল মনে। রুমীকে দেখেই রাগ আবার ঝাঁপিয়ে এল সামনে। রুমী আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে, মুখে হৃদয়-গলানো হাসি ভাসিয়ে বলল, 'আগে শোনো তো আমার কথা। কত কি যে ঘটে গেল একবেলায়। সবকিছুর স্কুপ-নিউজ এখুনি দিতে পারি তোমায়। নাকি, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে খবর কাগজের জন্য?'

আমি হাসি চেপে ভ্রূকুটি বজায় রেখে বললাম, 'কি তোমার স্কুপ-নিউজ, শুনি?'

'অনেক অনেক। একেবারে গোড়া থেকে বলি। একটার সময় স্টেডিয়ামে ছিলাম। অনেক দর্শকই সঙ্গে রেডিও নিয়ে গিয়েছিল। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা যেই না কানে যাওয়া, অমনি কি যে শোরগোল লেগে গেল চারদিকে। মাঠ-ভর্তি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক—সবাই জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি জামীকে আব্বুর অফিসে রেখে ছুটলাম ইউনিভার্সিটিতে। ওখানেও একই ঘটনা। রেডিও'র ঘোষণা শোনামাত্রই ছেলেরা সবাই দলে দলে ক্লাস থেকে, হল থেকে বেরিয়ে বটতলায় জড়ো হতে শুরু করেছে। আমি যখন পৌঁছলাম, তখনো ছেলেরা পিলপিল করে আসছে চারদিক থেকে। মনে হল সমুদ্রের একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বটতলায়। তখুনি ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা ঠিক করল বিকেল তিনটেয় পল্টন ময়দানে মিটিং করতে হবে।'

'পল্টনে মিটিং হল? দেড়টা-দুটোয় বলল আর তিনটেয় মিটিং হল?'

'হল মানে? সে তুমি না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না আম্মা। এ্যা-তো লোক! এ্যাতো লো-ক! উঃ আল্লারে। কিন্তু মিটিংয়েরও আগে তো পূর্বাণীতে শেখ মুজিব প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। উনি অবশ্য সকাল থেকেই ওখানে ওঁদের দলের পার্লামেন্টারি বৈঠকে ছিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণার এক ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক বাঁশের লাঠি আর লোহার রড ঘাড়ে নিয়ে পূর্বাণীর সামনে সবগুলো রাস্তা জ্যাম করে ফেলল। সেকি শ্লোগান। পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ আর জিন্নার ছবিও পুড়িয়েছে। শেখ তক্ষুণি সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা দিলেন হরতালের আর ৭ মার্চ রেসকোর্সে মিটিংয়ের।'

মনটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে। শরীফও বলেছে পূর্বাণীর সামনে ভিড়ের কথা। তবু মুখের বেজার ভাবটা বজায় রেখে বললাম, 'এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দু'ডজন হ্যামবার্গার ঠিকই বানালাম। কিন্তু তোদের কারো মনে নেই সে কথা।'

'মনে থাকার যো আছে আম্মা? কি যে খই ফুটছে সারা শহরে! গুলিস্থানের মোড়ে কামানের ওপর দাঁড়িয়ে মতিয়া চৌধুরী যা একখানা আগুন ঝরানো বক্তৃতা দিলেন না, শুনলে তোমারও গায়ে হলকা লাগত। সাধে কি আর ওঁকে সবাই অগ্নিকন্যা বলে।'

আমি আবার ক্ষেপে উঠলাম। 'এইবার গুল মারছিস। তুই একা এতোগুলো জায়গায় এক বিকেলে গেলি কেমন করে?'

রুমী খুব বেশি রকম অবাক হয়ে বলল, 'খুবই সিম্পল। বন্ধুর হোন্ডার পেছনে চড়ে সবখানে টহল দিয়েছি। আমরা কি এক জায়গায় বসে নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি নাকি? স্টেডিয়াম থেকে ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে পূর্বাণী, পূর্বাণী থেকে গুলিস্তান মোড়ের কামান, সেখান থেকে পল্টন—এমনি করে চরকিঘোরা ঘুরেছি না?'

'সারাদিন খাওয়া হয়নি নিশ্চয়?'

'কেই-বা খেয়েছে? ঐ একটার আগে যে যা খেয়েছে চা-বিস্কুট—ব্যস। আর খাওয়া-দাওয়া নেই। বাঁশের লাঠি, লোহার রড—যে যা পেয়েছে, একেকখানা ঘাড়ে নিয়ে সবাই রাস্তায় নেমে গেছে। তবে এতক্ষণে টের পাচ্ছি সারাদিন খাওয়া হয়নি।'

'চল চল, আগে খেতে বস। খাওয়ার পর বাকিটা শুনব।'

'ঐ হ্যামবার্গারই দাও আমায়। নষ্ট করে কি লাভ? তোমরাও সবাই ঐ দিয়েই রাতের খাওয়া সেরে ফেল।'

'গুষ্ঠিসুদ্ধ খেয়েও কি সব ফুরোনো যাবে?'

'চিন্তা করো না। আমি একাই ছয়টা খেয়ে ফেলব।'

শেখ মুজিব আগামীকাল ঢাকা শহরে, আর পরশুদিন সারাদেশে হরতাল ডেকেছেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের ঘোষণাও দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের কি পরিণাম হতে পারে, তা নিয়ে বহু রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল খাবার টেবিলে বসে। রাত প্রায় বারোটার দিকে শুতে গিয়েও ঘুম এল না। অনেক দূর থেকে শ্লো-াগানের শব্দ আসছে। বোঝা যাচ্ছে এত রাতেও অনেক রাস্তায় লোকেরা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে। কেবল জয় বাংলা ছাড়া অন্য শ্লোগানের কথা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু তবু ঐ সম্মিলিত শত-কণ্ঠের গর্জন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে এসে পড়েছে শ্রুতির কিনারে। শিরশির করে উঠছে সারা শরীর। গভীর রাতে আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে মনে হল যেন গুলির শব্দও শুনলাম।

২ মার্চ
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ হরতাল। সকালে নাশতা খাওয়ার পর সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের মাঝখান দিয়ে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম। একটাও গাড়ি, রিকশা, স্কুটার এমনকি সাইকেলও নেই আজ রাস্তায়। রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে যেন আমার বাড়ির উঠোন! হরতালের দিনে ফাঁকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটা আমাদের মত আরো অনেকেরই বিলাস মনে হয়। পাড়ার অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটের দিকে চলে গেলাম। কি আশ্চর্য! আজকের কাঁচাবাজারও বসে নি। চিরকাল দেখে আসছি হরতাল হলেও কাঁচা বাজারটা অন্তত বসে। আজ তাও বসে নি। শেখ মুজিবরসহ সবগুলো ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে সর্বত্র যানবাহন, হাটবাজার, অফিস-আদালত ও কলকারখানায় পূর্ণ হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে, সবাই সেটা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েই আজ হরতাল করছে।

নিউ মার্কেটের দিক থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে আবার উল্টো দিকে গেলাম

হাতিরপুল পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে কিটিও হাঁটছে। রাস্তায় লোকেরা ওর সোনালি চুলের দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। ভাবছি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই।

বসার ঘরে ঢুকে রুমী 'আরেক কাপ চা হোক।' বলেই হাঁক দিল, 'সুবহা-ন।'

সুবহান এ ঘরে আসতেই আমি বললাম, 'পাঁচ কাপ চা দিয়ে যাও।'

সুবহান চা বানিয়ে এনে সেন্টার টেবিলে ট্রে-টা রেখে রুমীকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভাইয়া, তিনটার সুমায় পল্টনের মিটিংয়ে যাইবেন?'

রুমী গম্ভীর গলায় শুধোল, 'কেন, তুমি যেতে চাও আমাদের সঙ্গে?'

সুবহান কাঁচমাচু মুখে বলল, 'আমায় যুদি পারমিশুন দ্যান।'

আমি হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললাম, 'তাড়াতাড়ি রান্না সারতে পারলে যেতে পারবে।'

সুবহান কৃতার্থের হাসি হেসে প্রায় দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

রুমী নিচু গলায় বলল, 'ওর মধ্যে কিন্তু বেশ রাজনৈতিক চেতনা আছে।'

চা খেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আম্মা একটু বটতলা ঘুরে আসি। ছাত্রলীগ আর ডাকসু মিটিং ডেকেছে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এখন আর হেঁটে হেঁটে অদ্দূর যাবার দরকারটা কি? তুই তো কোনো দলের মেম্বার নস। তোর এত সব মিটিংয়ে যাওয়া কেন?'

রুমী বলল, 'এখন কি আর ব্যাপারটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে নাকি আম্মা? এখন তো-এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে।'

এই এক স্বভাব রুমী। কথায় কথায় ইংরেজি-বাংলা কত যে কবিতার উদ্ধৃতি দিতে পারে ও। মনেও থাকে বটে। আমি নাচার হয়ে বললাম, 'যাবি যা। তবে দেরি করিস না। যা করবি, কর, কিন্তু ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে। বুঝলি?'

'আচ্ছা আম্মা'। বলে রুমি বেরিয়ে গেল।

আমি খবর কাগজের দিকে চোখ নামালাম। ঢাকায় যতগুলো ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক দল আছে সবাই আজ মিটিং ডেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে এগারোটায় বটতলায়, তিনটেয় পল্টন ময়দানে। ন্যাপ এগারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে, বিকেলে পল্টনে। ন্যাপের কর্মসূচীর সঙ্গে সমর্থনে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, কৃষক সমিতির। বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে—বিকেল সাড়ে তিনটেয়। নবগঠিত ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের সভাও ঐ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণেই—বিকেল চারটেয়।

সব দলই মিটিং শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে পূর্ব পাকিস্তানে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছে।

তিনটের সময় রুমী, জামী, শরীফ, সুবহান—সবাই চলল পল্টন ময়দানের দিকে। রিকশা করে গেল। গাড়ি নিল না। অত ভিড়ে গাড়ি নিয়ে আরামের চেয়ে ঝামেলাই বেশি। কিটি জিজ্ঞেস করল, সে মিটিংয়ে যেতে পারে কি না। আমি সকালের কথা ভেবে একটু ইতস্তত করে বললাম, 'তোমার না যাওয়াই ভালো। ভিড়ের মধ্যে কখন না জানি চ্যাপ্টা হয়ে যাও। দেখ না, আমি যাচ্ছি না।' কিটি বুদ্ধিমতী। আসল কথাটা বুঝে মুখ কালো করে নিজের ঘরে চলে গেল।

বারেকও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা ঘুম থেকে উঠবেন চারটেয়, তাঁকে ওঠানো, মুখ ধোয়ানো—আমি যেতে দিলাম না। তাছাড়া একটু মায়ের বাসায় যাওয়া দরকার।

সকালে হেঁটে পারব না বলে যাইনি। দুটোর পর রিকশা চলছে।

সাড়ে চারটেয় বাবাকে চা-নাশতা খাইয়ে তাঁর সঙ্গে খানিক কথা বলে বারেককে কাছে বসিয়ে রেখে আমি গেলাম মা'র বাসায়—ধানমণ্ডি ছয় নম্বর রাস্তায়।

৩ মার্চ
বুধবার ১৯৭১

কালরাতে একদম ঘুম হয় নি। রাত আটটায় হঠাৎ কারফিউ। সারা দিন ধরে যত মিটিং আর মিটিং—শেষে লাঠিসোঁটা-কাঠ-রড নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সন্ধ্যের পরেও তার বিরাম ছিল না। আরো বেরিয়েছিল মশাল মিছিল। রেডিওতে কারফিউয়ের ঘোষণা আমরা শুনিনি। তাই বুঝিনি কারফিউ ঘোষণার প্রতিবাদেই বেশি বেশি শ্লোগান। ভেবেছি সারা দিনের জের ওটা। কিন্তু হঠাৎ সাইরেনের বিকট আওয়াজে চমকে উঠেছি। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? একে-ওকে ফোন করে জানতে পারলাম ওটা কারফিউ জারির সাইরেন।

রাত এগারোটার দিকে মাইকেও কারফিউ জারির ঘোষণা দূর থেকে কানে এল। শব্দ শুনে মনে হল, বলাকা নিউ মার্কেটের রাস্তায় এবং আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে ইকবাল হলের সামনের রাস্তায়। তার পরপরই বহু কণ্ঠের শে-াগান আরো জোরে শোনা যেতে লাগল। তার মানে কারফিউ অগ্রাহ্য করে মিছিল আর শে-াগান। কেমন যেন অস্থির লাগতে লাগল। ভাবলাম, কয়েক জায়গায় ফোন করি অবস্থা জানবার জন্য—গুলশানে রেবাকে, মদনমোহন বসাক রোডে মনোয়ারাকে আর ইন্দিরা রোডে কামালকে।

রেবা বলল, 'এখানে রাস্ণতায় কোনো মিছিল নেই; কিন্তু দূর থেকে শে-াগানের শব্দ পাচ্ছি, আমাদের পেছন দিকটাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া তো।'

মনোয়ারা আমার ফোন পেয়ে কেঁদে ফেলল, 'কি যে হচ্ছে আপা! কেউ কারফিউ মানছে না, দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে গেছে, ব্যারিকেড বানাচ্ছে, শ্লোগান দিচ্ছে। পুলিশও গুলি করছে। গুলি খেয়ে লোকে আরো ক্ষেপে উঠছে, দ্বিগুণ জোরে শ্লোগান দিচ্ছে। আমার ভাইটাও ওর মধ্যে আছে। জানি না বেঁচে আছে, না গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেছে। কি হবে আপা?'

মনোয়ারার কান্না শুনে মনটা বিকল হয়ে গেল। আর কাউকে ফোন করতে ইচ্ছে হল না। সারারাতই কানে এল শ্লোগানের সম্মিলিত গর্জন।

আজ সকালে খবর কাগজে গত রাতের মিছিল ও গুলির খবর বিস্তারিত পড়লাম। স্টেডিয়াম, নবাবপুর, টয়েনবী সার্কুলার রোড, ভজহরি সাহা স্ট্রিট, গ্রীন রোড, কাঁঠালবাগান, কলাবাগন, নিউ মার্কেট, ফার্মগেট—ঢাকার প্রায় সব এলাকাতেই কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে, বহুলোক মারা গেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

কাগজের আরেকটা খবর দেখলাম—বক্স করে দেওয়া হয়েছে:

১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারি।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোঃ ইয়াকুব খান গতরাতে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশ বলে পত্রপত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের

সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছেন। আদেশ লঙ্ঘনে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

খবরগুলো পড়ছি আর বুকের ভেতর কেমন যেন দম আটকানো ভাব হচ্ছে। ভাবলাম মনোয়ারাকে ফোন করি—খবর নিই ওর ভাইটা কেমন আছে। বাড়ি ফিরেছে কি না। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েও ফোন তুলতে পারলাম না।

রুমীকে নিয়ে আমার হয়েছে মহা উদ্বেগ। সারাদিন টো-টো করে সারা শহর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে কি হয়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাসায় ফিস্ট লাগাতে বলছি, আগে সব সময় লুফে নিয়েছে, এখন নাকি সময় নেই।

আজকেও প্রায় সারাদিনই মিটিং-মিছিল চলছে। আগের রাতে গুলিতে নিহত আটটি লাশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরেছে, মিছিল শেষে শহীদ মিনারে লাশ রেখে সকলে সমস্বরে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ের শপথ নিয়েছে।

বিকেলে পল্টন ময়দানের জনসভাতেও এই লাশগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বিশাল জনসমুদ্র শহীদদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার শপথ নিয়েছে। সভায় শেখ মুজিব সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাঙালি জাতি এক পয়সাও ট্যাক্স-খাজনা দেবে না। তিনি সরকারকে বলেছেন সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে আর বাঙালি জনগণকে বলেছেন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে অহিংস অসহযোগিতা চালিয়ে যেতে।

সন্ধ্যার পর রুমী বাড়ি ফিরলে তার মুখে এসব শুনলাম। আরো শুনলাম এক নতুন পতাকার কথা। গতকালই নাকি বটতলায় ছাত্রদের জনসভায় এ পতাকা প্রথম দেখানো হয়েছিল। আজ পল্টনের জনসভায় শেখের উপস্থিতিতে প্রথমে 'আমার সোনা বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা গাওয়া হল, তারপর স্বাধীন বাংলার এই নতুন পতাকা উত্তোলন করা হল।

আমি শিহরিত হয়ে বললাম, 'স্বাধীন বাংলার পতাকা? বলিস কি রে? কেমন দেখতে?

'দাঁড়াও, এঁকে দেখাই।' বলে, একখণ্ড কাগজ ও কয়েকটা রঙিন পেনসিল এনে রুমী স্বাধীন বাংলার পতাকা আঁকতে বসল : সবুজের ওপর টকটকে লাল গোলাকার সূর্য, তার মধ্যে হলুদ রঙে পূর্ব বাংলার ম্যাপ।

আমি বললাম, 'এ ক'দিন তো স্বাধিকারের কথাই শুনছি, নির্বাচিত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাই শুনছি, এর মধ্যে স্বাধীন বাংলার কথা কখন উঠল?'

'তুমি কোন খবর রাখো না আম্মা। স্বাধীন বাংলার দাবির কথা তো অনেক অনেক পুরনো ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে বহুদিন থেকেই গুমরাচ্ছিল। গত বছর নভেম্বরের সাইক্লোনের পরে তা ফেটে পড়েছে। তোমার মনে নেই মওলানা ভাসানী ১৮ নভেম্বর দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যেতে চাইলে তাঁর জাহাজ আটকে দেয়া হয়? সরকার অবশ্য পরে তাঁকে যেতে দেয় কিন্তু এ নিয়ে কি হৈচৈটা হয়, কাগজে পড়নি? তারপরেই তো, ৪ ডিসেম্বরের সেই যে মিটিং ন্যাপ, জাতীয় লীগ আরো কি কি দল যেন একত্রে মিটিং করল, ভাসানী সেখানেই পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান। তারপর এখন আওয়ামী লীগের উগ্র জাতীয়তাবাদী সেকশনের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার দাবি উঠেছে। চার খলিফা খুব চাপ দিচ্ছে শেখকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার জন্য।'

'জান না বুঝি, আ. স. ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন আর নূরে আলম সিদ্দিকী—এই চার ছাত্রনেতাকে আমরা সবাই চার খলিফা বলে ডাকি। শাহজাহান সিরাজই তো আজ পল্টন সভায় পতাকাটা তুলেছে।'

'শেখ কি বললেন?'

'কিছুই বললেন না, তবে খুব যে খুশিও হননি, মুখ দেখে বোঝা গেল।'

'ততো হবেনই না। এই মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়াটা ভীষণ রিস্কি ব্যাপার না?'

'রিস্কি নিশ্চয়। কিন্তু আম্মা, ঘটনার একটা নিজস্ব গতি আছে না? জলপ্রপাতের মতো। উঁচু পাহাড় থেকে যখন গড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে রুখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই। আমাদের দেশের জনতা এখন ঐ জলপ্রপাতের মতো একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে অত্যন্ত তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে, একে আর বোধ হয় রোখা যাবে না।'

৪ মার্চ
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গতকাল রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্ষুব্ধ জনতা আবার কারফিউ লঙ্ঘন করে মিছিল বের করেছে, গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে রাজপথ, জনপদ প্রকম্পিত করেছে এবং অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গুলি খেয়ে কালো পিচের রাস্তা রাঙা করেছে।

আজো ছটা-দুটো হরতাল।

গত তিনদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মিটিং মিছিল করে করে রুমী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে বাড়িতেই আছে। দেখে আমার প্রাণে শান্তি। চিংকু এসেছে। দু'জনে কথা বলছে খাবার টেবিলে বসে। খাবার টেবিলটাই রুমীর পছন্দ আড্ডা দেবার জন্য। বলে বলেও ওকে বসার ঘরের সোফায় বসানো যায় না।

কয়েক মাস আগে ওয়েটিং ফর গোডোতে অভিনয় করে চিংকু খুব নাম করেছে। হোটেল ইন্টারকনের সাউথ বলরুমে নাটকটা অভিনীত হয়েছিল।

মিলিটারির গুলিতে নিহত শহীদদের জন্য আজ গায়েবানা জানাজা বায়তুল মোকাররমে। তারপর শোক মিছিল।

চিংকু বারোটার দিকে চলে গেল। রুমী আর শরীফ গোসল সেরে হালকা স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ সারল। হেঁটে হেঁটে বায়তুল মোকাররমে যাবে, তাই এইরকম আধপেটা খাওয়া।

বিকেলে রিকশা নিয়ে আমি আর জামী বেরোলাম মালিবাগের মোড়ে ট্রাফিক আইল্যান্ডে ফারুক ইকবালের কবর দেখতে। দুই তারিখে বিকেলে রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিল ফারুক ইকবাল অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। সেই সময় মিলিটারি পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সে। ক্রুদ্ধ ছাত্রজনতা এই মোড়ের ট্রাফিক আইল্যান্ডের ওপরই তাকে কবর দিয়েছে। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড আছে বলেই গাড়ি নেইনি। একেকটা ব্যারিকেডের সামনে এসে রিকশা ছেড়ে দিই। ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে হাঁটা রাস্তায় ওপাশে গিয়ে আরেকটা রিকশা নিই। এদিকটার কয়েকটা ব্যারিকেড ভারি চমৎকার জিনিস দিয়ে করা হয়েছে—রেলগাড়ির বগি। জামী বলল, দুই তারিখের বিকেলে মালিবাগ লেভেল ক্রসিংয়ে একটা রেলগাড়ি আটক করে সবাই। তারপর একেকটা বগি টেনে টেনে ব্যারিকেড দিয়েছে তিন-চার জায়গায়।

ফারুকের কবরের কাছে এসে দেখি কবরটা ঘিরে দড়ির রেলিং। আগরবাতি জ্বলছে। চারপাশে অনেক লোক। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কয়েকজন লোক মোমবাতি জ্বেলে দিল। দু'জন মৌলবী সাহেব কোরান শরীফ পড়ছিলেন, একজন লোক দুটো বড় সাইজের মোমবাতি জ্বেলে ওঁদের সামনে বসিয়ে দিল।

আজ রাতে কারফিউ নেই।

৫ মার্চ
শুক্রবার ১৯৭১

আজো ছ'টা-দুটো হরতাল।

শেখ মুজিব হরতালের দিলোগুলোতে বেতন পাওয়ার সুবিধের জন্য এবং অতি জরুরী কাজকর্ম চালানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি সব অফিস দুপুর আড়াইটে থেকে চারটে পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। রেশন দোকানও ঐ একই সময়ে খোলা।

ব্যাঙ্কও তাই। আড়াইটে-চারটের মধ্যে টাকা তোলা যাবে। তবে দেড় হাজার টাকার বেশি নয়। বিকেলে ব্যাঙ্ক খোলা—ভাবতে মজাই লাগছে। শেখের একেকটা নির্দেশে সব কেমন ওলটপালট খেয়ে যাচ্ছে।

জরুরি সার্ভিস হিসেবে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ি, সংবাদপত্র ও তাদের গাড়ি, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, দমকল, মেথর ও আবর্জনা ফেলা ট্রাক—এগুলোকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ মসজিদ ও মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা। গোসল সেরে পৌনে একটার সময় শরীফ, রুমী, জামী, সুবহান—সবাই পাড়ার এরোপ্লেন মসজিদে গেল।

তারপর আড়াইটের সময় খেয়ে দেয়ে শরীফ অফিসে রওনা দিল।

আজ বিকেল চারটের সময় লেখক সংঘের মিটিং তোপখানা রোডে। মিটিং শেষে সেখান থেকে মিছিল করে শহীদ মিনারে আসা হবে। আমি সাড়ে পাঁচটা-ছটা নাগাদ সোজা শহীদ মিনারেই যাব। হাঁটুতে বাতের জন্য বেশি হাঁটতে পারি না।

ক'দিন হট্টগোলে কিটিকে বাংলা পড়ানো হয় নি। আজ শরীফ চলে যাবার পর কিটিকে নিয়ে বসলাম। কিটি আমেরিকান মেয়ে—একটা স্কলারশিপ নিয়ে এ দেশে এসেছে ডিসেম্বরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে মুনীর চৌধুরীর আন্ডারে 'সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার মান নির্ধারণ' বিষয়ে গবেষণা করার জন্য। ন'টা ভাষা জানে। বাংলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতে পারে। তাড়াতাড়ি বাংলা শেখার জন্য কোনো বাঙালি পরিবারে বাস করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল কিটি। তাই মুনীর স্যার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ওর জন্য একটা বাঙালি পরিবার খুঁজে দিতে। তিন-চার জায়গায় চেষ্টা করে না পেয়ে শেষে নিজের বাড়িতেই রেখেছি ওকে।

সপ্তাহে তিন দিন করে বাংলা পড়াই কিটিকে। বাড়ির অন্য সবার সঙ্গে সর্বক্ষণ বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে সে। আজ কিন্তু ওর বাংলা পড়ার বা বাংলায় কথা বলার কোনো চেষ্টা দেখলাম না। সরাসরি ইংরেজিতে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা আম্মা, আমি যখন প্রথম আসি, তখন রাস্তায় আমাকে দেখলে লোকে উৎসুক হয়ে উঠত, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইত। আর এখন কেন দেখলে বিরক্ত হয়? রেগে রেগে কি যেন বলে।'

আমি বিপদে পড়লাম। মেয়েটি খুব আবেগপ্রবণ এবং মেজাজীও। একটুক্ষণ চুপ

করে থেকে মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে তোমাকে এ দেশের গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের ইতিহাস ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা ভালো করে বোঝাতে হবে।'

মিটিংয়ে আর যাওয়া হল না। কিটিকে বোঝাতে বোঝাতে সন্ধ্যে কাবার হয়ে গেল।

৬ মার্চ
শনিবার ১৯৭১

ছ'টা-দুটো হরতাল চলছেই।

শরীফ আর রুমী আজ সকালে হাঁটতে হাঁটতে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে এল। আমি আর জামী বাদ গেলাম যথাক্রমে অ্যানিমিক ও ছোট বলে।

গতকালকার আলোচনার পর থেকে কিটি কেমন যেন চুপ মেরে গেছে।

শরীফরাও রক্ত দিতে যাবার আগে, সে যেরকম মুখ করে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, তাতে মনে হল, সেও বোধহয় রক্ত দিতে যেতে চাইছে। কিন্তু কপাল ভালো, শেষ পর্যন্ত কিটি মুখ খুলল না।

আমার বেশ খারাপ লাগছে কিটির কথা ভেবে। এখানে আসার দিন পনের পর থেকেই ও আমাকে আম্মা বলা শুরু করেছে। মাস দেড়েক পর থেকে শরীফকেও আব্বা বলছে। ও আমাদের পরিবারে মিশে যেতে চায়, সব ব্যাপারে অংশ নিতে চায়। কিন্তু ওর সোনালি চুল, নীল চোখ রাস্তায় লোকজনের মুখে ভ্রূকুটি এনে দেয়। পাড়ার লোকেরাও এখন আর ভালো চোখে দেখে না ওকে। বাসায় মেহমান এসেও ওকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে যায়। আমরা তখন সকলে মিলে গলা ফাটিয়ে তর্ক, আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠি, তখন কিটি এসে দাঁড়ালে আমরা থমকে যাই। মাতৃভাষায় যত কথা কলকল করে বলতে পারি, ইংরেজিতে তত ফ্লো আসে না। ফলে আলাপ হোঁচট খায়। তাতে ও সন্দেহ করে ওকে দেখে আমরা বুঝি কথা ছাপাচ্ছি। আমরা বাংলায় আলাপ চালিয়ে রাখলে সব কথা বুঝতে পারে না। তখন উল্টো মাইন্ড করে। ভারি এক ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়েছি যেন!

আজ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। শরীফ সাড়ে বারোটার মধ্যেই গোসল সেরে রেডি—প্রেসিডেন্ট কি বলেন, তা শোনার জন্য সকলেই চনমন করছি। এক তারিখের ঘোষণায় তো লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গেছে, এখন আবার কি বলেন, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। আগামীকাল রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ কি বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বাণীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচীর ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। কিন্তু এ ক'দিনে ঘটনা তো অন্য খাতে বইছে। এত মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, কারফিউ ভঙ্গ, গুলিতে শয়ে শয়ে লোক নিহত—এর প্রেক্ষিতে শেখ আগামীকাল কি ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছে, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দূর তা কি করে হবে? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি দাবির জোরে সরকার গঠন করবেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন। এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে। কেউ বলছে,

আগামীকালের মিটিংয়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া আজ ভাষণ দিচ্ছে।

ভাষণ শুনে সবাই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। আমি হেসে শরীফকে বললাম, 'তুমি কি আশা করেছিলে? ইয়াহিয়া 'এসো বধূ আধ-আঁচরে বসো' বলে মুজিবকে ডেকে সরকার গঠন করতে বলবে?'

'না, অতটা আশা না করলেও ওরকম কর্কশ গলায় ধমক-ধামকও আশা করিনি। যতো দোষ নন্দঘোষ বলে উনি যেভাবে আমাদের গালাগালি করলেন, সেটা মোটেই আমাদের প্রাপ্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উনিই তো দায়ী।'

'যাই বলো, ভয় পেয়েছে কিন্তু। দেখলে না ২৫ মার্চ অধিবেশন বসার ঘোষণা দিল?'

রুমী চটা গলায় বলে উঠল, 'আর সামরিক বাহিনী দিয়ে আমাদের শায়েস্তা করার হুমকি দিল যে? সেটা কি?'

এইসব কচাকচি করতে করতে দুপুরের খাওয়া শেষ হল। শরীফ ও রুমীকে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে দেখে বললাম,

'কোথায় যাচ্ছ?'

'অফিসে।'

'অফিসে? আজ না শনিবার, হাফ?'

রুমী হেসে উঠে বলল, 'আম্মা ভুলে গেছ, এখন না বিকেলে অফিস-কাচারি চলছে?'

আমি বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'তাতে কি? হাফের দিন হাফ থাকবে না?'

'নিশ্চয় থাকবে। হাফ ছুটিটা সকালেই হয়ে গেছে, এখন হাফ অফিস। দেখছ না, এখন উলট-পুরাণের যুগ চলছে।'

'তাই বটে। কিন্তু তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'আমি? আমিও অফিসে যাচ্ছি। ও আম্মা, তুমি কি ভুলে গেছ আমি আব্বুর অফিসে ড্রয়িং করতে যাই? তাছাড়া এখন যে বেবী চাচার সঙ্গে কাজ করি?'

ভুলেই গেছিলাম বটে! রুমি গত বছর আই.এস.সি পরীক্ষা দেবার পর থেকে শরীফের অফিসে টুকটাক ড্রয়িংয়ের কাজ করে। রেজাল্ট বেরোবার পর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে গত বছর অক্টোবরে; কিন্তু তখনিই কলেজ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল ক্লাস শুরু হবে একাত্তরের মার্চ থেকে। তাই বসে না থেকে শরীফের অফিসের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটাও তার সব সময় করতে ভালো লাগে না। তাই বিভাগীয় প্রধানের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিকস বিভাগে ক্লাসও করে। এখন তো মার্চে এই তোলপাড় ব্যাপার। পড়াশোনা এতদিন শিকেয় তোলা ছিল, এবার টংয়ে উঠল।

বাংলা একাডেমিতে আজ শিল্পীদের জরুরী সভা আড়াইটেয়। যদিও আমি শিল্পী বা সাহিত্যিক নই, কিন্তু ঢাকায় সেই ১৯৪৯ সাল থেকে আছি বলে বেশির ভাগ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপ আছে। তাই শিল্প সাহিত্য-বিষয়ক সভা, সমিতি, সেমিনার, আন্দোলন ইত্যাদিতে দর্শক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় সব সময়ই গিয়ে থাকি।

কিন্তু আজও বাধা পড়ল। বাবাকে ওঠানোর ভার জামীর ওপর দিয়ে তিনটের দিকে বেরোব ভেবেছিলাম। কিন্তু বাবা হঠাৎ পৌনে তিনটেয় জেগে ডাক দিলেন, 'মাগো, একটু শোন তো।'

কি ব্যাপার?

'মনে হচ্ছে খাটটা দুলছে।'

বুঝলাম। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ব্লাড প্রেসার বাড়লেই ওর মনে হয় খাট, দেয়াল, ছাদ সব দুলছে। রুমীর ওপর রাগ হল। কাল রাতে রুমী অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে দেশের পরিস্থিত বুঝিয়েছে। অন্ধ মানুষ, বয়স প্রায় নব্বই, হাই ব্লাড প্রেসারের জন্য সব সময়ে ধরে ধরে সব করাতে হয়। তাঁর ওপর সামান্য মানসিক চাঞ্চল্য হলেই আর রক্ষা নেই। প্রেসার একেবারে দশতলায় উঠে বসে থাকে। তাকে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের এই মরণপণ আন্দোলনের সাতকাহন না শোনালেই নয়? প্রতিবেশী ডাক্তার, এ. কে. খানও নেই ঢাকায় রাজশাহীতে পোস্টেড। তার অবর্তমানে কখনো ডাঃ নুরুল ইসলাম, কখনো ডাঃ রব দেখেন বাবাকে। কিন্তু এখন ওঁদের বিশ্রামের সময়। পাঁচটার আগে ডাকা ঠিক হবে না। তাই ফোন করে শরীফকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতে বললাম।

পাঁচটার পর ডাঃ নুরুল ইসলামকে ফোন করলাম। উনি বাড়ি নেই। সৌভাগ্যবশত ডাঃ রবকে পেয়ে গেলাম। উনি বললেন, 'এখন তো ভাই আমার গাড়িটা নেই। রুমীকে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য?'

অতীতে রুমী বহুবার ওঁকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছে।

রুমীকে গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য বলতেই সে বলল, এখন তো ওই রাস্তায় গাড়ি নেয়া যাবে না। এখন যে ওই রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি।

তাইতো। ডাঃ রবের বাড়ি মিরপুরে মেইন রোডের ওপর। গত ক'দিন ধরে রোজই সন্ধ্যায় সব মিছিল ওই রাস্তা দিয়ে গিয়ে শেষ হয় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে।

৭ মার্চ
রবিবার ১৯৭১

আজ বিকেলে রমনা রেসের মাঠে গণজমায়েত। গত ক'দিন থেকে শহরের সবখানে, সবার মধ্যে এই জনসভা নিয়ে তুমুল জল্পনা-কল্পনা, বাকবিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক। সবাই উত্তেজনায়, আগ্রহে, উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় টগবগ করছে। আমি যদিও মিটিংয়ে যাব না, বাসায় বসে রেডিওতে বক্তৃতার রিলে শুনব, তবু আমাকেও এই উত্তেজনার জ্বরে ধরেছে।

এর মধ্যে সুবহান আমাকে জ্বালিয়ে মারল। আজ তাড়াতাড়ি রান্না সারতে বলেছিলাম। শরীফ বলেছে বারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবে। ঠিক দেড়টাতে রওনা দেবে, নইলে কাছাকাছি দাঁড়াবারও জায়গা পাবে না। আর সুবহান হতচ্ছাড়াটা এগারোটার সময় গোশত পুড়িয়ে ফেলল। বারেককে দিয়েছিলাম রুমী জামীদের সার্ট ইস্ত্রি করতে। সুবহান চুলোয় গোশত রেখে বারেকের সঙ্গে ইস্তি করাতে মেতেছে। তিনিও আজ শেখের বক্তৃতা শুনতে যাবেন, তাই তার নিজের প্যান্ট সার্ট ইস্ত্রি তদারকিতে যখন মগ্ন, তখন গোশত গেছে পুড়ে। কি যে করি ওকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি ডিমের অমলেট করে ডাল-ভাজিসহ ভাত দিলাম শরীফদের।

এতবড় কাণ্ড করে, এত বকা খেয়েও সুবহানের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রান্নাঘরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে প্যান্ট-সার্ট পরে তিনি শরীফদের সঙ্গে চললেন শেখের বক্তৃতা শুনতে।

আজ বারেকও গেছে ওদের সঙ্গে। এর আগে কোনো মিটিংয়ে যেতে দিইনি ওকে। আজকে না দিলে বড় অন্যায় হবে।

কিটির ঘরে গিয়ে ওর বারো ব্যান্ডের দামী রেডিওটা চেয়ে নিয়ে উপরে গেলাম। ওকেও আসতে বললাম আমার ঘরে। বাবা দুপুরের খাওয়ার পরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

আমি রেডিওটা নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় শুলাম। একটু পরে কিটিও এল। রেডিও অন করে রেখেই দু'জনে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগলাম।

রেডিওতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা শোনা গেল। আমরা কথা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। ওমা! তারপর আর শব্দ নেই। কি ব্যাপার?

শব্দ নেই তো নেই-ই। কারেন্ট গেল? বাতির সুইচ টিপে দেখলাম কারেন্ট আছে। রেডিওটা খারাপ হল? নব ঘুরিয়ে দেখলাম অন্য স্টেশন ধরছে। তাহলে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, 'চল ছাদে যাই তো।'

দু'জনে ছাদে গেলাম। পুবদিকে সোজাসুজি মাপলে মাত্র আধ মাইল দূরে রেসের ময়দান। নানা রকম শ্লোগানের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। আকাশে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার কেন? কি ব্যাপার?

ব্যাপার সব জানা গেল শরীফরা মিটিং থেকে ফেরার পর।

কলিং বেলের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই রুমী দুই হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল। দেখি, ফখরুদ্দিনও এসেছেন। ফখরুদ্দিন—সংক্ষেপে ফকির, শরীফের স্কুল জীবনের বন্ধু। তার পেশা ব্যবসা আর নেশা রাজনীতি, যদিও কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য তিনি নন। তবে রাজনৈতিক অঙ্গনের খবরাখবরে তার চেয়ে ওয়াকিবহাল আমাদের জানার মধ্যে আর নেই।

সোফায় ধপ করে বসে পড়ে ফকির বললেন, 'ভাবী, চা খাওয়ান। এক সঙ্গে তিন কাপ—গলা শুকিয়ে কাঠ।'

'চেহারাও তো শুকিয়ে কাঠি। কি করে বেড়ান আজকাল? খান না নাকি?'

শরীফ মুচকি হেসে বলল, 'নেতাদের লেজ ধরে দৌড়োদৌড়ির চোটে ওর নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত নেই।' সুযোগ পেয়েই শরীফ ফকিরের পেছনে লাগে। আমি সুবহানকে চায়ের হুকুম দিয়ে সোফায় বসলাম, 'ওসব লেগ-পুলিং এখন রাখ। মিটিংয়ের কথা বল। রেডিও বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন? আকাশে হেলিকপ্টার দেখলাম যেন।'

রুমী বলল, 'হেলিকপ্টার তো পয়লা তারিখের পল্টন জনসভাতেও ছিল। ওরা বোধহয় গার্ড অব অনার দেওয়ার রেওয়াজ করেছে।'

সবাই হেসে উঠল। কিটি রেডিও হাতে গুটিগুটি এসে দাঁড়াল, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'রেডিও এখনো চুপ।'

আমি বললাম, 'কিটি, এখানে এসে বস। আজ তোমার বাংলা বোঝার পরীক্ষা নেব। এখানে বসে আমাদের বাংলায় কথাবার্তা শোন, তারপর পুরোটা বলতে হবে। রেডিওটা খোলাই থাক।'

কিটি হেসে সহজ হল, সোফায় এসে বসল। আমরা বাঁচালাম—এখন কলকল করে মাতৃভাষায় আলাপ না করলে প্রাণে শান্তি হবে না।

রেসকোর্স মাঠের জনসভায় লোক হয়েছিল প্রায় তিরিশ লাখের মতো। কত দূর-দূরান্তর থেকে যে লোক এসেছিল মিছিল করে, লাঠি আর রড ঘাড়ে করে—তার আর লেখাজোখা নেই। টঙ্গী, জয়দেবপুর, ডেমরা—এসব জায়গা থেকে তো বটেই, চব্বিশ ঘণ্টার পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিল গামছায় চিড়ে-গুড় বেঁধে। অন্ধ ছেলেদের মিছিল করে মিটিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু মহিলা, ছাত্রী মিছিল করে মাঠে গিয়েছিল শেখের বক্তৃতা শুনতে।

'কিন্তু শেখ নিরাশ করেছে সবাইকে।' রুমীর একথায় সবচেয়ে প্রতিবাদ করে

উঠলেন ফকির, 'তোমার মাথা গরম, চ্যাংড়া ছেলেরা কি যে বল না—ভেবেচিন্তে—শেখ যা করেছে, একদম ঠিক করেছেন।'

সেটি পুরনো বাকবিতণ্ডা—যা গত কয়েকদিন ধরে সর্বত্রই শুনছি। একদল চায় শেখ স্বাধীনতার ঘোষণা দিন—আরেক দল বলছে তাহলে সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হবে।

রুমী তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতেই দৃঢ়তা এনে প্রতিবাদ করল, 'আপনারা দেয়ালের লিখন পড়তে অপারগ। দেখেন নি আজ মিটিংয়ে কত লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে এসেছিল? জনগণ এখন স্বাধীনতাই চায়, এটা তাদের প্রাণের কথা। নইলে মাত্র এই ছ'দিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবাই সবখানে স্বাধীন বাংলার ঐ রকম ম্যাপ লাগানো পতাকা সেলাই করার মত একটা জটিল কাজ, অন্যসব কাজ ফেলে, করে, সেটা আবার বাতাসে নাড়াতে নাড়াতে প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিল করে যায়?'

তর্কের গন্ধ পেলে তর্কবাগীশ ফকির সর্বদাই চাঙ্গা, তিনি বললেন, 'তুমিও দেখছি চার খলিফার দলের।'

রুমি বলল, 'আমি কোনো দলভুক্ত নই, কোনো রাজনৈতিক দলের শ্লোগান বয়ে বেড়াই না। কিন্তু আমি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, মান-অপমান জ্ঞানসম্পন্ন একজন সচেতন মানুষ। আমার মনে হচ্ছে শেখ আজ অনায়াসে ঢাকা দখল করার মস্ত সুযোগ হারালেন।'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'এই সুদূরপ্রসারী তর্ক শুরু করার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই ছোট্ট একটা খবর। শেখের বক্তৃতা রিলে করা হবে বলে সারা দিন রেডিওতে অ্যানাউন্স করেও শেষ পর্যন্ত রিলে করা হল না কেন? কেনই বা রেডিও একদম ডেডস্টপ? এইটে শোনার পর আমি রান্নাঘরে চলে যাব। তখন তোমরা মনের সুখে সারারাত কচকচ কোরো।'

'শেখের বক্তৃতা রিলে করার জন্য বেতার-কর্মীরা তো তৈরিই ছিল। শেষ মুহূর্তে মার্শাল ল অথরিটি বক্তৃতা রিলে করতে দিল না। ব্যস, অমনি রেডিও স্টেশনের সমস্ত কর্মীরা হাত গুটিয়ে বসল। শেখের বক্তৃতা রিলে করতে না দিলে অন্য কোনো প্রোগ্রামই যাবে না। তাই রেডিও এরকম চুপ।'

জামী এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, এখন হঠাৎ বলে উঠল, 'জান মা, আজ বিকেলের প্লেনে টিক্কা খান ঢাকায় এসেছে গভর্নর হিসাবে।'

এক সপ্তাহ দুইবার গভর্নর বদল। এক তারিখে ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে বদলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে দেওয়া হয়েছিল, এখন আবার ছ'দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে আনা হল। কি এর আলামত?

আজ রাতে রেডিও আর গলাই খুলল না।

৮ মার্চ
সোমবার ১৯৭১

গতকাল সন্ধ্যার পর রেডিও স্টেশনের লনে কারা যেন বোমা ছুঁড়েছে।

কাল রাতে রেডিও বন্ধ থাকার পর আজ সকাল থেকে আবার চালু হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা প্রচারিত হল।

শরীফের খালাতো ভাই আনোয়ার সকালে ফোন করে জানাল, গত পরশু তার মেজ মেয়ে ইমন আগুনে পুড়ে গেছে। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনতলা নিউ কেবিনে রাখা হয়েছে।

বিকেলে মেডিক্যালে গেলাম ইমনকে দেখতে। কপাল ভালো খুব বেশি পোড়ে নি। মুখটা বেঁচে গেছে। কেবিনে টুনটুনি আপা, ছবি আপা, ডলি আপার খালা এবং আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হল। এরা সবাই ইমনকে দেখতে এসেছেন। কিন্তু ইমনের প্রতি মিনিট পাঁচেক মনোযোগ দেয়ার পরই সবাই মশগুল হয়ে গেলেন শেখের গতকালের বক্তৃতার আলোচনায়। তবে রক্ষে, এঁরা কেউ স্বাধীনতা-স্বাধিকারের তর্কের দিকে গেলেন না। এঁরা লোকমুখে এবং রেডিওতে শোনা বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত বক্তৃতা লোকজনকে কি রকম সম্মোহিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে—সে কথাই বলে গেলেন।

আজ আশুরা। হোসেনী দালাল থেকে মহরমের মিছিল বেরিয়ে এতক্ষণে আজিমপুর গোরস্থানের রাস্তায় গিয়ে উঠেছে মনে হয়। আজিমপুর কলোনির এক নম্বর বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে মহরমের মিছিল গোরস্থানে যায়, এই রাস্তার ওপরই মহরমের মেলা বসে। প্রতি বছর আমরা মেলায় যাই বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা তাদের মনোমত খেলনা কেনে, আমরা বঁটি, দা, বেলনুপিঁড়ি ইত্যাদি গেরস্থালির জিনিস কিনি।

কিন্তু এ বছর ছেলেদেরও মিছিল বা মেলা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই, আমাদের তো নেই-ই। গত এক সপ্তাহ ধরে বাংলার ঘরে ঘরেই কারবালার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কত মা ফাতেমার বুকের মানিক, কত বিবি সখিনার নওজোয়ান স্বামী পথে-প্রান্তরে গুলি খেয়ে ঢলে পড়ছে—বাংলার ঘরে ঘরে এখন প্রতিদিনই আশুরার হাহাকার, মর্সিয়ার মাতম। কিন্তু কবি যে বলেছেন, 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া, ক্রন্দন চাহি না', তাই বুঝি বাংলার দুর্দান্ত দামাল ছেলেরা 'ত্যাগ চাই' বলে ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়েছে। গত সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম থেকে এমন লম্বা মশাল মিছিল বেরিয়েছিল যে বলবার নয়। আমরা দেখি নি—রুমী, ফকির, শরীফ—এরা তর্কের কচকচির মধ্যে পড়ে রাত এগারোটা করে ফেলেছিল। খবরটা জানা গেল আমার বান্ধবী রোকেয়ার টেলিফোনে। ওদের বাড়ি ধানমণ্ডি আট নম্বর মেইন রোডের ওপর। ওদের বাড়ি সামনে মিরপুর রোড দিয়েই সব মিছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যায়। রোকেয়া বলল, 'জানিস, মশাল মিছিল দেখে আমারও রাস্তায় নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল।'

১০ মার্চ
বুধবার ১৯৭১

স্বাধিকার-স্বাধীনতা নিয়ে চেয়ারে বসে বাক-বিতণ্ডার লড়াই চলছেই। সাতদিন বাইরে বাইরে ঘুরে, রুমী এখন দেখি, ক'দিন বাড়িতেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাবার টেবিল গুলজার করে রাখছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এতে আমার আর সুবহানের খাটনি বেশি হয় বটে—দফার দফায় চা-নাশতার সাপ্লাই দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আমার প্রাণটা থাকে ঠাণ্ডা। হৈহল্লা, বাড়িঘর লন্ডভণ্ড—যা করছে করুক, অন্তত চোখের সামনে তো রয়েছে। রুমী বাইরে গেলেই আমার প্রাণটা যেন হাতে কাঁপতে থাকে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একটা গুলির ব্যবধান মাত্র, কখন আচমকা কোনদিন থেকে তীক্ষ্ণ শিসে ছুটে আসে, কে বলতে পারে!

'সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।' জামীর করার কিছু নেই। রুমীর চেয়ে সাড়ে তিন বছরের ছোট হওয়ার অপরাধে তার মিটিং-মিছিলে যাওয়ারও অনুমতি নেই। রুমীদের আলাপ আলোচনায় সর্বক্ষণ তাল দেবার মতো বয়স-বিদ্যা কিছুই এখনো হয় নি। তাছাড়া রুমীর বেশির ভাগ বন্ধু রুমীর চেয়ে বয়সে দু'তিন-চার বছরের বড়। পড়েও তার চেয়ে দু'তিন ক্লাস ওপরে। রুমীদের আলাপ-আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও-সে-তুং। এসবের মধ্যে জামী দাঁত ফোটাতে পারে না। কেবল চেগুয়েভারার কথা উঠলে সে লাফিয়ে এসে বসে।

জামীর বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র টাট্টুকেই দেখি বেশির ভাগ আসতে—যদিও সে থাকে সবচেয়ে দূরে—গুলশানে। অন্য বন্ধুদের পাত্তা নেই—নিশ্চয়ই তাদের মায়েরা বেরোতে দেয় না। টাট্টুর একটা সুবিধে আছে, তার বাবা-মা আমাদের পারিবারিক বন্ধু। কাজেই টাট্টু এ বাড়িতে আসবার আবদার ধরলে তার বাবা-মা, তাকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন। এদিক থেকেও একই কাহিনী। জামী আবদার ধরলে আমরা তাকে গাড়ি করে গুলশানে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। টাট্টু-জামীর ভাবখানা এই মিটিং-মিছিলে যখন যেতে দেবেই না, অন্ত দু'বন্ধুতে মেলামেশা করতে দাও!

ছেলে-ছোকরারা স্বাধীনতা-স্বাধিকারের তর্কে একমতে আসতে পারছে না, ওদিকে আশি বছরের বৃদ্ধ ভাসানী গতকালকার পল্টন ময়দান মিটিংয়ে স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে বসে আছেন। গতকাল বিকেল তিনটেয় পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে যে জনসভা হয়, তাতে সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি বলেন : 'বর্তমান সরকার যদি ২৫ মার্চের মধ্যে আপসে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না দেয়, তাহলে '৫২ সালের মত মুজিবের সঙ্গে একযোগে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম শুরু করব।'

ভাসানীর বক্তৃতার একটি কথা আমার মনে খুব দাগ কেটেছে। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার নায়ক হওয়া অনেক বেশি গৌরবের।' মহাকবি মিল্টন-এর অমর মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এর সেই বিখ্যাত পঙ্ক্তি মনে পড়ল—'ইট ইজ বেটার টু রেইন ইন হেল দ্যান সার্ভ ইন হেভন।' স্বর্গে গোলামি করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভালো।

ব্যাঙ্কে টাকা তোলার আবার নতুন সময় করা হয়েছে—নয়টা-বারোটা। এখন থেকে শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিতে থাকবেন।

১২ মার্চ
শুক্রবার ১৯৭১

কিটিকে নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়েছি। তার জন্য এই বুড়ো বয়সে নতুন করে সাধারণ জ্ঞানের বই পড়ে তথ্য যোগাড় করতে হচ্ছে। এত মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ দেখেও সে যেন মেনে নিতে পারছে না পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই বিক্ষোভ ন্যায়সঙ্গত, তাদের স্বাধিকারের দাবি ন্যায়সঙ্গত। কিটি বলছে, তোমরা তো খালি মুখেই বলছ তোমরা বঞ্চিত, পশ্চিম পাকিস্তান তোমাদের প্রতি অন্যায় করছে, তোমাদের টাকা দিয়ে নিজেদের পেট ভরাচ্ছে। কিন্তু এ অভিযোগের সমর্থনে ফ্যাক্টস্ কই? ফিগার্স্ কই? কোন্ কোন্ খাতে তোমরা বঞ্চিত শোষিত, তার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাও।

শোনো কথা! শোষণ, বঞ্চনার পরিসংখ্যান আমি মুখস্থ করে রেখেছি নাকি? কিন্তু কিটিকে তো আর বলতে পারি নে, আমার অত মনে নেই, তুমি বই-কাগজপত্র পড়ে নিজে জেনে নাও। সুতরাং আবার নতুন করে গত চব্বিশ বছরের অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ, অবিচারের পরিসংখ্যান ঘাঁটছি। পাই-পয়সা ধরে হিসাব করে কিটিকে দেখিয়ে দেব—চাল, আটা, নুন, কাগজ, সোনা থেকে শুরু করে সব খাতে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে। শেখের নির্বাচনী পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওটা কিটিকে দেখাতে পারলেই আমার কাজ বারো আনা হাসিল হয়। ওতে পাই-পয়সা ধরে হিসাব করে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে বৈষম্য ও শোষণের সমস্ত তথ্য কিন্তু কারো কাছে যদি এক কপি থেকে থাকে।

১৪ মার্চ
রবিবার ১৯৭১

বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ঢাকার কবি-সাহিত্যিকরা 'লেখক সংগ্রাম শিবির' নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। আহ্বায়ক : হাসান হাফিজুর রহমান। সদস্য : সিকান্দার আবু জাফর, আহমদ শরীফ, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, বদরুদ্দিন উমর, রণেশ দাশগুপ্ত, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, রোকনুজ্জামান খান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, জহির রায়হান, আবদুল গনি হাজারী এবং আরো অনেকে।

কমিটি কয়েকদিন আগেই গঠিত হয়েছে, আজ বিকেলে পাঁচটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এর জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হল। আহমদ শরীফ স্যার সভাপতি।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে লেখকদের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করলেন রণেশ দাশগুপ্ত, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, রাবেয়া খাতুন, আহমদ ছফা ও আরো কয়েকজন।

আমি সাহিত্যিকও নই, বক্তাও নই, আমি পেছনের দিকে চেয়ারে বসে বসে শুনলাম আর ভেতরে ভেতরে উদ্দীপ্ত হলাম। মিটিং শেষে সকলে মিছিল করে বেরোলেন শহীদ মিনারের উদ্দেশে। বাংলা একাডেমি থেকে শহীদ মিনার বেশি দূর নয়। আমার হাঁটুর ব্যথাটাও কয়েকদিন থেকে নেই। সাহস করে আমিও মিছিলে শামিল হলাম।

শিল্পীরাও পিছিয়ে নেই। মার্চের প্রথম থেকেই বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র—সব মাধ্যমের শিল্পীরাই অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে মিটিং, মিছিল, গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে আসছিলেন। এখন আবার বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়েছে।

পরিষদের সভাপতি : আলী মনসুর। সম্পাদক : সৈয়দ আবদুল হাদী। কোষাধ্যক্ষ : লায়লা আর্জুমান্দ বানু। সদস্য : মোস্তফা জামান আব্বাসী, জাহেদুর রহিম, ফেরদৌসী রহমান, বশির আহমেদ, খান আতাউর রহমান, বারীন মজুমদার, আলতাফ মাহমুদ, গোলাম মোস্তফা, কামরুল হাসান, অজিত রায়, হাসান ইমাম, কামাল লোহানী, জি. এ. মান্নান, আবদুল আহাদ, সমর দাস, গহর জামিল, রাজ্জাক ও আরো অনেকে।

বেতার ও টিভি কেন্দ্রে মিলিটারি কেন মোতায়েন করা হয়েছে—এই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

১৫ মার্চ
সোমবার ১৯৭১

খেতাব বর্জন শুরু হয়ে গেছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তার 'হেলালে ইমতিয়াজ' খেতার বর্জন করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেছেন।

নাটোর হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ডাঃ শেখ মোবারক হোসেন 'তমঘা-এ পাকিস্তান', ফরিদপুরের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শেখ মোশারফ হোসেন 'তঘমা-এ কায়েদে আযম' খেতাব বর্জন করেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও তাঁর 'সিতারা-ই খিদমত' এবং 'সিতারা-ই ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেছেন।

আরো কে কে যেন খেতাব বর্জন করেছেন, নামগুলো মনে করতে পারছি না।

সমস্ত দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে টালমাটাল। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিদেশীরাও ভয় পেতে শুরু করেছে। পশ্চিম জার্মানি আর যুক্তরাজ্য সরকার তাদের কিছু কিছু নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। রুমী জার্মান কালচারাল সেন্টারে জার্মান ভাষা শিখত। সেই সুবাদে তার এক জার্মান টিচারের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। সেই ম্যাডামের কাছ থেকেই জানা গেল তাঁরা চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে ম্যাডাম রুমীকে চা খেতে ডেকেছিলেন তাঁর বাড়িতে। রুমী ফিরে এসে বলল, 'ওঁরা আপাতত ব্যাঙ্ককে যাচ্ছেন। তারপর কি হবে, এখনো জানেন না।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমাদের গুলশানের বাড়ির ভাড়াটেরাও যাবে নিশ্চয়ই। '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তো সবাই ব্যাঙ্ককে চলে গিয়েছিল।'

আমাদের ভাড়াটে একজন আমেরিকান। তাঁর বউকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখনো তাদের নাগরিকদের সরাবার কথা চিন্তা করে নি। আমরা আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। ঢাকাতেই আছি। ও হ্যাঁ, জাতিসংঘের কর্মচারীদেরও কিন্তু এখনো ঢাকা থেকে সরাবার কোন প্ল্যান হয় নি। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আমাদের আর দুশ্চিন্তার কি আছে? আমরা তো মাটিতেই বসে আছি। আছাড় খাবার ভয় আমাদের নেই। যত ভয় তোমাদেরই। '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কিভাবে ব্যাঙ্কক পালিয়েছিলে, তা কি আর মনে নেই?

কিন্তু দেশের অবস্থা যে গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আকাশে আশঙ্কার কালোমেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

দেশের ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্য দেবার জন্য গম বোঝাই একটা মার্কিন জাহাজ আসছিল, সেটাকে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করতে দেয়া হয় নি, ইসলামাবাদ থেকে জরুরী নির্দেশ দিয়ে করাচি যেতে বলা হয়েছে এই নিয়ে দারুণ হৈচৈ এখানে। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত দাবি করে খবর কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন। সরকার কাগজে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে এই বলে যে আদৌ কোনো গমবাহী জাহাজ চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল না।

আজিম ভাই কিছুতেই প্লেনের টিকিট পাচ্ছেন না। বেচারা লন্ডন থেকে দেশে বেড়াতে এসেছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে। প্লেনের টিকিট না পেয়ে ছুটি এখন চার সপ্তাহ পেরিয়ে যাচ্ছে। দুটো টেলিগ্রাম করেছেন, তারপর ট্রাঙ্কল করেছেন। টেলিফোনে বসের গলার স্বরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন—আর বুঝি চাকরি থাকে না। অথচ পি.আই.এ'র ফ্লাইটে নাকি রোজই শয়ে শয়ে অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছে। খবর কাগজেও এ নিয়ে সংবাদ বেরিয়েছে : কোন বাঙালি প্লেনের টিকিট পাচ্ছে না, অথচ বিপুলসংখ্যক অবাঙালি রোজই প্লেনে করে বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা। এরা এদের বউ ছেলেমেয়েদের সেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছিল। এখন নিজেরা পালাচ্ছে। এদিকে শয়ে শয়ে সিলেটি বাঙালি লন্ডন থেকে ছুটি কাটাতে এসে আটকা পড়ে গেছে। টিকিট পাচ্ছে না। অথচ পি.আই.এ এদেরকে অন্য এয়ার লাইন্‌সে টিকিট এনডোর্স করে নেবার অনুমতিও দিচ্ছে না।

আজ বিকেলের প্লেনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা এসে নেমেছেন।

১৬ মার্চ
মঙ্গলবার ১৯৭১

রুমীকে নিয়ে বড্ডো উদ্বেগে আছি। কয়েকটা দিন বাড়িতে বসে বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রচুর মোগলাই পরোটা ধ্বংস করে, তর্ক-বিতর্কে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঝালাপালা করে, এখন আবার বাইরে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে। কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কখন খাচ্ছে, কি না-খেয়েই থাকছে, কিছুরই তাল পাচ্ছি না। আজ ওদের ড্রেসিং রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে নিচে জুতোর সারের পেছনে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—ইয়া মোটা মোটা ধ্যাবড়া দুটো হামানদিস্তা। অনেক আগে আমার ছোটবেলায় দাদীকে হামানদিস্তায় পান ছেঁচে খেতে দেখেছি। কিন্তু সে হামানদিস্তা দেখতে বেশ সৌকর্যমণ্ডিত ছিল। আর এ হামানদিস্তা দুটো যেমন আকাট, তেমনি ধ্যাবড়া। দু'দুটো হামানদিস্তা ওয়ার্ডরোবের ভেতর লুকোনো? কি হবে এ দিয়ে? রুমী বাড়ি ছিল না। জামী কাঁচুমাচু মুখে স্বীকার করল—বোমা পটকা বানানোর কাজে হামানদিস্তা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ বটে। বোমা-পটকা? কি গুঁড়ো করবি হামানদিস্তায়? মালমশলা কই? জামী দুই ঠোঁট-টেপা আড়ষ্ট মুখে আঙুল তুলে দেখাল, আলনার তলায় ঝোলানো কাপড়ের আড়ালে কয়েকটা প্লাস্টিকের ব্যাগ—পেট মোটা, সুতলি দিয়ে মুখ বাঁধা।

আমি কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কি করি? কি বলি? সারা দেশ স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে; ঢাকায়, রাজশাহীতে, চট্টগ্রামে সবখানে এই দাবি তুলে শান্তিপ্রিয় বাঙালিরা আজ মরিয়া হয়ে লাঠি, সড়কি যা পাচ্ছে, তাই হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে গুলির সামনে। ঘরে ঘরে নিজের হাতে বোমা পটকা, মলোটভ ককটেল বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিপক্ষের ওপর। এই রকম সময়ে আমার ছেলেকে আমি কি চাইব ঘরে আটকে রাখতে? আমি কি চাইব সে শুধু বন্ধুবান্ধব নিয়ে জাঁকিয়ে বসে, স্বাধীনতার দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে তর্ক-বিতর্ক, চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে মত্ত থাকুক?

রুমী কখন বাড়ি ফিরেছে, টের পাই নি। ফিরেই নিশ্চয় জামীর কাছে সব শুনেছে।

আমার ঘরে এসে সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে খুব শান্তস্বরে বলল, 'আম্মা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

আমি উঠে বসে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে।'

রুমী খাটে এসে বসল আমার সামনে। আমি বললাম, 'ছোটবেলা থেকে তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছি—এমন কাজ কখনো করবে না যা আমাদের কাছে লুকোতে হবে। শিখিয়েছি—যদি কখনো কোন বিষয়ে আমাদের মতের সঙ্গে তোমার মত না মেলে, তাহলে আগে আমাদেরকে বুঝিয়ে তোমার মতে ফেরাবে, তারপর সেই কাজটা করবে।'

রুমী তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতে বলল, 'আমি লুকিয়ে কিছু করছি না আম্মা। আব্বু সব জানে, আব্বুই আমাকে বেবী চাচার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি বেবী চাচার সঙ্গে কাজ করি। তবে কি কাজ করি, বিস্তারিত বলা নিষেধ আছে।'

আমি রুমীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমার খুব ভয় করছে রুমী।'

রুমী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভয় করার স্টেজে আমরা আর নেই মা। আমাদের আর পেছনে হটার কোনো উপায় নেই।'

'তুই যা-ই বলিস রুমী, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আজই তো কেবল মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হল। ফয়সালা একটা নিশ্চয় হবে।'

রুমীর মুখে কি রকম একটা হাসি ফুটে উঠল, কি যেন বলতে গেল সে, তার আগেই সিঁড়ির মুখ থেকে জামী চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা ভাইয়া, শিগগির এস, খবর শুরু হয়ে গেছে। টিভিতে শেখ মুজিবকে দেখাচ্ছে।'

হুড়মুড়িয়ে উঠে নিচে ছুটলাম। খবর খানিকটা হয়ে গেছে। শেখ মুজিবের গাড়িটা প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসছে। সাদা ধবধবে গাড়িতে পতপত করে উড়ছে কালো পতাকা। দেখে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। প্রতিবাদের কালো পতাকা উঁচিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় গিয়েছেন শেখ মুজিব। এর আগে কোনদিনও পাকিস্তান সরকার বাঙালির প্রতিবাদের এই কালো পতাকা স্বীকার করে নেয় নি। এবার সেটাও সম্ভব হয়েছে।

১৯ মার্চ
বুধবার ১৯৭১

সকালে চায়ের টেবিলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে খবর কাগজের ওপর। পরিস্থিতি ও চাহিদার গুরুত্ব বুঝে মাসের ২-৩ তারিখ থেকেই তিন চারটে কাগজ রাখছি—যাতে বাড়ির সকলেই একই সঙ্গে সুখী থাকতে পারে।

সবার নজর মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠকের খবরটার দিকে। খবর অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। তাঁরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেছেন। বাইরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ শুধু বলেছেন, তাঁরা দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা কেবল শুরু করেছেন। আলোচনা চলতে থাকবে, কারণ সমস্যা যা, দু'তিন মিনিটে তার সমাধান সম্ভব নয়।

আজ বুধবার সকাল দশটায় আবার বসছেন তাঁরা।

রুমী হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'আম্মা, এই খবরটা দেখেছ?'

'কোনটা ?'

রুমি হাতের দৈনিক আজাদ পত্রিকাটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। পড়লাম খবরটা। হেডিং হচ্ছে :

জানেন কি ?

রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতজন পদস্থ ব্যক্তি অবস্থান করিতেছেন ?

খবরটা সংক্ষেপে হল : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ, প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদা, মেজর জেনারেল ওমর এবং আরো ছয়জন ব্রিগেডিয়ার ঢাকা এসেছেন। তবে এ সম্বন্ধে কোন সরকারি সমর্থন পাওয়া যায় নি। কেবল প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার সাংবাদিকদের প্রশ্নের চাপে পীরজাদা ও ওমরের ঢাকা আসার কথা স্বীকার করেছেন।

রুমী বলল, 'বুঝলে আম্মা, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সুবিধের ঠেকছে না। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এত সেনাপতি, সামন্ত সঙ্গে নিয়ে আসার মানেটা কি ?'

আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল, তবু একটু ধমকের সুরে বললাম, 'তোরা খালি গুজবের আগে ছুটিস। এ খবরের কোনো ভিত্তি নেই তো। লোকে আগাম আশঙ্কা করে বলছে এ কথা। আলোচনা তো কেবল একদিন হয়েছে, দু'চারটে দিন ধৈর্য ধরে দেখ না—নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঐ আনন্দেই থাকো। তোমার কি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি বলতে কিছু নেই আম্মা'—রুমীর কথায় বাধা পড়ল। কলিং বেল বেজে উঠেছে। জামী তড়াক করে উঠে দরজা খুলেই চেঁচিয়ে বলল, 'মা, মা, নিয়োগী চাচা—'

আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে তাই নাকি ? খুব ভালো দিনে এসেছেন তো। আপনাকে আমার খুব দরকার।'

অজিত নিয়োগী ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, 'সেইটে জেনেই তো কেমন এসে পড়েছি, দেখুন।'

শরীফ ও আমি উঠে বসার ঘরের দিকে গেলাম। রুমী, জামী নিয়োগী সাহেবকে আদাব দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

আমি বললাম, 'দাদা, আপনার সঙ্গে আজ আমার কিছু জরুরী কথাবার্তা আছে। বসতে হবে অনেকক্ষণ। আর ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে।'

নিয়োগী দাদা হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে বাপরে। কি এমন সাংঘাতিক কথা জিগ্যেস করবেন ? একেবারে ঠিক ঠিক জবাব চাই ?'

শরীফ খানিকক্ষণ কথা বলার পর উঠে দাঁড়াল, 'আমার অফিস আছে, চললাম। আপনারা সাংঘাতিক সওয়াল জবাব করতে থাকুন।'

শরীফ চলে যাবার পর আমি বললাম, 'আমি খুব স্পষ্ট কথায় দুটো প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবেন কিন্তু দাদা।'

উনি হাসিমুখে বললেন, 'বলুন, আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

আমি খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিলাম, তারপর স্পষ্ট করে কেটে কেটে বললাম, 'এক নম্বর প্রশ্ন—দেশে রক্তস্রোত বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি না। দুই নম্বর প্রশ্ন—আমার কপালে পুত্রশোক আছে কি না।'

প্রশ্ন শুনে নিয়োগী দাদা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম, 'কই জবাব দিচ্ছেন না ?'

নিয়োগী দাদা একটু হাসলেন, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন মনে হল। কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'এসব বিষয়ে কি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়?'

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'কেন যাবে না? আপনি এত বড় অ্যাস্ট্রলজার কত বছর ধরে কত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন, আপনি কি বলতে চান দেশের বিষয় নিয়ে কিছুই ভাবনাচিন্তা করেন নি?'

'করেছি বইকি। তবে—'

'তবে-টবে নয়। কি চিন্তাভাবনা করেছেন, বলুন।'

'রক্তস্রোতের সম্ভাবনা খুবই ছিল। পাকিস্তান হল মকর রাশির অন্তর্গত দেশ। মকর রাশিতে এ সময়ে আছে রাহু ও শুক্র। আর পাশাপাশি দ্বাদশ ঘরে ধনুতে অবস্থান করছে মঙ্গল। রাহু মানে ধ্বংস আর শুক্রের জন্য আগুন আসে। দ্বাদশে মঙ্গল মানেও ধ্বংস। কিন্তু বৃহস্পতি এ সময় বৃশ্চিকে একাদশ ঘরে আছে বলেই ভরসার কথা। অল্পের জন্য ভয়াবহ রক্তস্রোতের সম্ভাবনাটা এড়ানো গেছে।'

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব?'

নিয়োগী দাদা আবারো অস্বস্তিতে পড়েছেন, বোঝা গেল। বহুক্ষণ চুপ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'রুমীর মঙ্গল খুব প্রবল। জানেন তো মঙ্গল যুদ্ধের রাশি। ওকে একটু সাবধানে রাখবেন।'

আমি গোঁয়ারের মতো বললাম, 'ওসব সাবধানে রাখার কথা বাদ দিন। আমার কপালে পুত্রশোক আছে কি না তাই বলুন। ওটা থাকলে লখিন্দরের লোহার ঘর বানিয়েও লাভ নেই।'

অজিত নিয়োগী অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'না। আপনার কপালে পুত্রশোক নেই। তবু ওকে সাবধান রাখবেন।'

আমার বুক থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল। আমি জ্যোতিষশাস্ত্র, ভবিষ্যদ্বাণী—এসব কোনো কিছুতেই কোনোদিনও বিশ্বাস করি নি। অজিত নিয়োগীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সূত্র অদৃষ্ট গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণীর নয়, সাহিত্যালোচনা ও সামাজিক মেলামেশার। এর মধ্যেই ওঁর কয়েকটা গল্পের বই বাজারে বেরিয়েছে। তবু দেশের এই রকম পরিস্থিতিতের রুমীর রহস্যময়, উদ্‌ভ্রান্ত চালচলনে, মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের খুঁটিটা কখন কেমন করে যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। তাই অজিত নিয়োগীর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার ওপর এখন মনেপ্রাণে নির্ভর করতে চাইছি।

১৮ মার্চ
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকা টেলিভিশন স্বাধিকার আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছে তার অভিনব গানের অনুষ্ঠান দিয়ে। এমন অনুষ্ঠান দেখি নাই কভু। ঢাকার যত প্রথম সারির নামকরা সঙ্গীতশিল্পী—ফেরদৌসী রহমান, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ বেগম, আঞ্জুমান আরা বেগম, সৈয়দ আবদুল হাদী, খোন্দকার ফারুক আহমদ, রথীন্দ্রনাথ রায় এবং আরো অনেকে মিলে যখন গাইতে থাকেন—'সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম। চলবেই দিনরাত অবিরাম'—আর তাঁদের কয়েকটা চেহারা হাজার চেহারা হয়ে যায়; তখন মনে হয় বুকের মধ্যে, ঘরের মধ্যে ঝড় উঠে গেছে, সে ঝড়ের মাতামাতি সারাদেশের ছড়িয়ে পড়ছে।

মাসুমাকে জিগ্যেস করি, 'কি করে এমন অবাক কাণ্ড সম্ভব হল ? কে করেছে ?'

মাসুমা বলে, 'এসব মন্টু মামার কীর্তি।'

মন্টু অর্থাৎ মোস্তফা মনোয়ারকে ধরলাম একদিন, 'মন্টু বল না, কি কায়দায় শিল্পীদের একটা মাথা হাজার মাথা হয়ে যায় ? দু'তিন সার দাঁড়ানো মানুষ হাজার মানুষ হয়ে যায় ?'

মোস্তফা মনোয়ার তার স্বভাবসিদ্ধ বিনীত লাজুক হাসি হেসে মাথা চুলকে বলল, 'এই আর কি। যন্ত্রপাতি বিশেষ নেই তো আমাদের। এই আয়না-টায়না দিয়ে অনেক কসরত করে—এই আর কি।'

মন্টুটা এই রকমই। নিজের কোন কৃতিত্বের কথা নিজের মুখে বলতে হলে এই রকমই তো তো করে!

মন্টুর কীর্তি এরকম অভিনব পদ্ধতিতে আরো কয়েকটা গানের টিভি চিত্রায়ন— 'আমার ঘরে আগুন জ্বেলেছে, শান্তি নিয়েছে কেড়ে,' 'জন্ম আমার ধন্য হল মাগো', 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে আমায় বল।' এইসব গান টিভিতে যতো দেখানো হয়, ঢাকার ঘরের ভেতরে সোফায় বসে থাকা শান্ত, নিরীহ মানুষের বুকেও ততো ঝড়ের দোলা লাগে, বাইরে পথে-প্রান্তরে-বন্দরে-জংশনে যারা রক্তাক্ত সংঘর্ষে নেমেছে, তাদের মাঝে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

১৯ মার্চ
শুক্রবার ১৯৭১

আজ রুমী অভিনব স্টিকার নিয়ে এসেছে—'একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন।' বাংলায় লেখা স্টিকার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। রুমী খুব যত্ন করে স্টিকারটা গাড়ির পেছনের কাচে লাগাল। স্টিকারের পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। উনি অবশ্য নিজেকে শিল্পী না বলে 'পটুয়া' বলেন। কয়েকদিন আগে 'বাংলার পটুয়া সমাজ' বলে একটা সমিতি গঠন করেছেন। উনিই তার আহ্বায়ক। গত শুক্রবারে এই সমিতির একটা সভাও হয়ে গেল। শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেন এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। উনি শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার এস. আর. হোসেনের ছোট ভাই।

'বাংলার পটুয়া সমাজ'-এর এই সভাতে শাপলা ফুলকে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে বৃহত্তর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে শিল্পীরা ঠিক করেছেন, কার্টুন, ফেস্টুন, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করে সর্বত্র বিতরণের ব্যবস্থা নেবেন।

এই স্টিকার বোধহয় ঐ কর্মপন্থারই প্রথম পদক্ষেপ।

২২ মার্চ
সোমবার ১৯৭১

ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও গতকাল একমুহূর্ত বিশ্রাম পায় নি বাড়ির কেউ। সারাদিনে এ্যা-তো মেহমান এসেছিল যে চা-নাশতা দিতে দিতে সুবহান, বারেক, কাসেম সবাই

হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু দেশব্যাপী দ্রুত প্রবহমান ঘটনাবলির উত্তেজনায় অন্য সবার সঙ্গে আমিও এত টগবগ করেছি যে টের পাই নি কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে।

সকাল ন'টায় এলেন আমার বড় ননদ লিলিবু ও নন্দাই একরাম ভাই। প্রতি রবিবারে এঁরা নিয়মিত আসে বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটাবার জন্য।

রুমী, জামী আজ সাড়ে আটটাতেই নাশতা খাওয়া শেষ করে কোথায় যেন গেছে। আমি আর শরীফ তখনো খাবার টেবিলে, খবর কাগজ নিয়ে। একরাম ভাই লিলিবুকে বললেন, 'তুমি উপরে যাও বুড়ার কাছে। আমি এইখানে একটু কথা কয়ে যাই।' লিলিবু সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেলেন। একরাম ভাই এসে একটা চেয়ারে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

এর কারণ আছে। রুমীর মতিগতি দেখে শঙ্কিত হয়ে সপ্তাহখানেক আগে একরাম ভাইকে বলেছিলাম, 'আপনি রুমীকে ডেকে একটু কথাবার্তা বলুনতো! ও কি ভাবে, কি চায়—!' একরাম ভাই রুমীকে তাঁর বাসায় ডাকিয়ে দু'দিন কথাবার্তা বলেছেন। আমাকে মুখে কোনো প্রশ্ন করতে হল না, একরাম ভাই নিজেই বলার জন্য এখানে এসে বসেছেন, বুঝতে পারছি।

উনি বললেন, 'রুমীর সঙ্গে আলাপ করে আমি তো হতবাক। এইটুকু ছেলে এই বয়সে এত পড়াশোনা করে ফেলেছে? আগে তো ভাবতাম বড়লোকের ছাওয়াল হুশ হুশ করে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়—চোঙ্গা প্যান্ট পরে, গ্যাটম্যাট করে ইংরেজি কয়—আলালের ঘরের দুলাল। কিন্তু এখন দেখতিছি এ বড় সাংঘাতিক চিজ। মার্কস-এঙ্গেলস একবারে গুলে খেয়েছে। মাও সে তুংয়ের মিলিটারি রাইটিংস সব পড়ে হজম করে নিয়েছে। এই বয়সে এমন মাথা, এমন ক্লিয়ার কনসেপ্সান, বাউরে, আমি তো আর দেখি নাই।'

একরাম ভাইয়ের কথার ধরনই এই রকম। বকুনির সময় যেমন ঠেসে বকে দেন, প্রশংসার সময়ও তেমনি অঢেল প্রশংসা করেন। কোথাও কোনো কিপটেমি নেই।

আমি ছলছল চোখে বললাম, 'এত যে ভালো বলেছেন, এত মাথা নিয়ে এ ছেলে বাঁচলে হয়। কি যে মাথামাতি করে বেড়াচ্ছে! আপনি ওকে আরেকটু বোঝাবেন। এখনো তো বলতে গেলে শিশু ও, কেবল আই.এস.সি পাস করেছে—ছাত্রজীবন সবটাই পড়ে রয়েছে।'

একরাম ভাই 'হুম' বলে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, 'দেশের অবস্থা তো ভালো দেখছি না। ইয়াহিয়া-মুজিবের বৈঠকের কি পরিণতি হবে, তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। গতকাল আবার ভুট্টো এসেছে বারোজন উপদেষ্টা নিয়ে।'

'ওরা খুব ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে। কাগজে দেখলাম ভীষণ কড়া মিলিটারি পাহারায় প্লেন থেকে নেমেছে। হোটেল ইন্টারকনে আছে—সেখানে নাকি ভয়ানক কড়াকড়ি সিকিউরিটি।'

শরীফ বলল, 'কালকে এসেই ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে দু'ঘণ্টা মিটিং করেছে। অথচ ইয়াহিয়া যেদিন এল, সেদিন সারাদিন মুজিবের খোঁজই করল না। পরদিন দুপুরেরও পরে আড়াইটের দিকে দু'জনের বৈঠক হয়েছে।'

একরাম ভাই বললেন, 'কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ভাব মনে হচ্ছে।'

কলিং বেল বেজে উঠল। কাসেম ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলেন মোর্তুজা ভাই, মোস্তফা ভাই।

আমরা খাবার টেবিল থেকে উঠে বসার ঘরের দিকে গেলাম। বসার পর কুশল বিনিময়ও হয় না—সরাসরি প্রশ্ন সবার মুখে : কি মনে হচ্ছে দেশের অবস্থা?

শরীফ বলল, 'আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে জ্বলন্ত বালিতে খৈ ফুটছে। ইয়াহিয়া, মুজিব, ভুট্টো বৈঠক করছে, দেশের সর্বশ্রেণীর লোক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি.এস.পি, ই.পি.সি.এস—সব্বাই নিজ নিজ পেশার ব্যানারে মিটিং করছে, মিছিল করছে। জয়দেবপুরে মিলিটারি, পাবলিকের ওপর গুলি করছে, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মিরপুরে, চট্টগ্রামে, পার্বতীপুর-সৈয়দপুরে বাঙালি বিহারী খুনোখুনি রক্তারক্তি হচ্ছে—সেনাবাহিনী বিহারিদের উস্কানি আর সাপোর্ট দিচ্ছে।'

মোস্তফা ভাই বললেন, 'আগামীকাল কি কোন রকম গোলমাল হবে বলে মনে হয়?'

শরীফ বলল, 'মনে হয় না। তবে জয়দেবপুরের ঘটনায় লোকজন নতুন করে খেপেছে। মিরপুরেও পরিস্থিতি খুব গরম। এদিকে বাঙালিরাও বেশ জঙ্গী হয়ে রয়েছে। গত পরশু বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন গণবাহিনীর কি সব কুচকাওয়াজ হয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় পাঁচশো ছেলেমেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মার্চপাস্ট করেছে। তা দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছে। কাজেই আগামীকাল শেষ পর্যন্ত কি হবে, কিছুই বলা যায় না। আগামীকালও তো আবার পল্টন ময়দানে জয়বাংলা গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ আছে।'

আগামীকাল ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এর জন্য সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন ও উত্তেজনা। জনমনে বিপুল সাড়া ও উদ্দীপনা। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান এবং কর্মসূচী দিয়েছে ২০ মার্চেই। ভাসানী ন্যাপ এই তারিখে স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে রোজই ঢাকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা করছে। অন্যান্য ছাত্রদল ও শ্রমিক দল এবং বিভিন্ন দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও এই দিনকে সামনে রেখে মহা তোড়জোড় শুরু করেছে।

মোর্তুজা ভাই বললেন, 'ভাবী, আজকের কাগজে স্বাধীন বাংলা পতাকার ছবি বেরিয়েছে, দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'দেখব না কেন—ইন্‌ফ্যাক্ট, পতাকা আমি কিনেও এনেছি একগাদা।'

'একগাদা কেন?'

আমি হেসে বললাম, 'যারা শেষ মুহূর্তে কিনতে পাবে না—তাদের বিলোব বলে?'

'তাই নাকি? আনুন তো একটা, দেখি।'

আমি দোতলায় উঠে কয়েকটা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এলাম। ওঁরা সবাই একেকটা হাতে নিয়ে খুলে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'আপনারা নিয়ে যান একটা করে—কাল ওড়াবেন।'

ওঁরা খুশি হয়ে একটা করে নিয়ে গেলেন।

বারোটায় এলেন শরীফের বন্ধু ও সহকর্মী ইঞ্জিনিয়ার বাঁকা ও মঞ্জুর। বাঁকার ভালো নাম এস.আর. খান, কিন্তু বাঁকা নামের বিপুল বিস্তারের নিচে আসল নাম চাপা পড়ে গেছে। ওঁদেরও একটা করে পতাকা দিলাম। ওঁরা যেতে না যেতেই এলেন ফকির। বিকেলে মিনিভাইরা। এমনি করে রাত দশটা পর্যন্ত বহুজন।

দুপুরে খাওয়ার সময় কিটি বলল, 'আম্মা, আমাকে একটা পতাকা দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

আজ কিটি এখান থেকে চলে যাবে। গুলশানে এক আমেরিকান পরিবারে থাকবে আপাতত। গণআন্দোলন, মিটিং, মিছিল ইত্যাদির কারণে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণা ও বিক্ষোভের কারণে কিটির এখন কোন বাঙালির বাড়িতে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। মাত্র দু'দিন আগে ধানমণ্ডিতে মার্কিন কনসাল জেনারেলের বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়েছে, যদিও কেউ হতাহত হয় নি। কিটির নিরাপত্তার কারণেই কিটিকে এখান থেকে সরান দরকার। বিকেলে মিঃ চাইল্ডার এলেন কিটিকে নিতে। খুব ভারি মন নিয়ে কিটি বিদায় নিল। আমাদেরও বেশ মন খারাপ হল।

আরো একটা কারণে আজ মন খারাপ। সুবহান আজ চাকরি ছেড়ে চলে গেল। ওর নাকি আর রান্নাবান্নার কাজ ভালো লাগে না। ও এখন আন্দোলন করবে। তা না হয় করবে। কিন্তু আমাদের বাসার রান্নাবান্নার কি হবে?

২৩ মার্চ
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ প্রতিরোধ দিবস।

খুব সকালে বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ছাদে গিয়ে কালো পতাকার পাশে আরেকটা বাঁশে ওড়ালাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল। আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, ভয়, অজানা আতঙ্ক—সবকিছু মিশে একাকার অনুভূতি।

নাশতা খাওয়ার পর সবাই মিলে গাড়িতে করে বেরোলাম—খুব ঘুরে বেড়ালাম সারা শহরে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে। সবখানে সব বাড়িতে কালো পতাকার পাশাপাশি সবুজে-লালে-হলুদে উজ্জ্বল নতুন পতাকা পতপত করে উড়ছে। ফটো তুললাম অনেক। ঘুরতে ঘুরতে ধানমণ্ডি দুই নম্বর রোডে বাঁকার বাসায় গিয়ে নামলাম। সেখানে খানিকক্ষণ বসে, গেলাম ডাঃ খালেকের বাসায়। বাঁকার বাসার ঠিক সামনেই রাস্তার ও পাশে। ডাঃ খালেকের বাসায় দেখা হল তাঁর শালী মদিরা ও তাঁর স্বামী নেভির অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। নেভি থেকে অবসর নেয়ার পর মোয়াজ্জেম একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন দু'বছর আগে—নামটা বেশ বড়—'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি।' মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যখনি দেখা হয়, তিনি হেসে হেসে বলেন, শেখ সাহেবের ছয় দফা, আমার কিন্তু এক দফা। তা হল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা।'

আজ মোয়াজ্জেম বললেন, 'শেখ সাহেবও এখন একদফা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হয়েছেন।'

'কি রকম?'

'আজ সকালে ওঁকেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলতে হয়েছে ওঁর নিজের বাড়িতে।'

মিসেস খালেক বললেন, 'পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ দেখতে গিয়েছিলেন নাকি?'

'নাঃ। শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম নতুন পতাকা দেখতে। অফিস বিল্ডিংগুলোতেও স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছে। ইন্টার কন্টিনেন্টালেও। ওখানে এত মিলিটারি থাকা সত্ত্বেও পারলো কি করে?

মোয়াজ্জেম বলে উঠলেন, 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। বাঙালির মনও তাই।'

'বিদেশী দূতাবাসগুলোতেও নতুন পতাকা—কি যে ভালো লাগছিল দেখতে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে। কামরুল হাসানের আঁকা কয়েকটা দুর্দান্ত পোস্টার দেখলাম। মিনারের সিঁড়ির ধাপের নিচে সার সার সেঁটে রেখেছে। প্রত্যেকটা পোস্টারে একটা মানুষের মুখ, নিচে লেখা 'এদেরকে খতম কর।' মুখটা একদম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মুখের মতো।'

'বলেন কি? আমাদের যেতে হবে তো দেখতে!'

টেলিভিশনের অনুষ্ঠান যে আজকে শেষই হয় না! অন্যদিন সাড়ে ন'টার মধ্যে সব সুমসাম। আজ দেখি মহোৎসব চলছে তো চলছেই। সুকান্তর কবিতার ওপর চমৎকার দুটো অনুষ্ঠান হল। একটা—'ছাড়পত্র', মোস্তফা মনোয়ারের প্রযোজনা। ডঃ নওয়াজেশ আহমদের ফটোগ্রাফির সঙ্গে কবিতার আবৃত্তি। আরেকটা—'দেশলাই', বেলাল বেগের প্রযোজনা। সুকান্তর দেশলাই কবিতাটি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে টিভি পর্দায় দেখা গেল অসংখ্য দেশলাইয়ের কাঠি একটার পর একটা জ্বলে উঠছে। একটা কাঠি থেকে আরেকটা আগুন ধরতে ধরতে সবগুলো মশালের মতো জ্বলতে লাগল পুরো টিভি পর্দা জুড়ে।

এরপর শুরু হল আবদুল্লাহ আল মামুনের এক নাটক—'আবার আসিব ফিরে।' ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শহীদ একটি ছেলের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একাত্তরের গণআন্দোলনে। নাটক ২৩ মার্চের রাত পৌনে এগারোটায় শুরু হয়ে শেষ হয় ২৪ মার্চের প্রথম প্রহরে। রাত বারোটা বেজে নয় মিনিটে ঘোষক সরকার ফিরোজ উদ্দিন সমাপনী ঘোষণায় বলেন :

'এখন বাংলাদেশ সময় রাত বারোটা বেজে নয় মিনিট—আজ ২৪ শে মার্চ বুধবার। আমাদের অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি।'

এরপর পাকিস্তানি ফ্ল্যাগের সঙ্গে 'পাক সার জমিন শাদবাদের' বাজনা বেজে উঠল।

এতক্ষণে রহস্য বোঝা গেল। ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবসে বীর বাঙালিরা টেলিভিশন পর্দায় পাকিস্তানি পতাকা দেখাতে দেয় নি।

২৫ মার্চ
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

২৩ মার্চের উজ্জ্বল প্রতিরোধ দিবসের পর কি যেন এক কালোছায়া সবাইকে ঘিরে ধরেছে। চারদিক থেকে খালি নৈরাশ্যজনক খবর শোনা যাচ্ছে। ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর বৈঠক যেন সমাধানের কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না। শেখ মুজিব প্রতিদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে যাচ্ছেন আলোচনা করতে, বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলছেন আলোচনা এগোচ্ছে; ওদিকে আন্দোলনকারী জঙ্গী জনতাকে বলছেন দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন।

বেশকিছু দিন থেকে মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিন নাকি প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য এসে নামছে বিমানবন্দরে। বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা, তবু বুক কেঁপে ওঠে। ওদিকে চট্টগ্রাম থেকে দু'তিনজন বন্ধুর টেলিফোনে জানা গেছে—চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সে অস্ত্র চট্টগ্রামের বীর বাঙালিরা খালাস করতে দেবে না বলে মরণপণ করে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। ওদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

রুমীর মুখে দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল খামছে ধরে রুমী বলল, 'আম্মা বুঝতে পারছ না মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ওদের সময় নেবার অজুহাত মাত্র। ওরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে না। স্বাধীনতা আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে।'

আমি শিউরে উঠলাম, 'বলিস কিরে? প্যাকিস্তান আর্মির আছে যুদ্ধের লেটেস্ট মডেলের সব অস্ত্রশস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবি কি দিয়ে?'

রুমী উত্তেজিত গলায় বলল, 'একজ্যাক্ট্লি—সেই প্রশ্ন আমারও। সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ রোজ প্রেসিডেন্ট হাউসে যাচ্ছেন আর আসছেন, আলোচনার কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। ওদিকে প্লেনে করে রোজ সাদা পোশাকে হাজার হাজার সৈন্য এসে নামছে, চট্টগ্রামে অস্ত্রভর্তি জাহাজ ভিড়ছে। আর এদিকে ঢাকার রাস্তায় লাঠি-হাতে বীর বাঙালিরা ধেই ধেই করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে পেট-পুরে মাছ-ভাত খেয়ে ঘুম দিচ্ছে। পল্টন ময়দানে ডামি বন্দুক ঘাড়ে কুচকাওয়াজ করছে। আমরা কি এখনো রূপকথার জগতে বাস করছি নাকি? ছেলেমানুষিরও একটা সীমা থাকা দরকার।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'উপায় বোধহয় আর নেই আম্মা।'

ভয় আর আতঙ্কের একটা হিম বাতাস আমাকে অবশ করে দেয় যেন, 'না, না, ওরকম করে বলিস না। তুই শেখের রাজনীতি সমর্থন করিস না, তাই একথা বলছিস। তোরা হলি জঙ্গী বাঙালি, খালি মার-মার, কাট-কাট। শেখ ঠিক পথেই আন্দোলনকে চালাচ্ছেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও এভাবে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে জনগণ তাদের দাবি ঠিকই আদায় করে নেবে?'

'আম্মা, তুমি কোন আহাম্মকের স্বর্গে বসে আছ? শুধু কয়েকটা বিষয় তলিয়ে দেখ—পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যা যা ঘটছে, সবই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক হিসেবে এগুলো সবই বিষম রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট খোদ হাজির, অথচ দেশ চলছে শেখের কথায়। লোকে অফিস-আদালত-ব্যাঙ্ক সব চালাচ্ছে শেখের সময়ে। তারপর দেখ পাকিস্তান সরকারের হেনস্তা। টিক্কা খানকে কোন বিচারপতি শপথ গ্রহণ করাতে রাজি হল না বলে বেচারা গভর্নর হতে পারল না। শুধু মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটার হয়ে কাজ চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে নামল আর তার বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ। সেনাবাহিনীর জন্য কোন বাঙালি খাবার জিনিস বেচেছে না। ওরা কতদিন ডাল-রুটি খেয়ে থেকেছে। তারপর প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খাবার আনতে হয়েছে। এতসব কাণ্ডের পরও ইয়াহিয়া সরকার একদম মুখ বুজে চুপ করে আছে। কেন বুঝতে পারছ না? ওরা শুধু সময় নিচ্ছে। ওরা আলোচনার নাম করে আমাদের ভুলিয়ে রাখছে। শেখ বড্ডো দেরি করে ফেলছেন। এপথে, এভাবে আমরা বাঁচতে পারব না।'

আমি রাগ করে বললাম, 'দাড়ি কামিয়ে সাবান মেখে ঠাণ্ডা পানিতে ভালো করে গোসল কর দেখি বাপু—মাথা বড্ড বেশি গরম হয়ে গেছে।'

রুমী নীরবে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি কেমন যেন চুপসে গেলাম। নিজের মনেও যেন আর জোর পাচ্ছি না।

আজ আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী-দম্পতি আতিক ও বুলুর বাসায় রাতের খাবার দাওয়াত আছে। এরকম অবস্থায় দাওয়াত খেতে যেতে ইচ্ছে করে না, আবার ঘরে

বসে থাকলেও ফাঁপর লাগে। শরীফের মিটিং ছিল ঢাকা ক্লাবে। অতএব আমি একাই গেলাম আতিকের বাসায়। সেখানে দেখা হল এনায়েতুল্লাহ খান ও তার স্ত্রী লীনার সঙ্গে, লীনার ছোট ভাই জিল্লুর রহমান খান ও তার আমেরিকান বউ মার্গারেটের সঙ্গে। আরো এসেছে আতিকের বন্ধু হালিম ও তার স্ত্রী মণি, আতিকের ভায়রা ভাই ফাত্তাহ ও তার স্ত্রী। সকলের মুখে একই কথা : কি হবে? কি হবে?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নাকি কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে প্লেনে চড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছে? রাস্তায় নাকি ইতোমধ্যেই আর্মি নেমে গেছে? আমি বুঝতে পারছি না আর্মি কেন নামবে।

সাড়ে নয়টার সময় মাসুমা ফিরল টিভি অফিস থেকে। কিছুদিন আগে বড়ভাই রফিকুল ইসলামের বাসা ছেড়ে এখন মেজভাই আতিকুল ইসলামের বাসায় থাকছে। সে এল ঝড়েপড়া পাখির মতো বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। সবার মধ্যে যে আশঙ্কা, তারমধ্যেও তাই। বরং টিভি স্টেশনে সে আমাদের চেয়ে বেশিকিছু শুনেছে। কিন্তু মাসুমা আমাদের সঙ্গে বসল না, বলল, 'খুব বেশি টায়ার্ড আমি, নিজের ঘরে যাই।' অনেক বলা সত্ত্বেও সে খেল না আমাদের সঙ্গে।

আমাদেরও খিদে ছিল না। কোনোমতে খাওয়া সারলাম সবাই। সাড়ে দশটায় শরীফ ফোন করল, 'এখনো দেরি করছ কেন? শহরের অবস্থা ভালো নয়। বহু জায়গায় জনতা নতুন করে ব্যারিকেড দিচ্ছে। ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। অনেক রাস্তায় আর্মির গাড়ি দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এস।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসলাম। রুমী-জামী ছুটে এল এ ঘরে। কি ব্যাপার? দু'তিন রকমের শব্দ—ভারি বোমার বুমবুম আওয়াজ, মেশিনগানের ঠাঠাঠাঠা আওয়াজ, চিঁ-ই-ই-ই করে আরেকটা শব্দ। আকাশে কি যেন জ্বলে-জ্বলে উঠছে, তার আলোয় ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠছে। সবাই ছুটলাম ছাদে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল, মোহসীন হল, আরো কয়েকটা হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশির ভাগ আওয়াজ সেইদিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ, চিৎকার। বেশিক্ষণ ছাদে দাঁড়ানো গেল না। আগুনের ফুলকির মত কি যেন চিঁ-ই-ই-ই শব্দের সঙ্গে এদিক পানে উড়ে আসছে। রুমী হঠাৎ লাফ দিয়ে কালো আর স্বাধীন বাংলা পতাকা দুটো নামিয়ে ফেলল।

হঠাৎ মনে পড়ল একতলায় বারেক, কাসেম ওরা আছে। হুড়হুড় করে সবাই নিচে নেমে গেলাম। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে উঠানের দিকের দরজাটা খুলতেই আমাদের অ্যালসেসিয়ান কুকুর মিকি তীর বেগে ঘরে ঢুকে আমাদের সবার পায়ে লুটোপুটি খেতে খেতে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। উঠানের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম, 'বারেক—কাসেম।' ওদের ঘরের দরজা খুলে বারেক, কাসেম কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, 'তোমরা তোমাদের বিছানা নিয়ে এ ঘরে চলে এস।'

মিকিকে কিছুতেই আর ঘর থেকে উঠানে নামানো গেল না। এত গোলাগুলির শব্দ ও ট্রেসার হাউইয়ের নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। রুমী তার ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ভয় নেই, মিকি ভয় নেই। তুই আমাদের সঙ্গে উপরে থাকবি।' তাকে উপরেও নেয়া গেল না। কি এক মরণ ভয়ে ভীত হয়ে সে খালি কোণা খুঁজছে। শেষে সিঁড়ির নিচের ঘুপচি কোণটাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল।

বসার ঘরে ফোন তুলে দেখি, ফোন ডেড। উপরে উঠে গেলাম। বাবার গলা শুনলাম। রুমী গিয়ে বাবার হাত ধরে মৃদু স্বরে তাঁকে কি কি যেন বলতে লাগল।

বাকি রাত আর ঘুম এল না। আবার ছাদে গেলাম। দূরে দূরে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দিক থেকে গোলাগুলি, মেশিনগানের শব্দ আসছে, ট্রেসার হাউই আকাশে রংবাজি করে চলেছে—দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে সবদিকেই দূরে আগুনের স্তম্ভ ক্রমেই স্পষ্ট ও আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। রুমী, জামী নীরবে থমথমে মুখে সুতলির বাঁধন খুলে প্লাস্টিক ব্যাগ একে একে উপুড় করল কমোডে। একটু করে ফ্ল্যাশ করে, খানিক অপেক্ষা করে, আবার ঢালে, আবার ফ্ল্যাশ করে। এক সঙ্গে সব মালমশলা ঢাললে কমোডের নল বন্ধ হয়ে যাবে। জামী বাসনমাজা পাউডার দিয়ে তিন চারবার করে হামানদিস্তা দুটো মাজল আর ধুল। একবার ধুয়ে শুঁকে দেখে, আবার মাজে, আবার ধোয়।

এ কাজ সেরে রুমী মার্কস, এঙ্গেলসের বই, মাও-সে-তুংয়ের মিলিটারি রচনাবলি সব একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরল। আমরা চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় বইগুলো লুকোনো যায়। মাটিতে পুঁততে চাইলে, বইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে মনে পড়ল বারেকদের ঘরের পেছনে বাউন্ডারি ওয়ালের এক জায়গায় একটা কোটরমতো আছে। প্রতিবেশী হেশাম সাহেবের বাউন্ডারি ওয়ালের দরুন এই কোটরটার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বইয়ের প্যাকেটটা ফেলে দিলে লুকোনোও থাকবে, নষ্ট হবে না। ভোরের আলো অল্প একটু ফুটতেই রুমী সাবধানে গুড়ি মেরে ওখানে গিয়ে বইয়ের প্যাকেটটা রেখে দিল। তার ওপর ফেলল কয়েকটা শুকনো নারকেলের পাতা।

২৬ মার্চ
শুক্রবার ১৯৭১

ছ'টার দিকে হঠাৎ কানে এল খুব কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট গলার ডাক—'আপা, আপা'। চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বাগানের একটা জবা গাছের নিচে কুঁকড়ি মেরে বসে আছেন কামাল আতাউর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্স পরীক্ষার্থী, মোহসীন হলে থাকে। ছুটে নিচে নেমে গেলাম। দরজা খুলে উদ্‌ভ্রান্ত, প্রায় অচেতন কামালকে ধরে তুলে ঘরে নিয়ে এল রুমী-জামী। ও সারারাত হলের একতলার একটা বাথরুমে আরো দশ-বারোটা ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে ছিল। ট্রেসার, হাউইয়ের দরুন রাতে বেরোতে সাহস পায় নি। এখন সকালের আলো ফুটতে ট্রেসার হাউই বন্ধ হয়েছে। ওরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে মাঠ, খানা-খোন্দল, রেললাইন পুরো এলাকাটা চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কামালকে সুস্থ করে রেডিও খুললাম। সুরা বাকারার পর খালি একটা বাজনাই বারেবারে বাজছে—আমার প্রিয় একটা গান 'কোকিল ডাকা, পলাশ-ঢাকা আমার এদেশ ভাইরে'—এই গানের সুরে তৈরি যন্ত্রসঙ্গীত। সাতটার সময় পাশের ডাঃ এ. কে. খানের বাড়ি গেলাম ফোন করতে। ওঁদের ফোনও ডেড। ক্রমে ক্রমে আমাদের রাস্তার আরো সব বাড়ির লোকজন সাবধানে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। সবারই মুখে আতঙ্ক। সবাই সারারাত জেগেছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছি না—কি হচ্ছে। সব বাড়ির ফোনই ডেড।

বাড়ি চলে এসে খাবার টেবিলে বসে রইলাম, রেডিও সামনে নিয়ে। জামীকে

বললাম, 'বারেককে সঙ্গে নিয়ে দাদাকে ওঠাও, মুখ ধোয়াও, নাশতা খাওয়াও।'

কাসেম যন্ত্রচালিতের মত টেবিলে চা-নাশতা দিয়ে গেল। নাশতা ফেলে সবাই চায়ের কাপ টেনে নিলাম।

সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হল। শোনা গেল একটা রুক্ষ অবাঙালি কণ্ঠস্বর। প্রথমে উর্দু এবং পরে ইংরেজিতে বলল। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে। কারফিউ ভঙ্গ করে কেউ বাইরে বেরোলে কি শাস্তি, তাও বলল। আর বলল, 'মার্শাল ল' জারি করা হয়েছে। তার নিয়ম কানুনগুলো এক এক করে বলে যেতে লাগল। বেতার-ঘোষকের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি শুনে মনে হল লোকটা একটা সেপাই-টেপাই কিছু হবে। সামরিক সরকার আর কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে ওকে দিয়ে ঘোষণাগুলো করাচ্ছে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। যা তাণ্ডব হচ্ছে চারদিকে, কারফিউ না দিলেও বাইরে বের হয় কার সাধ্যি! গোলাগুলির শব্দ থামেই না। মাঝে-মাঝে কমে শুধু। আগুনের স্তম্ভ দেখার জন্য এখন আর ছাদে উঠতে হয় না। দোতলার জানালা দিয়েই বেশ দেখা যায়। কালো ধোঁয়ায় রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীল আকাশের অনেকখানিই আচ্ছন্ন।

মিকির কান্নায় অস্থির হয়ে উঠেছিল সবাই। ওর অ্যালসেসিয়ান চরিত্রই বদলে গেছে যেন। অবিশ্রান্ত গোলাগুলির শব্দে এই জাতের সাহসী কুকুর যে এরকম কাহিল ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়বে, তা কে ভেবেছিল? ওকে কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। আমরা সবাই পালা করে ওকে কাছে টেনে ওর গলা জড়িয়ে ধরে সুস্থির রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না।

বাবাকে নিয়েও হয়েছে মুশকিল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কেন, কি দোষে নিজের দেশের লোকজনকে মারছে, তা ওঁকে বোঝাতে গিয়ে আমাদের সবার মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেল। আমার ভয় হচ্ছে ওঁর আবার ব্লাড প্রেসার না বেড়ে যায়।

টেলিফোন বিকল, রেডিও পঙ্গু, বাইরে কারফিউ-গোলাগুলির শব্দের চোটে প্রাণ অস্থির, বাইরে কি হচ্ছে কিছুই জানবার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী স্কুপ সংবাদদাতা কামাল আতাউর রহমান। সকাল থেকে আমার বারবার প্রশ্নে একই কথা বলতে বলতে কামালও যেন হাঁপিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।

'আচ্ছা কামাল, রাত বারোটার সময় তুমি কি করছিলে?'

'আমি? আমি একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম—'বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম।' ২৭ তারিখে রেডিও প্রোগ্রামে পড়বার জন্য।

'কখন গোলাগুলির শব্দ শুনলে?'

'ঐ বারোটার দিকেই। হয়তো দু'চার মিনিট পরে। আমার এক বন্ধু এসে বলল 'তুই এখনো হলে রয়েছিস? জানিস না শহরের অবস্থা ভয়ানক খারাপ? আর্মি আসছে ক্যাম্পাস অ্যাটাক করতে? আমি বাড়ি চললাম। তুইও বেরিয়ে যা।' কিন্তু আমরা কেউই আর বেরোবার চান্স পেলাম না। তখুনিই কানে এল ভয়ানক গোলাগুলির শব্দ। একটু পরেই চারদিক আলো হয়ে উঠতে লাগল। একবার করে আলো জ্বলে আর গুলিগোলা ছোটে। আমার ঘর ছিল পাঁচতলায়, তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে এলাম। হাজী মোহসীন হলের দক্ষিণে ইকবাল হল—তার ওপাশে এস. এম. হল। মনে হল ভারি ভারি কামানের গোলা দিয়ে মিলিটারিরা ইকবাল হল উড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের হলের দিকে গুলি ছুটে আসছিল।'

'তোমাদের হল আক্রমণ করে নি?'

'না, আমরা প্রতি মুহূর্তে ভয় করছিলাম, এই বুঝি হাজী মোহসীনেও এল। কিন্তু ওরা আসে নি।'

'আর কোথায় কোথায় ওরা অ্যাটাক করেছে বলে মনে হয়?'

'ঠিক বলতে পারবো না। মনে হয় এস. এম. হল, জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার। ঐদিক থেকেই শব্দ বেশি পাওয়া গেছে।'

'তোমার কি মনে হয়? ইকবাল হল, এস. এম. হল সব একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে? সব ছেলেদের মেরে ফেলেছে?'

'কি করে বলব? আমরা তো একতলার বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম। শব্দ শুনে মনে হয়েছে ভারি ভারি গোলা। মোহসীন হলের মাথার ওপর দিয়েও গুলি ছুটে আসছিল। জানালার কাচ ভাঙার শব্দ পেয়েছি সারারাতই।'

এক পর্যায়ে কামাল বাথরুমে গেলে রুমী আমাকে বলল, 'ওকে আর জিগ্যেস কোরো না তো আম্মা। দেখছ না ওর কষ্ট হচ্ছে।'

'তাতো দেখছি। কিন্তু কি যে হচ্ছে চারদিকে, তাই বুঝবার জন্য—'

'বুঝবার আর কি আছে আম্মা? যা ঘটবার কথা ছিল, তাইতো ঘটেছে।'

চুপ করে রুমীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। রুমী চোখ ফিরিয়ে নিল। কাল রাত থেকে ও বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। থম ধরে আছে। আমি ভাবছি : রুমীর কথাই ঠিক হল। রুমী নিশ্চয় ভাবছে, কেমন জব্দ আম্মা? আহাম্মকের স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়েছ তো।

কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়। এক সময় উঠে সদর দরজা খুলে গাড়ি-বারান্দায় গেলাম। আমাদের বাসার সামনের এই গলিটা কানা। এলিফ্যান্ট রোড থেকে নেমে এসে আমাদের বাসা পেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। ওই বন্ধ জায়গাটার ওপরে ডাঃ এ. কে. খানের বাড়ি। বন্ধ গলি হওয়ার মস্ত সুবিধে—এখানে বাইরের লোকের চলাচল বা ভিড় নেই। এ রাস্তার বাড়িগুলোর বাসিন্দারা—আমরা—অনেক সময় গলির ওপর দাঁড়িয়ে গল্প করি। গলিটা যেন আমাদের সকলের এজমালি উঠান। ১৯৫৯ সালে এখানে বাড়ি করে উঠে আসার পর থেকে এদেশে যতবার কারফিউ পড়েছে, আমরা বাড়ির সামনের এই গলিতে দাঁড়িয়ে বহু সময় গল্পগুজব করে কাটিয়েছি। আজ কিন্তু গাড়ি-বারান্দা পেরিয়ে গলিতে পা রাখতে সাহস হল না। গোলাগুলির শব্দে এখনো আকাশ ফাটছে। মাঝে-মাঝে কুকুরের চিৎকার কানে ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন মানুষেরও চিৎকার। খুব অস্পষ্ট। নাকি আমার ভুল? এত বিরামহীন গোলাগুলির পরও কোন মানুষ কি বেঁচে আছে চিৎকার দেয়ার জন্য? আশ্চর্যের ব্যাপার, একটা কাক, চিল কি কোন পাখির ডাক নেই।

বাউন্ডারি ওয়ালের এপাশে শরীর রেখে শুধু মুখটা বাড়ালাম গেটের বাইরে, বাঁদিকে তাকালাম মেইন রোডের পানে। জনশূন্য রাস্তা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হয়তো সৈন্যভর্তি জীপ বা ট্রাক চলে যেতে দেখব। কিন্তু দরকার নেই তা আমাদের দেখে। আমার মুখোমুখি বাসাটা হোসেন সাহেবের। উনি খোলা দরজার ঠিক ভেতরেই চেয়ারে একবার বসছেন, আবার উঠে বারান্দায় আসছেন, আবার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যাচ্ছেন। বাঁ পাশে ডাঃ রশীদের বাড়ি। উনিও অস্থিরভাবে ঘর-বারান্দা করছেন—এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ফিরে, ঘুরে ঢোকার মুখে গাড়ির দিকে নজর পড়তেই আঁতকে উঠলাম। কাচ জুড়ে জ্বলজ্বল করছে সেই স্টিকার।—'একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন।' দ্রুত ঘরে ঢুকে রুমীকে ডাকলাম,

'রুমী, রুমী, শিগগির গাড়ির স্টিকার উঠিয়ে ফেল।'

ঠিক সন্ধ্যার মুখে কারেন্ট চলে গেল। বাঃ বেশ। এবার ষোলকলা পূর্ণ হল। গোলাগুলির শব্দ একটু কমেছে মনে হল। মিকিও যেন একটু ধাতস্থ হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের এক পাশের ঢাকা জায়গায় তার নিজস্ব জলচৌকিটায় গিয়ে বসেছে। সামান্য কিছু খেয়েছেও।

আমি চার-পাঁচটা মোমবাতি বের করে একতলা দোতলায় তিন-চার জায়গায় বসিয়ে দিলাম। আজ সারাদিন বারেক, কাসেম আমাদের চারপাশেই ঘোরাঘুরি করেছে। সন্ধ্যের সময় বারেক-কাসেমকে বললাম, 'তোরা এখুনি তোদের বিছানাপত্র এনে গেস্টরুমে রাখ। অন্ধকারে উঠোনে বেরিয়ে কাজ নেই।' ওরা কৃতজ্ঞমুখে দৌড়োদৌড়ি করে বিছানাপত্র এনে রেখে আমাদের কাছাকাছি মাটিতে এসে বসল। মনে হল আমরা সবাই নূহের নৌকায় বসে আছি।

বাড়িতে একটা ভালো রেডিও নেই। এবার ২০ ফেব্রুয়ারির শেষ রাতে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই বাইরে ছিলাম—সেই ফাঁকে বাসায় চোর ঢুকে অনেক জিনিসের সঙ্গে আমাদের ভালো রেডিওটাও নিয়ে যায়। এতোদিন কিটির দামী রেডিওটাই ব্যবহার করতাম, ও গুলশানে চলে যাওয়াতে রুমী-জামীর নড়বড়ে টু-ইন-ওয়ানটা দিয়ে কোন মতে কাজ চালাই। কিন্তু এটাতে বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসটা ধরা যায় না। আকাশবাণীও ঢাকার রাস্তায় আর্মি নেমেছে, এর বেশি কিছু বলে নি। টিভি বন্ধ। কি আর করি। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজের লোকদের রেহাই দিলাম। সবাই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, হঠাৎ রুমী থমকে দাঁড়াল, 'মিকির কোন সাড়াশব্দ নেই যে? একেবারে নর্মাল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

জামী বলল, 'ওকে ভেতর আনা হয় নি।'

আবার আমরা সবাই নিচে নামলাম। দরজা খুলে উঠানে নেমে মিকির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখলাম মিকি মরে পড়ে আছে।

২৭ মার্চ
শনিবার ১৯৭১

গতকালও সারারাত জাগা। গোলাগুলির শব্দ, আগুনের স্তম্ভ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সকালের দিকে গোলাগুলির শব্দটা খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ হল। তখন সব বাড়ি থেকে মুখ বাইরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। বারেক-কাসেম সাহস করে গেটের বাইরে দাঁড়াল। একটু পরেই দৌড়ে এসে বলল, 'আম্মা, রাস্তায় লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া চলতাছে।'

সেকি! রেডিওতে তো কারফিউ তোলার কথা বলেনি। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। রেডিও'র ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের নাশতা দিতে বলে কাপড় বদলাতে গেলাম। সাড়ে আটটায় রেডিওতে কারফিউ তোলার ঘোষণা দেওয়ামাত্র আমি আর রুমী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কামাল বিদায় নিয়ে চলে গেল তার ভাইয়ের বাড়িতে। জামী থাকল বাসায় বাবার কাছে। শরীফ বলল, 'আমি রিকশা নিয়ে বাঁকার ওখান থেকে ঘুরে আসি।'

এলিফ্যান্ট রোডে উঠে বললাম, 'প্রথম মায়ের বাসায় চল। তারপর হাসপাতালে।'

রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে কিন্তু গাড়িটা দিতে হবে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য।'

'দেব। আগে দরকারি কাজ সেরে নিই।'

নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারের সামনে পৌঁছেই রুমী হঠাৎ 'ও গড!' বলে ব্রেক কষে ফেলল। সামনেই পুরো কাঁচাবাজার পুড়ে ছাই হয়ে রয়েছে। এখনো কিছু কিছু ধোঁয়া উঠছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মানুষও পুড়েছে। ওই সে পোড়া চালার ফাঁক দিয়ে—'

রুমী জোরে গাড়ি চালিয়ে—'আম্মা, তাকায়ো না ওদিকে' বলে ডানদিকে মিরপুর রোডে মোড় নিল।

ঢাকা কলেজের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে দেখা গেল উল্টোদিক থেকে ওয়াহিদ আসছে হনহন করে হেঁটে, চারদিকে তাকাতে তাকাতে। জুবলী ভাইয়ের ছেলে ওয়াহিদ। রুমীর চেয়ে দু'তিন বছরের বড় হলেও তার বন্ধু। রুমী গাড়ি থামিয়ে ওকে তুলে নিল, 'কোথায় যাচ্ছ বাবু ভাই?'

'জেবিসদের বাসায়। ওরা বেঁচে আছে কি না জানি না। থাকলে ওদেরকে নিয়ে আসব আমাদের বাড়িতে। ধানমণ্ডি এলাকা খানিকটা নিরাপদ।'

আমি বললাম, 'আগে ছয় নম্বর রোডে গিয়ে মাকে একটু দেখে আসি? তারপর আমারও যাব জুবলীদের বাসায়।'

ধানমণ্ডির দিকে তেমন তাণ্ডব হয় নি, তবু দু'নম্বর রোডের ই.পি. আর থেকে যে শব্দ এসেছে, তাতেই মা আর লালুর রাত-জাগা চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত। দ্রুত স্বরে ওঁদের কুশল জিগ্যেস করে, বাজার-সদাই কিছু লাগবে কি না জেনে নিয়ে, আবার রাস্তায় নামলাম। নীলক্ষেত ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের পঁচিশ নম্বর বিল্ডিংয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম থাকে। ওয়াহিদের ফুপা। আমাদের পরিবারের সঙ্গেও ওদের খুব ঘনিষ্ঠতা। ওদের ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্র খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রক্তাভ চোখ, উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে রফিক দৌড়ে এল আমাদের দিকে, ফোঁপানোর মত করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বুবু, বুবু, আমরা আর নেই! শিগগির নিয়ে যান আমাদের এখান থেকে।'

রফিকের স্ত্রী জুবলী, ওদের ছেলেমেয়ে বর্ষণ ও মেঘলা—সকলেরই বিধ্বস্ত অবস্থা। পঁচিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের পেছনেই ইকবাল হল। অতএব শেল, মর্টারের ছিটকানো টুকরা, হেভি মেশিনগানের গুলি, সব এসে বাড়ি খেয়েছে পঁচিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের দেয়ালে, জানালার কাচে। জানালা ভেদ করে এ পাশের দেয়ালে পর্যন্ত গেঁথে গেছে গুলি। রফিকরা সবাই দু'রাত একদিন খাটের নিচে মেঝেতে মাথা গুঁজে পড়ে থেকেছে।

জুবলী ওয়াহিদকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, ওয়াহিদ বলল, 'কেঁদ না জেবিস, তোমাদেরকে এক্ষুণি আমাদের বাসায় নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'জুবলী, তোমরা তাড়াতাড়ি একটা দুটো সুটকেস গুছিয়ে নাও। হাসপাতালে আমার দেওরের মেয়ে আছে। ওকে দেখে এসেই তোমাদেরকে তুলে বাবুর বাসায় নিয়ে আসব।'

পঁচিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে লক্ষ্য করলাম, দলে দলে লোক বাক্স-বোঁচকা ঘাড়ে-মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে। সমস্ত রিকশা লোকজন-বাক্স-পেটরা বোঝাই হয়ে ছুটে চলেছে। একটাও খালি রিকশা চোখে পড়ল না। পথযাত্রীরা মাঝে-মাঝে প্রাইভেট গাড়ি থামানোর জন্য হাত তুলছে। দু'তিনটি বাচ্চাসহ একটি পরিবার আমাদের গাড়িটি থামিয়ে বলল, 'আমাদের একটু মালিবাগে নামিয়ে দিবেন? একটাও রিকশা পাচ্ছি না।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাদের নিজেদেরই আত্মীয়স্বজন আনা-নেওয়া করতে হবে। হাসপাতালে আমাদের আগুনে-পোড়া রুগী আছে। আমাদের সময় নেই। মাপ করবেন।'

না পেরে খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এখন মালিবাগে যাবার সময় নেই আমাদের।

হাসপাতালের আউটডোর গেটে ঢোকার আগে রুমী আরেকবার 'ও গড!' বলে ব্রেক কষে ফেলল। পাশেই শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলো গোলার আঘাতে ভেঙে দুমড়ে মুখ থুবড়ে রয়েছে। আমার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। একি করেছে ওরা! শহীদ মিনারের গায়ে হাত? চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথায় জাল-দেয়া হেলমেট পরা সৈন্য। আমি চাপাস্বরে বললাম, 'রুমী, ভেতরে ঢোক। সময় নেই বেশি।'

গাড়ি পার্ক করে আমরা ছুটলাম আউটডোরের লম্বা করিডোর দিয়ে ভেতরে। পুরো হাসপাতাল লোকে লোকারণ্য। কেউ এসেছে আহত আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে। কেউ এসেছে নিখোঁজ আত্মীয়-বন্ধুর খোঁজ করতে। ভয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে বহু লোক। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার মুখে বাধা পেলাম। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হাই স্যারের স্ত্রী আনিসা বেগম, মেয়ে হাসিন জাহান, ওর বড় ভাই ও ভাবী এবং বাড়ির অন্য সবাই করিডোরে দাঁড়িয়ে। আনিসা ভাবী ও হাসিন জাহান দু'জনেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। হাই স্যার কয়েক বছর আগে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেও তাঁর পরিবার এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাটেই বাস করছেন। ওঁদের চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংটা শহীদ মিনারের ঠিক উল্টোদিকেই। আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম, হাসিন জাহান কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'খালাম্মা, আমাদের বিল্ডিংয়ে আর্মি ঢুকে মেরে-ধরে সব একাকার করেছে, মনিরুজ্জামান স্যার মরে গেছেন, জ্যোতির্ময় স্যার গুরুতর জখম—'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'আমাদের মনিরুজ্জামান স্যার?'

'না, বাংলা নয়। স্ট্যাটিস্টিক্সের। খালাম্মা গো, আমাদের বিল্ডিং রক্তে ভেসে গেছে।'

'তোমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকেনি তো?'

'আমরা বাইরের দরজার তালা ঝুলিয়ে সব খাটের তলায় চুপ করে পড়েছিলাম। অনেক ধাক্কাধাক্কি করেছে কিন্তু আমরা টু শব্দটি করি নি। তাই ভেবেছে কেউ নেই। তাই আমরা বেঁচে গেছি। আজ কারফিউ ওঠামাত্রই এককাপড়ে হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছি।

ওদের সঙ্গে দু'চার মিনিট কথা বলে ছুটলাম তিনতলার নিউ কেবিনে। এতবড় হাসপাতালের সব তলার প্রশস্ত করিডোরগুলো ভীড়, সন্ত্রস্ত, ক্রন্দনরত লোকের ভিড়ে ঠাসা। দু'হাতে লোক ঠেলে এগোতে হচ্ছে। ইমনের কেবিনে ঢুকে দেখলাম আনোয়ার ইতোমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। ইমন আধ-মরার মত বিছানায় শুয়ে আছে। ইমনের মা শেলী বরাবরই ধীর, স্থির, শান্ত—সব সময় হাসে। আজও তার স্থিতধী ভাব দেখে অবাক হলাম। এতবড় ধকলের ছাপ তার রাত-জাগা চোখে, এলোমেলো চুলে, কুঁচকানো শাড়িতে অবশ্যই আছে, কিন্তু মুখের হাসিটি অন্তর্হিত হয় নি। হাসপাতালে লাইট নেই, পানি নেই, খাবার নেই, শহীদ মিনারের ওপর ক্রমাগত শেলিংয়ে হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের ওই দিকটা প্রায় বিধ্বস্ত। একটা জানালারও কাচ নেই। দেয়ালগুলো গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা। বহু ডাক্তার সপরিবারে হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এই রুগী সামাল দিলে কি করে? তুমি খেয়েছ কি এই ক'দিনে?' ক্লান্ত মুখে একটু হেসে শেলী বলল, 'কোনমতে রুটি, বিস্কুট, ডাবের পানি দিয়ে চালিয়েছি। আর, ডাক্তারের অভাব ছিল না বলে তেমন ঘাবড়াই নি।'

মনে মনে শেলীকে ধন্য ধন্য করে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসে রুমী বলল, 'আম্মা, একবার সাদের বাসা যেতে চাই।' সাদ আন্দালিব রুমীর একমাত্র বন্ধু—যে রুমীর চেয়ে বয়সে বড় নয় এবং একই ক্লাসে পড়ে।

'রফিকদের আগে বাবুর বাসায় পৌঁছে দিই। কিছু বাজার-সদাই করে তোর নানীকে পৌঁছে দি, তারপর তুই গাড়ি নিয়ে যাস।'

রুমী আমাকে বাড়িতে নামাবার জন্য গেটে গাড়ি ঢোকাতেই দেখি বদিউজ্জামান আমাদের পোর্চে সাইকেল থেকে নামছে।

বদিউজ্জামান বাংলা একাডেমিতে চাকরি করে। বহু বছর থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তার শ্বশুর আবদুল কুদ্দুস ভুঁইয়ার বাড়ি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশেই। বদিউজ্জামানের স্ত্রী কাজল দু'মাসের বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়িতে ছিল। বদিউজ্জামান ছিল এলিফ্যান্ট রোডে তার চাচার বাড়িতে। আজ সকালে কারফিউ উঠলে সে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে শোনে গত দু'রাত একদিনে সেখানে কি তাণ্ডব হয়ে গেছে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশরা পাক আর্মির সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করার সময় ভুঁইয়া সাহেবের বাড়িসহ আশেপাশের কয়েকটি বাড়িতেও পজিসান নেয়। পালাবার সময় তারা সারা বাড়িতে অস্ত্র, ইউনিফর্ম সব ফেলে ছড়িয়ে গেছে। এখন ওঁদের আর ঐ বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। তাই বদিউজ্জামান অন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। প্রথমে ওদের আত্মীয়, সাংবাদিক কে. জি. মোস্তফার আজিমপুরের বাসায় যায়। কিন্তু কে. জি. মোস্তফার কারণেই তার বাড়ি নিরাপদ নয়। বরং তাঁরই অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত। বদিউজ্জামান তার আরেক পরিচিত মিসেস মেহের দেলোয়ার হোসেনের বাড়িতেও গিয়েছিল। এঁর ছেলেমেয়েদের বদি কিছুদিন পড়িয়েছিল। উনি শুধু কাজলকে বাচ্চাসহ রাখতে পারবেন বলেছেন। এখন বাকিদের ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি বললাম, 'মা'র বাড়ির একতলাটা খালি পড়ে আছে। ওখানে তোমরা সবাই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।'

অতএব বদিকে নিয়ে আবার মা'র বাড়ি! মা'র সাথে কথা বলে বদিউজ্জামানদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরে এলাম।

মিকির লাশের কথা সবাই ভুলে গেছি। ভুলব না-ই বা কেন ? যা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সারা সকাল ছুটোছুটি করেছি। সারা ঢাকা জুড়ে সবাই ছুটোছুটি করছে। পরিচিত যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে, যে যা শুনেছে, পরস্পরকে জানিয়ে যাচ্ছে। যত জানছি, ততই মন জগদ্দল পাথরের চাপে বসে যাচ্ছে। এর মধ্যে রুমী অস্থির হয়ে উঠেছে। আমাকে কোনমতে বাড়িতে নামিয়ে আবার ছুটবে বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নিতে।

যখন খেয়াল হয়েছে, তখন কারফিউ শুরু হতে আর ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট বাকি আছে। এর মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করে মেথর খুঁজে আনা অসম্ভব ব্যাপার। তবু শেষ মুহূর্তে বারেক-কাসেমকে পাঠালাম, পইপই করে বলে দিলাম বেশি দূরে না যেতে। কারফিউ শুরু হলে রাস্তায় দেখলেই মিলিটারি গুলি করবে। সেই ভয়ে তারা দশ মিনিট পরেই ছুটে বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'কোথাও মেথর নেই।'

এই আরেকটা মস্ত দুশ্চিন্তা চাপল মাথায়। কালকের আগে আর মিকির লাশ সরানো যাবে না—এর মধ্যে পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। একে বিভিন্ন দুঃসংবাদে মন বিধ্বস্ত তার ওপর এই ঝঞ্ঝাট।

শরীফ বাঁকার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে গাড়িতে বহু জায়গায় ঘুরে অনেক খবর যোগাড় করে এনেছে। রুমীও বন্ধুদের বাড়ি চরকি ঘুরোন দিয়ে অনেক খবর জেনে এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী মধুর ক্যান্টিন আর নেই। পুড়ে ছাই হয়েছে। মধুদাও নেই। পাকসেনার গুলিতে মরেছে। স্ট্যাটিস্টিক্‌সের মনিরুজ্জামান সাহেব ছাড়াও আরো অনেক শিক্ষককে পাক আর্মি মেরে ফেলেছে। ডঃ জি. সি. দেব, ডঃ এফ. আর. খান, মিঃ এ. মুকতাদির। কলকাতা রেডিওতে নাকি বলেছে, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম ও বেগম সুফিয়া কামাল পাক আর্মির গুলিতে মারা গেছেন। নীলিমা আপা আর সুফিয়া কামাল আপার কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বাঙালি পুলিশরা বেশিরভাগ প্রাণ দিয়েছে। অল্প কয়েকজন পালাতে পেরেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন এখন পাকসেনার গুলিতে ঝাঁঝরা।

পাক আর্মি 'দি পিপল' অফিস পুড়িয়েছে, পুড়িয়েছে ইত্তেফাক অফিস। ঢাকায় যত বাজার আছে, বস্তি আছে, সব জায়গা আগুনে পুড়ে ছাই—ছাই হয়েছে রায়েরবাজার, ঠাটারী বাজার, নয়াবাজার, শাঁখারী পট্টি।

শরীফ প্রত্যক্ষদর্শীর খবর এনেছে বাঁকার কাছ থেকে। বাঁকার বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টার্স। রাত দুপুরে সেখানে গোলাগুলি শুরু হলে বাঁকা আর তার সম্বন্ধী কাইয়ুম ছাদে গিয়ে ব্যাপার দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেন। সেখানে খুব গুলিগোলা চলছে বোঝা যায়, তবে ট্রেসার হাউই ও ছিটকে আসা গুলির জন্য ওঁরা বেশিক্ষণ ছাদে থাকতে পারেন নি। গোলাগুলির শব্দে ওঁদের বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বাঁকারা সবাই সিঁড়ির নিচে জড়ো হয়ে বসেছিলেন। ভোর চারটের দিকে কয়েকজন ই.পি.আরের লোক পালিয়ে বাঁকাদের বাড়িতে ঢোকে। ওঁদের গ্যারেজের পেছনে মাটির নিচে একটা ঘর আছে, সেই ঘরে আশ্রয় দেয়া হয় লোকগুলোকে। কিন্তু ই.পি.আর. হেড কোয়ার্টার্সের এত কাছে লুকিয়ে থাকতেও তাদের ভরসা হয় নি বোধহয়। তাই সকালের আলো পরিষ্কার হবার আগেই তারা ওখান থেকেও পালিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

বাঁকার বাসার ছাদের পতাকা নামানোর কথা কারো খেয়াল ছিল না। ২৬ তারিখের সকালে পাকিস্তান আর্মির মেশিনগান ফিট করা ট্রাক ধানমণ্ডির রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে দিতে বাঁকার ছাদে পতাকা দেখে বাসার দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। বাঁকারা প্রথমে বুঝতে পারেন নি কেন তাঁদের বাসার দিকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। পরে বুঝতে পেরে প্রাণ হাতে নিয়ে বুকে হেঁটে অনেক কষ্টে পতাকা নামিয়ে আনেন।

সবচেয়ে দুঃখজনক খবর ডাঃ খালেকের ভায়রাভাই কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে পাক আর্মি মেরে ফেলেছে। সায়েন্স ল্যাবরেটরি রোডে কারমো ফোমের মস্ত সাইনবোর্ড আঁটা তিনতলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় তাঁর বাসা ছিল। সাধারণত রাতে তিনি বাড়িতে থাকতেন না, কারণ আগরতলা মামলার অন্যতম 'আসামী' এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোয়াজ্জেমের ওপর আগে থেকেই আর্মির নজর ছিল। মোয়াজ্জেমের দুর্ভাগ্য, ঐ রাতটা তিনি বাড়িতে ছিলেন। মৃত্যু তাঁকে টেনেছিল, তাই বোধহয়। শুনে খুব কষ্ট হয়। মাত্র তিনদিন আগে ২৩ মার্চ তাঁর সঙ্গে দেখা হল। কি হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, আশাবাদী যুবক। তাঁর এই পরিণতি।

শেখ মুজিবের কথা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না। কেউ বলছে তাঁকে মেরে ফেলেছে, কেউ বলছে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ নেতারা কে মরেছেন, কে পালাতে পেরেছেন কিছুই ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। ফোন বিকল, নইলে যারা বলতে পারত এমন লোকের কাছে ফোন করে জানা যেত।

মাথা ঝিমঝিম করছে। উপরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে লাগল। খানিক পরে রুমী এসে বসল পাশে। গায়ের ওপর হাত রেখে আস্তে বলল, 'আম্মা, তবু তো আমরা পুরো ছবিটা জানি না।'

আমি তার দিকে পাশ ফিরে বললাম, 'তার মানে?'

'আমরা ক'টা জায়গাতেই বা গেছি। অন্যরাও সব জায়গা নিজের চোখে দেখে নি। কিছু দেখা, কিছু শোনা মিলে যেটুকু জেনেছি, আমার ভয় হচ্ছে আসল ঘটনা তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। সবটা জানতে মনে হয় আরো ক'দিন লাগবে।'

আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললাম, 'আর জানতে চাই না। যেটুকু জেনেছি, তাতেই কলজে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, একি সর্বনাশ হল আমাদের। ওরা কি মানুষ, না জানোয়ার?'

'ওরা জানোয়ারেরও অধম। ওরা যা করছে, তাতে দোজখেও ঠাঁই হবে না ওদের।'

২৮ মার্চ
রবিবার ১৯৭১

গত রাতেও ঘুমোতে পারি নি। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে গোলাগুলি চলেছে প্রায় ভোর পর্যন্ত।

কাল বিকেলেই কারেন্ট এসেছে, কিন্তু ফোন এখনো খারাপ। কারেন্ট না এসে যদি ফোনটা ঠিক হত, তাহলে বেশি স্বস্তি পেতাম। শরীফকে বললাম, 'আজ যে করেই হোক, ফোনটা ঠিক করাতেই হবে। তোমার বন্ধু লোকমানকে বল না।'

শরীফ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি পাগল হলে? মিলিটারি যেখানে সারা ঢাকায় সব ফোন কেটে দিয়েছে, সেখানে তোমার একটা ফোন সারবে কোন ম্যাজিকে?'

আটটায় কারফিউ উঠতেই কাসেম বারেক দু'জনকেই পাঠালাম—যে করেই হোক, যত টাকা কবুল করেই হোক, মেথর একটা ধরে আনতেই হবে।

জামী ধরে বসেছে কাল সে বাসায় ছিল, অতএব আজ তাকে বাইরে যেতে দিতেই হবে।

বললাম, 'ঠিক আছে, যাবি। তবে একা নয়। রুমীর সঙ্গে।'

রুমী প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমার অন্য কাজ আছে।'

আমি রেগে রুমীকে কিছু বলতে গেলাম, তার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। জামী খুলে দিতেই কিটি উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে ঢুকল। তার সঙ্গের মিঃ চাইল্ডার দরজার বাইরে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

'কিটি!' বলে আমি এগিয়ে যেতেই সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ধরেই রইল প্রায় দু'মিনিট, আর ছাড়ে না। তার বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি। একটু পরে জলেভরা চোখ তুলে কিটি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তোমরা কেমন আছ, দেখবার জন্য এসেছি।'

তিন মিনিটে শরীফ, রুমী, জামী—সকলের কুশল নিয়ে কিটি তক্ষুণি আবার মিঃ চাইল্ডার সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

একটু পরে মিনিভাই এলেন গুলশান থেকে। তাঁর কাছে জানা গেল শেখ মুজিব বেঁচে আছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'আননোন ডেস্টিনেশানে' নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা, ছাত্রনেতারা, প্রায় সকলেই পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

শরীফ বলল, 'চলুন ঢাকা ক্লাব ঘুরে আসি একবার।'

রুমী বলে উঠল, 'আব্বু, আমি গাড়িটা নিয়ে যাই একটু।'

আমি বললাম, 'আজ কিন্তু বারোটায় কারফিউ শুরু মনে থাকে যেন।'

'কেন? কাল তো বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা ছিল?'

'বোধ করি, গতকাল লোকজনের অত চলাফেরা দেখে আর্মি আজ সময় কমিয়ে দিয়েছে।'

জামী বলল, 'আব্বু, আমি তোমার সঙ্গে ঢাকা ক্লাবে যাই?'

মিনি ভাইয়ের গাড়িতে শরীফ আর জামী ঢাকা ক্লাবে গেল। আমি রুমীকে বললাম, 'আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একবার হাসপাতাল ঘুরিয়ে এনে দিয়ে তারপর তুই তোর কাজে যাস। ইমন আর শেলীর জন্য একটু খাবার দিয়ে আসব।'

হাঁড়িপানা মুখ করে রুমী আমাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হল। বললাম, 'শহীদ মিনারের সামনের রাস্তা ধরে যাবি। ফেরার পথে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে আসবি। একাডেমির দেয়াল নাকি গোলার ঘায়ে ভেঙে গেছে। আর রেসকোর্সের কালীবাড়িও নাকি নেই?'

শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় এসে রুমী গাড়ির গতি কমিয়ে চালাতে লাগল। ডাইনে তাকিয়ে দেখলাম, গতকাল শহীদ মিনারের যে ভাঙা উর্ধ্বাংশ দেখেছিলাম, আজ সেটাও নেই। গত রাতের তাণ্ডবে সব অদৃশ্য হয়ে শুধু গোড়া তিনটে রয়েছে। ওগুলো আর ওপড়াতে পারেনি। একটু জোরেই বলে উঠলাম, 'শহীদ মিনার। তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবই নেব।'

রুমীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শহীদ মিনার পেরিয়ে হাসপাতালের গেটে ঢুকে গেল।

রুমী এলিফ্যান্ট রোডে গলির মুখে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গেটের কাছাকাছি আসতে দেখা হল হোসেন সাহেবের সঙ্গে। উনি চিন্তিত মুখে বললেন, 'শুনলাম পাড়ায় কোন্ বাড়িতে কতো জোয়ান ছেলে আছে, তার লিস্ট হবে।'

শুনে চমকে গেলাম। মনে পড়ল মেইন রোডের উত্তরদিকের একটা গলিতে কয়েকটা অবাঙালি ছেলে থাকে, যাদের সঙ্গে কয়েক মাস আগে রুমীর ঝগড়া হয়েছিল। ওদের দৌলতে লিস্টে রুমী-জামীর নাম নিশ্চয় প্রথমে বসবে।

বাড়ি ঢুকে রেডিও খুলে রেখে অসহায়ের মত বসে রইলাম। শরীফ রুমী না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই।

হঠাৎ জানালা দিয়ে কি যেন ঝপ করে মেঝেয় পড়ল। চমকে দেখি খবরের কাগজ। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম, 'বদরুদ্দিন, বদরুদ্দিন, তুমি বেঁচে আছ?'

বদরুদ্দিন সে-ই ১৯৫৬ সাল থেকে আজিমপুরের বাসায় থাকার সময় থেকে আমাদের কাগজ দেয়। বদরুদ্দিন রোগা মুখে করুণ হেসে বলল, 'আল্লার রহমত আর আপনাদের দোয়া।'

'আর কোন কাগজ বেরোয় নি?'

'না, এই একটাই।'

'যেদিন যতগুলো কাগজ বেরোবে, সব দিয়ে যাবে, কেমন?'

'আচ্ছা।' বলে বদরুদ্দিন চলে গেল। কাগজ পড়ার উত্তেজনায় বদরুদ্দিনকে জিগ্যেস করতে ভুলে গেলাম এ কয়দিন তার কেমন কেটেছে।

২৫ তারিখ রাতের মহামারণযজ্ঞের পর এই প্রথম কাগজ বেরোল—পাকিস্তান অবজারভার। দুই পাতা মাত্র। আট কলাম জুড়ে দুই ইঞ্চি চওড়া হেডলাইন : ইয়াহিয়া ব্রডকাস্টস। ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ। ইয়াহিয়ার ২৬ তারিখ সন্ধ্যার বেতার বক্তৃতার পুরো বিবরণ। তার নিচে বাকি পাতা জুড়ে মার্শাল ল অর্ডারসমূহের নম্বর ধরে ধরে বিবরণ। একপাশে ছোট্ট হেডিংয়ে খবর : মুজিব অ্যারেস্টেড—মুজিব গ্রেপ্তার।

সকালে রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল আটটা-বারোটা কারফিউ থাকবে না। অথচ এখন পৌনে বারোটায় সেটা বাড়িয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত করা হল। এতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে। রুমী-জামীকে মিনি ভাইয়ের বাসায় দিয়ে আসা সম্ভব হবে। মিনিভাই বলেছেন গুলশানের বাড়িগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

জামী ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরেছে খুব বিচলিত হয়ে। ঢাকা ক্লাবেও আর্মি ঢুকেছিল, কয়েকজন বেয়ারার লাশ আজ সকাল পর্যন্তও পড়েছিল। জামীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এরকম ফুলে পচে ওঠা দু'তিনটে লাশ এভাবে দেখা। ভালোই হল, গুলশানে টাট্টুর সঙ্গে থাকলে ও সামলে উঠতে পারবে।

দুপুরে খেয়েই রুমী জামীকে নিয়ে গুলশান চললাম আমি ও শরীফ। রাস্তাঘাট গতকালের তুলনায় বেশ নির্জন। বারোটায় কারফিউ শুরু হবে, সেটা সকালেই জেনে লোকজন সেইভাবে বাড়ি দৌড়েছে। শেষ মুহূর্তে সময় বাড়ালেও জনশূন্য রাস্তাঘাট আর ভরে ওঠে নি।

রুমী-জামীকে গুলশানে রেখে ফেরার পথে আজিমপুরে গেলাম একরাম ভাই লিলিবুর বাসায়।

২৯ মার্চ
সোমবার ১৯৭১

রেডিও আজ একচোটেই বলে দিয়েছে আটটা-পাঁচটা কারফিউ থাকবে না।

সকালেই গেলাম গুলশানে, রুমী-জামীকে বাড়ি নিয়ে আসতে। আজ রুমীর জন্মদিন, অন্তত দুপুরে কিছু রান্না করে খাইয়ে দিই। গিয়ে দেখি কিটি ওখানে বেড়াতে গেছে। গুলশানে বেশির ভাগ বাড়িতে বিদেশীদের বাস—সেখানে চলাফেরার একটু সুবিধে, আর্মির উৎপাতও একটু কম।

ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, কাঁচাবাজার সব পুড়ে নিশ্চিহ্ন, কিছুই পাওয়া যায় না—আজও কি ডাল, আলু দিয়ে খাওয়া হবে? হঠাৎ চোখে পড়ল এয়ারপোর্ট রোডের সার সার বন্ধ দোকানের মাঝে ছোট্ট একটা গোশতের খোলা দোকানে মাত্র একটি খাসির রান ঝুলছে। তক্ষুণি গাড়ি থামিয়ে রানটা কিনে নিলাম। বললাম, 'রুমী তোর কপালে পেয়ে গেলাম।'

বাড়ি পৌঁছে দেখি চিংকু আর কায়সার বসে আছে। বললাম, 'ভালোই হল তোমরা এসেছ। আজ রুমীর জন্মদিন। তোমরা দুপুরে ওর সঙ্গে খেয়ে যাও।'

তারপর তিনটে চুলো ধরিয়ে কাসেম, বারেক দু'জনকে খাটিয়ে নিজেও দ্রুত খেটে তৈরি হল পোলাও, কোর্মা আর চানার হালুয়া। গুলশান থেকে আসার সময় রেবা তার বাগানের কিছু টম্যাটো তুলে দিয়েছিল। সেটা দিয়ে সালাদ বানানো হল।

খাওয়ার পর ঢেকুর তুলে জামী বলল, 'ভাইয়ার জন্মদিনের খাওয়াটা ভালোই হল। এমন দুর্দিনে এর বেশি আর কি চাই?'

খাওয়া-দাওয়ার পর রুমী জামীকে আবার গুলশানে রেখে এলাম।

৩০ মার্চ
মঙ্গলবার ১৯৭১

সুফিয়া কামাল আপা, নীলিমা ইব্রাহিম আপা বেঁচে আছেন। কলকাতা রেডিওতে ভুল খবর দিয়েছিল। খবরটা জেনে মনটা খুব ভালো হল।

ইংরেজি বিভাগের জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও তার স্ত্রী বাসন্তীদির খবর নেবার জন্য চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ে গেলাম। পাঁচদিন পরেও সামনের ছোট বারান্দায় পুরু হয়ে জমাট-বাঁধা রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। হাসিন জাহানদের ফ্ল্যাটে এখনো তালা ঝুলছে। বাসন্তীদির ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়লে একজন বুড়োমত লোক বেরিয়ে এসে বলল, কেউ বাড়ি নেই। কোথায় গেছেন জিগ্যেস করাতে বলল, জানে না। জ্যোতির্ময় দাদাবাবুকে কোন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে তাও সে জানে না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। একা একা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করতে সাহস হল না।

একটা একটা করে দিন যাচ্ছে, আর লোকমুখে পাকিস্তানী আর্মির বর্বরতার নতুন নতুন খবর কানে এসে মনমানসিকতা সব অসাড় করে দিচ্ছে। দিনরাত কি এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটছে। আর গুজবই যে কতো। একটা করে গুজব শুনি আর ভয়ে আঁতকে উঠে হুটোপুটি লাগিয়ে দিই। যেমন আজকে এগারোটার দিকে মিনিভাই এলেন রুমী জামীকে নিয়ে। রুমী-জামী আর থাকতে চায় না গুলশানে। মনে হচ্ছে ভয়ের আর কারণ নেই। ড্রয়িংরুমে বসে গল্পগুজব হচ্ছে। বারেককে মোড়ের দোকানে পাঠিয়েছি চা-পাতা কিনতে। খানিক পরে সে ফিরে এসে ভয়ার্ত মুখে বলল, 'আম্মা ঐ মোড়ের দোকানে একজন বিহারি জিগাই ছিল রুমী ভাইয়া বাসায় আছে কি না।'

ব্যস অমনি তাড়াহুড়ো লেগে গেল। রুমী-জামীকে তক্ষুণি মিনিভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে তুলে আবার গুলশানে রওনা করিয়ে দিলাম।

আড়াইটার সময় হঠাৎ একটা সুটকেস হাতে অজিত নিয়োগী এসে হাজির। আমরা হতবাক। নিয়োগী দাদার মুখে চার/পাঁচ দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ টকটকে লাল, কাপড়-চোপড় ময়লা, কুঁচকানো, গাল বসে গেছে, চুল জট পাকিয়ে গেছে। অবাক ভাবটা কাটার পর আমি হঠাৎ পাগলের মত হাসতে লাগলাম। 'কি নিয়োগী দাদা। রক্তস্রোত নাকি অল্পের জন্য এড়াতে পারা গেছে?'

শরীফ মৃদুস্বরে ধমক দিল, 'পাগল হলে নাকি? ওঁকে সুস্থির হতে দাও। বসুন মিঃ নিয়োগী।' শরীফ ওর হাত থেকে সুটকেসটা নিল।

'কোথায় ছিলেন এ কয়দিন।'

সিদ্ধেশ্বরীর এক লোকের গোয়ালঘরের পাশের এক ঘুপচি টিনের ঘরে এ ক'দিন কাটিয়েছেন। মশারি ছিল না, অসম্ভব মশায় ঘুমোতে পারেন নি। খাওয়া-দাওয়া প্রায় জোটে নি বললেই চলে—চা একদমই না। অথচ দিনে ১৫/২০ কাপ চা খাওয়ার অভ্যেস তাঁর।

প্রথমেই ওঁকে দোতলায় রুমীদের ঘরে নিয়ে গেলাম। নিচে রাখতে সাহস পেলাম না—যদি হঠাৎ 'কেউ' এসে পড়ে। ওঁকে গোসল করে কাপড় বদলাতে বলে নিচে এলাম খাবার ব্যবস্থা করতে। খাওয়ার পর এককাপ চা ওঁর হাতে দিয়ে শরীফ ও আমি ওঁর সামনেই আলোচনা করলাম—এ পাড়ার যা অবস্থা, ওঁকে এ বাড়িতে রাখা নিরাপদ হবে না। 'কেউ' এসে ওঁকে দেখে চিনে ফেললেই বিপদ। ধানমণ্ডি ছয় নম্বর রোডে মা ও লালু থাকেন, সেখানে তিনতলার রুমটিতে উনি সবচেয়ে নিরাপদে থাকবেন। কাকপক্ষীও টের পাবে না, কারণ মা'র কাজের লোকজন নেই। বদিউজ্জামানরা নিচতলায় থাকে বটে, কিন্তু তারা এমনভাবে দরজা জানালা সেঁটে নিঃশব্দে বাসার ভেতর থাকে যে, বাইরে থেকে কারো বোঝার সাধ্যি নেই—ও বাসার ভেতর অতগুলো লোক থাকে। বদির পরিবার, তার শ্বশুরের পরিবার, কে. জি. মোস্তফার পরিবার।

সাড়ে তিনটের সময় ওঁকে নিয়ে মা'র বাসায় গেলাম। গাড়িটা একেবারে বাড়ির সামনে নিলাম না। কি জানি, বদিরা কেউ হঠাৎ যদি কোনো কাজের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে! আমি প্রথমে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে নিলাম একতলার সব দরজা-জানালা বন্ধ আছে কিনা। তখন মার কলিং বেল টিপলাম। লালু এসে দরজা খোলার পর আমার ইশারা পেয়ে শরীফ নিয়োগী দাদাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল। আব্বাজানের পুরনো বন্ধু অজিত নিয়োগী—মা ও লালু খুশি মনেই ওঁকে রাখলেন।

ওখান থেকে গেলাম ভূতের গলিতে, ভাস্তে কলিম, আর চাচাত দেবর নজলু ও হুদাদের বাসায়। ওরা কে কেমন আছে খোঁজখবর নেয়ার জন্য।

আজ সকালে এক পাতার মর্নিং নিউজ বেরিয়েছে। উল্টো পাতাটা সাদাই রয়ে গেছে। বিদেশের দু'একটা খবর ছাড়া পূর্ব বাংলার খবর মাত্র দুটি : 'মুজিব ওয়ান্টেড সেপারেশান রাইট ফ্রম সিকটি সিকস।' ১৯৬৬ সাল থেকেই মুজিব বিচ্ছিন্নতা চেয়ে আসছেন। এবং 'পাকিস্তান সেভড, সেইজ ভুট্টো।' ভুট্টো বলেছেন : পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

৩১ মার্চ
বুধবার ১৯৭১

সকালে শরীফ নিজেই বেরোলো মা'র বাজার করার জন্য। অজিত নিয়োগীও বাড়িতে আছেন, একটু বেশি করে বাজার করে দিয়ে আসবে।

শরীফ বেরিয়ে যাবার একটু পরেই দেখি, ওমা! মা নিজেই রিকশা করে এসে হাজির! কি ব্যাপার?

মা বললেন, আমি যদি অজিত নিয়োগীর দু'বেলার খাবারটা রান্না করে পাঠাই, তাহলে খুব ভালো হয়। কারণ একটাও কাজের লোক নেই, মা'র শরীর অশক্ত।

নিজেরা অনেক সময় এক তরকারি দিয়ে খেয়ে নেন। নিয়োগীকে তো সেভাবে দেওয়া যাবে না।

আরেকটা কাজ বাড়ল। তাতে কোনো ঝামেলা নেই, সমস্যা হল রোজ দু'বেলা টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার নেওয়ার সময় ও বাড়ির সামনে কেউ দেখে না ফেলে। এ বাড়িতেও বারেক-কাসেমরা যেন বুঝতে না পারে, কোথায় খাবার যাচ্ছে। ওদের বলা হল হাসপাতালে অসুস্থ আত্মীয়ের জন্য খাবার পাঠানো হচ্ছে।

৩১ তারিখে আরো দুটো পত্রিকা বেরিয়েছে—দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ। চারটে পত্রিকাতেই ইস্ট পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়া পথে—এ কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে। পূর্বদেশের লেখার মাঝখানে একটা লাইন একেবারে বুকে এসে ঘা মারল : 'শান্তিপ্রিয় বেসামরিক নাগরিকদের যেসব সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী হয়রানি করছিল, তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে।'

মর্নিং নিউজ হেডলাইন দিয়েছে : ইয়াহিয়াজ স্ট্যান্ড টু সেভ পাকিস্তান প্রেইজড।—পাকিস্তান রক্ষায় ইয়াহিয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রশংসিত।

ইয়াহিয়া লডেড ফর রাইট স্টেপস টু সেভ কান্ট্রি—দেশরক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইয়াহিয়া নন্দিত।

অক্ষম রাগে আর অপমানে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেললাম কাগজ দুটো। এছাড়া আর কিইবা করার ক্ষমতা আছে আমাদের।

এপ্রিল

ইসলামের নামে ওরা যা করছে, তাতে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। খোদার ঘর মসজিদে ঢুকে কোরআন তেলওয়াতরত মানুষ খুন! মায়ের সামনে ছোট বাচ্চাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের সামনে মাকে বেইজ্জত করেছে

১ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সরকার এখন সবকিছু স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে। ২৭ তারিখ সকাল থেকে প্রতিদিন রেডিওতে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে—সবাই যেন নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগ দেয়। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে কারফিউ সত্ত্বেও ২৭ তারিখে টিভি চালু করা হয়েছে।

কিন্তু অনুষ্ঠান দেখে মনে হচ্ছে ভুতুড়ে। অনুষ্ঠান ঘোষক-ঘোষিকা, সংবাদ পাঠক-পাঠিকা সব যেন ভৌতিক অবয়ব।

টেলিফোন ঠিক হয়েছে। এটাও বোধ হয় জীবনযাপন স্বাভাবিক দেখাবার প্রয়োজনেই করা হয়েছে। কিন্তু এখন যেন টেলিফোন ঘোরাবার আগ্রহ আর নেই। বরং সময় পেলেই এখন খালি রেডিও'র নব ঘোরাচ্ছি। পরশুদিন সামনের বাসায় হুমায়ুন বলল, স্বাধীন বাংলা রেডিও নাকি কে শুনেছে। সে শোনে নি। তারপর থেকে মিনিভাই, লুলু, রঞ্জু অনেককেই জিগ্যেস করছি, কেউই এ পর্যন্ত নিজের কানে শোনে নি, তবে অন্যের মুখে শুনেছে।

রুমী-জামীকে গতকাল গুলশান থেকে নিয়ে এসেছি। ওরা থাকতে চায় না। তাছাড়া অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে—এখন যেহেতু সরকার সব স্বাভাবিক দেখাতে চায়, তাতে অন্তত এখনই ঘরে ঘরে ছেলেছোকরাদের টানাটানি করবে না। তবে রাস্তায় বেরোনো তরুণ ছেলেদের সম্বন্ধে যেসব ভয়াবহ খবর শুনছি, তাতেও তো বুক হিম হয়ে হাত-পা অবশ হয়ে পড়ছে। লুল, রঞ্জু—আরো কয়েকজনের মুখে শুনলাম—ওরা দেখেছে ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, যার পেছনটা খোলা থাকে, সেই ট্রাকে অনেকগুলো জোয়ান ছেলে বসা, তাদের হাত পেছনে বাঁধা, চোখও বাঁধা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। এই নিয়ে শহরে ক'দিন হুলস্থূল। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তার মুখেই এই কথা। ভয়ে রুমী-জামীকে একা বেরোতে দিচ্ছি না, রুমীকে গাড়িও চালাতে দিচ্ছি না। ড্রাইভার না থাকলে আমি চালাচ্ছি, রুমী-জামীকে পেছনে বসিয়ে। মহিলা চালক দেখলে রাস্তায় আর্মি কিছু বলে না। ওদের যত রাগ উঠতি বয়সের ছেলেদের ওপর। রাস্তার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে চলা নিরীহ পথচারীও যদি অল্প বয়সী হয়, তাহলেও রক্ষে নেই। টহলদার মিলিটারি লাফ দিয়ে তার ঘাড় ধরে হয় ট্রাকে তুলবে, না হয় রাইফেলের দু'ঘা লাগিয়ে দেবে।

রাস্তায় বহু গাড়িতে দেখছি উর্দু নেমপ্লেট। এলিফ্যান্ট রোডের ছোট ছোট দোকানপাটের বেশ কয়েকটার সাইনবোর্ড পালটে উর্দুতে লেখা হয়েছে। দোকানে জিগ্যেস করলাম—'সাইনবোর্ড পাল্টেছেন কেন?' দোকানী জবাব দিল, 'এখন থেকে বাড়িতে, দোকানে, গাড়িতে, সবখানে উর্দুতে নামধাম নম্বর লিখতে হবে। ওপর থেকে হুকুম এসেছে।'

এরপর যাকেই জিগ্যেস করি, সে-ই বলে হ্যাঁ, তাইতো শুনছি। এলিফ্যান্ট রোডের দুটো ছোট সাইনবোর্ড লেখার দোকানের সামনে গাড়ির লাইন লেগে থাকে, দোকানের ভেতরে সাইনবোর্ড লেখার টিন-প্লেটের স্তূপের জায়গা হয় না, দোকানের সামনের ফুটপাত পর্যন্ত উপচে এসেছে।

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির সামনে, গাড়িতে নাম ও নম্বর-প্লেট উর্দুতে লিখতে হবে? এই বাংলাদেশে? আমাদেরকে?

শরীফকে বললাম, 'এই যে ওপর থেকে হুকুম এসেছে, এই হুকুমটার উৎস বের করা যায় না? দু'এক জায়গায় ফোন করে দেখ না। মোর্তুজা ভাই তো আগে এয়ারফোর্সে ছিলেন, ওঁকে জিগ্যেস কর না। তোমার বন্ধু আগা ইউসুফের সঙ্গে তো অনেক আর্মির লোকের জানাশোনা আছে, ওঁকে বল না কাউকে ফোন করে ব্যাপারটা জানতে।'

শরীফ বলল, 'দেখি, ক্লাবে দেখা হলে জিগ্যেস করব। এসব কথা ফোনে বলা ঠিক হবে না।'

আমি গোঁয়ারের মত বললাম, 'আমি কিন্তু এখনই নাম-নম্বর-প্লেট বদলাবো না। কাগজে যদি মার্শাল ল' অর্ডার হয়ে বেরোয়, তখন দেখা যাবে। তার আগে নয়।'

৩ এপ্রিল
শনিবার ১৯৭১

মর্নিং নিউজ-এর একটা হেডলাইনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম : অ্যাকশান এগেইনস্ট মিসক্রিয়ান্টস অ্যাট জিঞ্জিরা—জিঞ্জিরায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

গতকাল থেকে লোকের মুখে মুখে যে আশঙ্কার কথাই ছড়াচ্ছিল, সেটা তাহলে সত্যি? ক'দিন থেকে ঢাকার লোক পালিয়ে জিঞ্জিরায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। গতকাল সকাল পাকিস্তান আর্মি সেখানে কামান নিয়ে গিয়ে গোলাবর্ষণ করেছে। বহু লোক মারা গেছে।

খবরটা আমরা গতকাল প্রথম শুনি রফিকের কাছে। ধানমণ্ডির তিন নম্বর রাস্তায় ওয়াহিদের বাসা থেকে রফিক প্রায় প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলেও মাঝে মাঝে ঢুঁ মারে। শরীফের সঙ্গে বসে বসে নিচু গলায় পরস্পরের শোনা খবর বিনিময় করে।

রফিকের মুখে শোনার পর যাকেই ফোন করি বা যার সঙ্গেই দেখা হয়—তার মুখেই জিঞ্জিরার কথা। সবার মুখ শুকনো। কিন্তু কেউই খবরের কোনো সমর্থন দিতে পারে না। আজ মর্নিং নিউজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেটার সমর্থন দিয়েছে। খবরে লেখা হয়েছে : দুষ্কৃতকারীরা দেশের ভেতরে নির্দোষ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রান করছে। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে জিঞ্জিরায় সম্মিলিত এরকম একদল দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছিল। এলাকাটি দুষ্কৃতকারীমুক্ত করা হয়েছে।

দুপুরের পর রঞ্জু এল বিষণ্ন গম্ভীর মুখে। এমনিতে হাসিখুশি, টগবগে তরুণ। আজ সেও স্তব্ধ, স্তম্ভিত। সোফাতে বসেই বলল, 'উঃ ফুপু আম্মা। কি যেন সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে জিঞ্জিরায়। কচি বাচ্চা, থুথুড়ে বুড়ো—কাউকে রেহাই দেয়নি জল্লাদরা। কি করে পারল?'

আমি বললাম, 'কেন পারবে না? গত কদিনে ঢাকায় যা করেছে, তা থেকে বুঝতে পার না যে ওরা সব পারে?'

'ফুপু আম্মা, আমার এক কলিগ ওখানে পালিয়েছিল সবাইকে নিয়ে। সে আজ একা ফিরে এসেছে—একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। তার বুড়ো মা, বউ, তিন বাচ্চা, ছোট একটা ভাই স-ব মারা গেছে। সে সকালবেলা নাশতা কিনতে একটু দূরে গেছিল

বলে নিজে বেঁচে গেছে। কিন্তু এখন সে বুক-মাথা চাপড়ে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর বলছে, সে কেন বাঁচল? উঃ ফুপু আম্মা, চোখে দেখা যায় না তার কষ্ট।'

'অথচ কাগজে লিখেছে ওরা নাকি দুষ্কৃতকারী।'

শরীফ বাইরে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরেই আরেকটি বম্বশেল ফাটাল, 'শুনছো, হামিদুল্লাহ, বউ-ছেলে নিয়ে নৌকায় করে ওদের গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল। জিঞ্জিরার কাছে পাক আর্মির গোলা গিয়ে পড়ে ওদের নৌকায়। ওর ছেলেটা মারা গেছে, বউ ভীষণভাবে জখম।'

হামিদুল্লাহর বউ সিদ্দিকাকে ওর বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম। ভারি ভালো মেয়ে। হামিদুল্লাহ, ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেও খুব নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ। একটাই সন্তান ওদের, তার এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খবর কাগজটা তুলে বললাম, 'অথচ সামরিক সরকার ওদেরকে দুষ্কৃতকারী বলছে।'

বিকেলে রেবা-মিনি ভাই বেড়াতে এল। তাদেরও মুখ থমথমে। মিনি ভাইয়ের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় খোন্দকার সাত্তার—তিনিও তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে নৌকায় করে দেশের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। কামানের গোলার টুকরো তাদের নৌকাতেও গিয়ে পড়ে। নৌকায় ওঁর ছোট ভাই এবং আরো কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছে।

৪ এপ্রিল
রবিবার ১৯৭১

আজ কিটি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সকালে এসেছে বিদায় নিতে। ওর রেডিওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। খাবার টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এটা তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। এখন প্রথমে তেহরানে যাব, তারপর কোথায় যাব, ঠিক নেই। এত ভারি রেডিও নিয়ে মুভ করা অসুবিধে।'

কিটি রাওয়ালপিন্ডি হয়ে তেহরান যাবে। ওর কাছে বেলু-ধলুদের ফোন নম্বর লিখে দিলাম। 'ওরা ইসলামাবাদে থাকে। ওদেরকে বোলো এখানে কি কি ঘটেছে। আর বোলো আমরা ভালো আছি।'

কিটি আস্তে করে বলল, 'তোমাদের কিছু জিনিস আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি নিরাপদে রাখার জন্য।'

রুমী লাফ দিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রেকর্ডটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আর চে গুয়েভারার এই বই দুটো।'

আমি শাহনাজের গাওয়া 'জয় বাংলা-বাংলার জয়' রেকর্ডটাও দিলাম।

রুমী বলল, 'আশা করব একদিন তুমি এগুলো ঢাকায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তাই যেন হয়।' কিটির চোখ পানিতে ভরে গেল। শরীফের সঙ্গে কিটির দেখা হল না। কিটি আসার আগেই শরীফ বাঁকার সঙ্গে সাভারে গেছে। আমরা জানতাম না যে কিটি আজই চলে যাবে। মিঃ চাইভারের বাসায় ফোন নেই, কিটি আগে জানাতে পারে নি।

কিটি চলে গেলে আমরা সবাই খানিকক্ষণ খুব মন খারাপ করে বসে রইলাম।

তারপর হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'নাঃ এভাবে বসে বসে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না। একটু হেঁটে আসি।'

এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি রিকশায় মা। আমাকে দেখে নেমে বললেন, 'পায়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস?'

'কোথায় না। এমনিই।'

মা রিকশার ভাড়া চুকিয়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন, বললেন, 'চল, কাঁচাবাজারে যাই।' নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারের পোড়া জঞ্জাল এখনো সম্পূর্ণ সরানো হয় নি, তবু ওরই মধ্যে কিছু কিছু দোকানদার একটি সাফসুতরো করে পশরা নিয়ে বসেছে। একদম ভিড় নেই। নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারে আগে কোনদিন ঢুকি নি ভিড়ের ভয়ে। আর এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরলাম। ডিম অসম্ভব সস্তা—দু' টাকা হালি। মা আর আমি মিলে একসঙ্গে পঞ্চাশটা কিনলাম। মুরগি, শাকসব্জি সবই মনে হল পানির দর। কাছাকাছি গ্রাম থেকে যে যা পেরেছে, নিয়ে এসে বসেছে। কোনমতে বিক্রি হলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে যাবে, এমনি ভাব। ঝুড়ি হাতে মিনতি ছোকরা একটাও নেই, বয়ে নিতে পারব না বলে আর কিছু কিনলাম না।

বাড়ি ঢুকে দেখি শরীফ ফিরছে সাভার থেকে। মুরগি, শাকসব্জি, মিষ্টি অনেক কিছু কিনে এনেছে। ভাগ্যিস, ডিম ছাড়া আর কিছু কিনি নি কাঁচাবাজার থেকে। মাকে একটা মুরগি, কিছু সব্জি ও মিষ্টি দিলাম। রুমীকে বললাম, 'যা, নানীকে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

বাড়ির নাম ও গাড়ির নম্বর-প্লেট উর্দুতে লেখার কথাটা নেহাতই গুজব। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মর্মে কাগজে বিবৃতি দিয়েছে। শরীফ মন্তব্য করল, 'নেহাৎ ভিত্তিহীন গুজব বলে মনে হয় না। অতি উৎসাহী অবাঙালিরাই এটা প্রথম ছড়িয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর, কানাকানি, বলাবলি, চাপা অসন্তোষ—এসব হতে হতে সরকারের টনক নড়েছে। তাই এখন কাগজে ঘোষণা দিয়ে বলছে এটা ভিত্তিহীন গুজব। যতো সব।'

আমি হেসে বললাম, 'তবু তো রেহাই। উর্দুতে নম্বর-প্লেট? বাড়ির সামনে উর্দু হরফে 'কণিকা' লেখা? উঃ মাগো। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।'

৯ এপ্রিল
শুক্রবার ১৯৭১

কারফিউয়ের মেয়াদ ধীরে ধীরে কমছে। পাঁচ তারিখে ছ'টা-ছ'টা ছিল। ছয় তারিখ থেকে সাড়ে সাতটা-পাঁচটা দিয়েছিল। গতকাল থেকে আরো কমিয়ে ৯টা-৫টা করেছে।

বদিউজ্জামানরা সবাই মা'র বাড়ির একতলা থেকে চলে গেছে নিজ নিজ বাসায়।

রফিকরা ওয়াহিদের বাসা থেকে সরে মা'র বাড়ির একতলায় এসে উঠেছে। তিন নম্বর রোডে ওয়াহিদের বাসার কাছাকাছি মিলিটারিদের চলাফেরা খুব বেড়ে গেছে, কি একটা চেকপোস্ট না কি যেন হয়েছে। মা'র বাড়ি ছ'নম্বর রোডের ভেতরে বলে কিছুটা নিরিবিলি।

কপাল ভালো, আগের দিনই অজিত নিয়োগী চলে গেছেন। ওঁর কিছু বন্ধু প্রথমে আমাদের বাসায় এসে খোঁজ করেন। তারপর মা'র বাসা থেকে খুব সাবধানে ওঁকে গাড়ির ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন। শুনলাম, গ্রামের বাড়িতে যাবেন। যেখানেই যান, ভালো থাকুন।

২৫ মার্চ কালরাত্রির পর কয়েকটা দিন রুমী একেবারে থম ধরে ছিল। টেপা ঠোঁট, শক্ত চোয়াল উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টিতে ভেতরের প্রচণ্ড আক্ষেপ যেন জমাট বেঁধে

থাকত। এখন একটু সহজ হয়েছে। কথাবার্তা বলে, মন্তব্য করে, রাগ করে, তর্ক করে। বন্ধুদের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করে, নানা রকম খবর নিয়ে আসে।

আজ বলল, 'জান আম্মা, বর্ডার এলাকাগুলোতে না যুদ্ধ হচ্ছে।'

শুনেই চমকে গেলাম, 'যাঃ তা কি করে হবে? সবখানে তো মেরে ধরে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে।'

'তা হয়তো দিচ্ছে। পঁচিশের রাত থেকে যেখানে যেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, পাকিস্তানিরা সেসব জায়গা আবার দখল করে নিচ্ছে—এটাও সত্যি। কিন্তু সেগুলো তারা এমনি এমনি দখল করতে পারছে না। সেসব জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। বহু জায়গায় বাঙালি আর্মি অফিসাররা রিভোল্ট করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ই.পি.আর, ই.বি.আর, পুলিশ, আনসারের লোকজন। ঢাকা থেকে বহু ছেলেছোকরা বর্ডারের দিকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছে যুদ্ধ করবে বলে। পাক আর্মি যেসব থানা, গ্রাম, মহকুমা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেখানকার লোকজনেরাও বর্ডারের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ করতে।'

'পালাচ্ছে ঠিকই। তবে যুদ্ধ করতে কি? ওরা তো সব পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে।'

'তা নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আম্মা, যুদ্ধও হচ্ছে।'

'তুই এত কথা কোথায়, কার কাছে শুনিস?'

'সবখানে—সবার কাছে। আমার বন্ধুদের অনেকের আত্মীয়স্বজন মফস্বল থেকে ঢাকায় আসছে। তাদের কাছে।'

বিশ্বাস হতে চায় না। হায়রে, আমার কোনো আত্মীয় যদি এমনি মফস্বল থেকে আসত, তাহলে তার মুখে শুনে বিশ্বাস হত।

রুমী বলল, 'আমার জানাশোনা অনেক ছেলে বাড়িতে না-বলে লুকিয়ে চলে গেছে।'

আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'কই কারা গেছে, নাম বলতো।'

'কেন, বাবু ভাই আর চিংকু ভাই।'

আমি আবার চমকালাম, 'ওরা তো চাটগাঁ গেল।'

রুমী হাসল, 'আসলে ওরা যুদ্ধেই গেছে।'

'কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে?'

'তাতো ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। ওরা খোঁজ করতে করতে যাবে।'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কি রকম ভালো মানুষের মতো মুখ করে ওয়াহিদ এই তো কয়েকদিন আগে বলে গেল, মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাটগাঁর গ্রামের বাড়িতে। চিংকুও যাচ্ছে তার সঙ্গে। চিংকুর ফুপা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ও ফুফার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে।

রুমী খুব আস্তে কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আম্মা। আমি যুদ্ধে যেতে চাই।'

কি সর্বনেশে কথা। রুমী যুদ্ধে যেতে চায়! কিন্তু যুদ্ধটা কোথায়? কেউ তো ঠিক করে বলতে পারছে না। সবখানে শুধু জল্লাদের নৃশংস হত্যার উল্লাস—হাতবাঁধা, চোখবাঁধা অসহায় নিরীহ জনগণের ওপর হায়েনাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নিষ্ঠুর মত্ততা। যুদ্ধ হচ্ছে—এ কথা ধরে নিলেও তা এতই অসম যুদ্ধ যে কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের আধুনিকতম মারণাস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহী বাঙালিদের গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। সবখান থেকে তো সেই খবরই শুনতে পাচ্ছি। এই রকম অবস্থায় রুমীকে যুদ্ধে যেতে দিই কি বলে? মাত্র বিশ বছর বয়স রুমীর। কেবল আই.এস.সি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। ও যুদ্ধের কি বোঝে? ও কি যুদ্ধ করবে?

১০ এপ্রিল
শনিবার ১৯৭১

কিটির রেডিওটা পাবার পর থেকে রোজই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ধরার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। কতজনের কাছে শুনছি, তারা ধরেছে, অনুষ্ঠান শুনছে। আমরাই শুধু পাচ্ছি না।

স্বাধীন বাংলা বেতারের বরাত দিয়ে আকাশবাণী যত খবর বলে, সব বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। ওদের কিছু কিছু খবর ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নীলিমা আপা, সুফিয়া আপার মৃত্যু সংবাদটা ভুল ছিল। ঢাকার পতন, ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ, টিক্কা খানের মৃত্যু—সবক'টা খবরই ভুল ছিল। টিক্কা খান বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, একের পর এক মার্শাল ল'র বাঁধন-বেড়ি প্রচার করে যাচ্ছে। ২৫ মার্চের আগে, যে চীফ জাস্টিস বি.এ.সিদ্দিকী টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হন নি, সেই বি. এ. সিদ্দিকীকে দিয়েই গতকাল গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ করানো হয়েছে। আজকের কাগজে দু'জনের ছবি বেরিয়েছে।

আজ সকালে খাবার টেবিলে সবাইকে বললাম, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সত্যি সত্যি আছে, না আকাশবাণীর বানানো মিথ—তা বের করতেই হবে। সকাল ছ'টা থেকে একেকজন দু'ঘণ্টা করে রেডিও'র নব ঘোরাতে থাকবে। সারা দিন ধরে চলবে।'

জামী বলল, 'এখন তো নটা বেজে গেছে।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'ঠাট্টা রাখ। ন'টা থেকে এগারোটা তোমার ডিউটি।'

ফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে ধরলাম। ওসমান গনি স্যার। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন অবসর ভোগ করছেন। উনি বললেন, 'জাহানারা রেডিও পাকিস্তান থেকে শিগগিরই তোমার কাছে লোক যাবে মনে হয়।'

আঁতকে উঠলাম, 'কেন স্যার?'

'মার্শাল ল' অথরিটি রেডিও'র কর্তাব্যক্তিদের হুকুম দিয়েছে, যেখান থেকে যেমন করে পার পুরনো টকারদের এনে প্রোগ্রাম করাও। আমার কাছে এসেছিল।'

'আপনি প্রোগ্রাম করেছেন স্যার?'

'না করে উপায় কি? বাড়িতে যখন রয়েছি। তোমাকেও যদি ফোনে বা বাড়িতে পেয়ে যায়—'

উনি কথা শেষ করলেন না।

স্যারকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম। খাবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সবাইকে বললাম, 'ফোন বাজলে এখন থেকে তোমরাই ধরবে। আমাকে চাইলে আগে জেনে নেবে কে, কোত্থেকে করেছে। যদি বলে রেডিও থেকে করেছে, তাহলে বলবে আমি নেই। আর কেউ বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, আগেই যেন বলে দিও না যে আমি বাড়িতে আছি। আগে জেনে নেবে কোথা থেকে এসেছে—'

জামী আবার বলে উঠল, 'মা, তুমি টিক্কা খানের মত একের পর এক হোম ল' রেগুলেশান জারি করে যাচ্ছ!'

১৩ এপ্রিল
মঙ্গলবার ১৯৭১

চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হল, রোববার তো সারা দিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারা দিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে রোদ দেখা গেছে। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। জামী ছড়া কাটছিল, 'রোদ হয় বৃষ্টি হয়, খ্যাঁক-শিয়ালীর বিয়ে হয়।' কিন্তু আমার মনে পাষাণভার। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই, ঘনঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে, সামনে সোফায় বসে বলল, ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?'

'কোথায় যাব? অন্ধ, বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব? কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন? এখানে তো কোনো ভয় নেই!'

'নেই মানে? পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো—'

'হল তো সব খালি, বিরান, যা হবার তাতো প্রথম দু'দিনেই হয়ে গেছে। জানো বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ির সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে?'

'তাই নাকি? আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব।'

'তাহলেই দেখ—ভয়টা আসলে মনে। শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে, আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তি নগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে।'

যুক্তিটা বুঝে করিম মাথা নাড়ল, 'খুব দামী কথা বলেছেন ফুফুজান। আসলে যা কপালে আছে তা হবেই। নইলে দ্যাখেন না, ঢাকার মানুষ খামোকা জিঞ্জিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে। আরো একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।'

শিউরে উঠে বললাম, 'রোজই শুনছি করিম। যেখানেই যাই এছাড়া আর কথা নেই। কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাকভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাত আর চোখ বেঁধে, কতো লোকে দেখেছে। এখন শুনছি সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচা লাশের দুর্গন্ধে। মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্যে।'

১৪ এপ্রিল
বুধবার ১৯৭১

রুমীর খুব মন খারাপ। চীন পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। চৌ এন লাই ঘোষণা করেছেন : স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীন সরকার পাকিস্তানকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। রুমী এবং তার মতো যেসব প্রগতিশীল তরুণ সূর্যমুখী ফুলের মতো চীনের দিকে মুখ করে থাকত, তারা সবাই ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছে। রুমীর ভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে

মনে হচ্ছে—প্রাণের বন্ধু বিপদের মুহূর্তে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এদিকে আরেক নখরা। তিন-চারদিন আগে ঢাকায় এক নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। কাগজে খুব ফলাও করে খবর ছাপা হচ্ছে। খাজা খায়রুদ্দিন এর আহ্বায়ক। সদস্য ১৪০ জন। তার মধ্যে স্বনামধন্য হচ্ছেন আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ, সৈয়দ আজিজুল হক, গোলাম আযম।

গতকাল এই নাগরিক শান্তি কমিটির মিছিল বের হয়েছিল। আজকের কাগজে বিরাট করে ছবি ছাপা হয়েছে। ছবি দেখে আমরা খাবার টেবিলে বসে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম—এই এতগুলো লোক যোগাড় করতে সরকারের কি রকম খাটাখাটনি গেছে।

রুমী বলল, 'খুব বেশি যায় নি। মিরপুর মোহাম্মদপুরের বিহারিরা আর আহসান মঞ্জিলের বংশধররা—দুটো ডাকেই সবাইকে জড়ো করা গেছে।'

শরীফ বলল, 'তাছাড়া ছবিটার মধ্যে ক্যামেরার কারসাজি আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখ, অনেক উঁচু থেকে এমন কায়দায় ছবি তোলা হয়েছে যে দুশো লোককেও মনে হবে দু'হাজার।

১৫ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

এত আটঘাট বেঁধে রেডিও'র লোকের হাত এড়ানো গেল না। সেই ১৯৫০ সাল থেকে রেডিও'তে প্রোগ্রাম করি, সবাই আমার চেনা। তার মধ্যে নূরুন্নবী খান একটু বেশি। ওঁর বড় ভাই এহিয়া খানও রেডিওতে—বান্ধবী নূরজাহানের মামা বলে আমিও মামা ডাকি। সেই মামার ছোট ভাই নূরন্নবী খান একদিন সকাল আটটায় চলে এলেন আমাদের বাসায়। খাবার টেবিল ছেড়ে উধাও হবারও সময়টুকু পেলাম না।

নূরুন্নবী খান ঘরে ঢুকলেন দুই হাত জোড় করে। আমি কিছু বলার আগেই গড়গড় করে বলে গেলেন—সামরিক আইন কর্তারা ওঁদের পিছে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কাজ করাচ্ছেন। পুরনো স-ব বেতার শিল্পী—গানের, নাটকের, জীবন্তিকার, কথিকার—সব বিভাগের শিল্পীদের খুঁজে পেয়ে এনে অনুষ্ঠান করাতে হবে। নূরুন্নবী খানের বিভাগ হল কথিকা। উনি বললেন, 'বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঁচ মিনিটের কথিকা প্রচার হচ্ছে। এই দেখুন, আমি বিষয়গুলোর একটা তালিকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এ থেকে আপনার সুবিধেমত একটা বিষয় বেছে নিন। যাতে আপনারও কোনো বদনাম না হয়, আমারও পিঠ বাঁচে।'

আমি বেছে নিলাম 'গুজবে কান দেবেন না।'

আজ পহেলা বৈশাখ। সরকারি ছুটি বাতিল হয়ে গেছে। পহেলা বৈশাখের উল্লেখ মাত্র না করে কাগজে বক্স করে ছাপা হয়েছে : আজ বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক সরকারের যে ছুটি ছিল, জরুরি অবস্থার দরুন তা বাতিল করা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা শহরে এবং দেশের সর্বত্র বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও বন্ধ।

কিন্তু সে তো বাইরে। ঘরের ভেতরে, বুকের ভেতরে কে বন্ধ করতে পারে?

১৬ এপ্রিল
শুক্রবার ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ক'দিন থেকে ধরতে পারছি। খুব অল্প সময়ের জন্য অনুষ্ঠান : সকালে ঘণ্টা খানেক—আটটা থেকে নটা কিংবা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা। বিকেলে কোনদিন পাঁচটা থেকে সাতটা। কোনদিন আটটা থেকে দশটা। প্রচার সময়ের কোন স্থিরতা নেই। দু'তিনটি মাত্র গান ঘুরে ঘুরে বাজানো হয়, বাংলা-ইংরেজি খবর, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কথিকা, বিদেশী পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, মাত্র এইটুকু। তবু এইটুকুর জন্য আমরা সবাই কিরকম যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কথিকা। মুক্তিযুদ্ধ তাহলে হচ্ছে? তবু এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর এই যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, এইটাই বা প্রচার করছে কোথা থেকে, কিভাবে? রুমী বলে নিশ্চয় বর্ডার এলাকায় কোন জঙ্গলের ভেতর ট্রান্সমিটার লুকিয়ে ব্রডকাস্ট করে।

তাই হবে মনে হয়। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় কোনদিন? যদি পাক আর্মি কোনদিন খোঁজ পেয়ে যায় লুকোনো ট্রান্সমিটারের? তাহলে? কোন কোন দিন সময়মত বেতার কেন্দ্র ধরতে না পারলে অস্থির হয়ে উঠি বাড়িসুদ্ধ সবাই। এই বুঝি পাক আর্মি দিয়েছে গুঁড়িয়ে। কেউ কেউ বলে আসলে নাকি কলকাতা থেকে এসব প্রচার করা হয়। এটাও বিশ্বাস হতে চায় না। কলকাতা থেকে হলে নিশ্চয় এর চেয়ে ভালো প্রোগ্রাম হত, গানও এই দুটো তিনটে মাত্র ঘুরে ঘুরে দিত না। রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,' নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেলে কররে লোপাট,' 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' আর 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম।' আরেকটা গান হয়, এটা আগে কোনদিন শুনি নি—'কেঁদো না কেঁদো না মাগো আর তুমি কেঁদো না।'

আর অনুষ্ঠানের শুরুতে বাজে শাহনাজ বেগমের সেই গান যেটার রেকর্ড আমি কিটির হাতে সরিয়ে দিয়েছি—

'জয় বাংলা, বাংলার জয়।
হবে হবে হবে নিশ্চয়।'

অনুষ্ঠানের শেষেও এই গানটাই বাজানো হয়।

১৮ এপ্রিল
রবিবার ১৯৭১

বাদশা আসবে দশটায়, তার সঙ্গে রিকশায় করে পুরনো ঢাকায় যাব। শরীফ গাড়ি নিয়ে যেতে দিতে নারাজ—একই গাড়ি বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরছে দেখলে আর্মি সন্দেহ করতে পারে। আমি, রুমী বা জামীকে নিয়ে যেতে সাহস পাই নে। অতএব, ভাগনীজামাই বাদশাই আমার ভরসা। সে ডাক্তার মানুষ। তার কাজ-করবার ঐ পুরনো ঢাকারই মিটফোর্ড হাসপাতালে।

শরীফ রুমী-জামীকে নিয়ে চুল কাটাতে যাবে ঢাকা ক্লাবে। ওরা বেরোবার উদ্যোগ

করছে, হঠাৎ দেখি বেয়াই-বেয়ান এসে হাজির। শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আমিরুল ইসলাম, ওকে আমরা বেয়াই বলে ডাকি। রোববার সকালে ওরা প্রায়ই এরকম বেড়াতে বেরোয়। আজ কিন্তু ওদের মুখ থমথমে বিষণ্ন। আরেক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু নূরুর রহমানের মৃত্যুসংবাদ দিল। গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল। পথে এক জায়গায় পাক আর্মি ওদের গোটা দলটার ওপর গুলি চালায়।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমাদের জানাশোনার গণ্ডির ভেতরে, খুব নিকট একজনের মৃত্যুসংবাদ এই প্রথম শুনলাম। এত হাসিখুশি, আমুদে মানুষ ছিল নূরুর রহমান। যেখানেই যেত, সবাইকে মাতিয়ে তুলত। সেই মানুষ আর্মির গুলি খেয়ে মারা গেছে?

বেয়াই বলল, 'নূরু একা গেলে হয়তো মারা পড়ত না। সে তার বন্ধুর পরিবারের অনেক লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল তার গ্রামের বাড়িতে। দলে ছোট ছেলেপিলেও ছিল।

'বন্ধুটি কে? তার কিছু হয়নি তো?'

'বন্ধুটির নাম ভিখু চৌধুরী। সে আর তার বউও মারা গেছে।'

ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম, 'ভিখু চৌধুরী? আমাদের ভিখু আর মিলি নয় তো?'

'মিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মিসেস চৌধুরীর নাম মিলি তো বটে!'

ব্যাকুল হয়ে বললাম, 'ভিখু আমাদের আত্মীয়। এবং বন্ধুও। কবে ঘটেছে এ ঘটনা? কার কাছে শুনলেন?'

'তিন তারিখে। নূরুর কাজের ছেলেটাও ওদের সঙ্গে ছিল। সে এতদিন পরে ফিরে এসেছে। গতকাল আমার বাসায় গিয়ে সব বলেছে।'

উঃ! কি সাংঘাতিক। আজ আঠারো তারিখ, পনের দিন আগে ঘটে গেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। কেউ কিছু জানি না। কি রকম বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে বাস করছি আমরা ঢাকা শহরে। ভিখু অর্থাৎ মাসুদুল হক চৌধুরী সুলেখা প্রেসের মালিক, আসাদ গেটের কাছে নিউ কলোনিতে তার বাসা। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়—ইদানীং যাওয়া-আসা একটু কমই হত। কিন্তু এক সময়—অনেক বছর আগে এই ভিখু আর মিলি কতো প্রিয় ছিল আমাদের।

আমি বেয়াইকে জিগ্যেস করলাম, 'ভিখুর ছেলেমেয়েদের কথা কিছু জানেন? তারা বেঁচে আছে তো? আর কে কে ছিল দলে?

'ভিখুর ছেলেমেয়েদের কিছু হয় নি। ওর মা আর বোন গুলিতে জখম হয়েছে। তবে বেঁচে আছে।'

'ওরা কোথায় আছে এখন, জানেন কি?'

'না, জানি না।'

বাদশা এল। শরীফ বলল, 'তোমরা কিন্তু একই রিকশাতে ঘুরো না। একেক জায়গায় নেমে রিকশা ছেড়ে দিয়ো যেন কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছ। দু'চারটে দোকানে ঢুকে এদিক ওদিকে খানিক হেঁটে তারপর আরেকটা রিকশা নিয়ো।'

লালবাগ দিয়ে শুরু করলাম। চকবাজারে নেমে দু'চারটে দোকান ঘুরলাম। চকবাজার না বলে তার ধ্বংসাবশেষ বলাই ভালো। তবু ওরই মধ্যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে কিছু মানুষ যারা এখনো পাক আর্মির গুলি খেয়ে শেষ হয়ে যায় নি। তারপর ইসলামপুর, শাঁখারি পট্টি, ওয়াইজঘাট, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট, নবাবপুর ঘুরে জিন্নাহ এভিনিউ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সবখানেই বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর

ধ্বংসলীলার চিহ্ন প্রকট, কিন্তু শাঁখারি পট্টির অবস্থা দেখে বুক ভেঙে গেল। ঘরবাড়ি যেভাবে ভেঙেছে, মনে হয় ভারি গোলা ব্যবহার করতে হয়েছিল। এতদিনে লাশ সব সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু বাতাসে এখনো পচা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঝেয়, বারান্দায়, সিঁড়িতে এখনো পানি রয়েছে, রাস্তাতেও পানি। মনে হচ্ছে জমাট রক্ত ধুয়ে সাফ করার কাজ এখনো শেষ হয় নি। প্রায় সব ঘরেরই দরজা-জানালা ভাঙা, কোন কোন দরজার সামনের চট ঝুলছে। চটগুলোর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে এগুলো সদ্য কিনে ঝোলানো হয়েছে।

প্রতিটি বিধ্বস্ত ঘরের সামনে একটা করে কাগজ ঝুলছে। কি যেন সব লেখা।

কাছে গিয়ে দু'একটা পড়লাম। উর্দুতে লেখা কতগুলো মুসলিম নাম। শুনলাম, বিহারিদের এ জায়গাটা ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা পেয়েছে, তারা বরাদ্দকৃত ঘরের সামনে নিজ নিজ নাম লেখা কাগজ সেঁটে বা ঝুলিয়ে আপন মালিকানার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে।

২১ এপ্রিল
বুধবার ১৯৭১

রুমীর সাথে ক'দিন ধরে খুব তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ও যদি ওর জানা অন্য ছেলেদের মত বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে বাবা-মাকে লুকিয়ে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যেত, তাহলে একদিক দিয়ে বেঁচে যেতাম। কিন্তু ঐ যে ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছি লুকিয়ে বা পালিয়ে কিছু করবে না। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছি। রুমী আমাকে বুঝিয়েই ছাড়বে, সে আমার কাছ থেকে মত আদায় করেই ছাড়বে।

কিন্তু আমি কি করে মত দেই? রুমীর কি এখন যুদ্ধ করার বয়স? এখন তো তার লেখাপড়া করার সময় কেবল আই.এস.সি পাস করা এক ছাত্র, এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে, আবার আমেরিকার ইলিনয় ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতেও ওর অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। এই বছরের ২ সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হবে। ওকে আমেরিকা যেতে হবে আগস্টের শেষ সপ্তাহে। সেখানে গিয়ে চার বছর পড়াশোনা করে তবে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর এই সময় সে কি না বলে যুদ্ধ করতে যাবে?

নাসিরের বাড়িতে বসেও এই তর্ক হচ্ছিল। ডাঃ নাসিরুল হক হলিফ্যামিলি হাসপাতালে শিশু বিভাগের ডাক্তার—সে আমেরিকা চলে যাবার চেষ্টা করছে। হয়ত সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই রওনা হয়ে যেতে পারবে। নাসির কিছুদিন আগেও আমাকে সাপোর্ট করেছে। আজ দেখি উল্টো সুর? আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'বুঝেছি কেন রুমী ঘনঘন এ বাড়িতে আসে। এ কয়দিনে সে তোমাকে বুঝিয়ে পটিয়ে ফেলেছে।'

রুমী নাসিরের কয়েক মাস বয়সের মেয়েটিকে লোফালুফি করতে করতে বলল, 'কি যে বল আম্মা, আমি তো আসি এই ডল পুতুলটাকে আদর করতে। মামার সাথে আমার এ নিয়ে কথাই হয় নি। কিন্তু আম্মা, তোমাকে গত দু'সপ্তাহ ধরে যা বুঝিয়েছি তার সিকি ভাগ মামাকে বললে মামা কনভিন্‌স্‌ড হয়ে যেত। আম্মা শোন, ছাত্রজীবন লেখাপড়া করার সময় এসবই চিরকালীন সত্য; কিন্তু ১৯৭১ সালের এই এপ্রিল মাসে এই চিরকালীন সত্যটা কি মিথ্যে হয়ে যায় নি? চেয়ে দেখ, দেশের কোথায় সুস্থ,

স্বাভাবিক জীবনধারা বজায় আছে? কোথাও নেই। সমস্ত দেশটা পাকিস্তানি মিলিটারি জান্টার টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা হয়ে উঠেছে। রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের চেয়েও আমাদের অবস্থা খারাপ। একটা গ্ল্যাডিয়েটরের তবু কিছুটা আশা থাকত, একটা সিংহের সঙ্গে ঝুটোপুটি করতে করতে সে জিতেও যেতে পারে। কিন্তু এখানে? সেই ঝুটোপুটি করার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। হাত আর চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, কট্‌কট্ করে কতকগুলো গুলি ছুটে যাচ্ছে, মুহূর্তে লোকগুলো মরে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থার মধ্য থেকে লেখাপড়া করে মানুষ হবার প্রক্রিয়াটা খুব বেশি সেকেলে বলে মনে হচ্ছে না কি?'

'তুইতো এখানে পড়বি না। আই.আই.টি'তে তোর ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, তোকে না হয় কয়েক মাস আগেই আমেরিকা পাঠিয়ে দেব।'

'আম্মা, দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো; কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?'

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনদিনই বিতর্কে হারে নি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন?

আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম। 'না, তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধে যা।'

২২ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সময় মনে হচ্ছে থেমে আছে গতকাল থেকে। গতকাল এই সময় নাসিরের বাড়িতে—আমি ও রুমী। কি বলেছিলাম আমি? নাসির, লীনা, রুমী সবাই ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রুমীও নিশ্চয় এতটা নাটকীয়তা আশা করে নি তার মায়ের কাছ থেকে। তবু সে উজ্জ্বল হাসিমুখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। যেন ছোট ছেলে অনেক কসরত করে মা'র কাছ থেকে আইসক্রিম খাবার পয়সা আদায় করে নিয়েছে। নাসির ফ্যাকাসে মুখে হাসবার চেষ্টা করে শুধু বলেছিল, 'বুবু!' লীনা তার বাচ্চাকে বুকে চেপে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

রাতে ঘুম হয় নি। কাউকে কিছু বলতেও পারছি না। সকালে নাশতা খাবার টেবিলে কাসেম আবার বলল, সে বাড়ি যাবে। এর আগে দু'বার ছুটি চেয়ে পায় নি। একজন যুদ্ধে যেতে চেয়ে অনুমতি পেয়েছে, কাসেম তো শুধু চারদিনের জন্য বাড়ি যেতে চায়। বললাম, 'ঠিক আছে, যাবে।'

তারপরই তৎপর হয়ে উঠলাম। শরীফকে বললাম, 'অফিসে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দাও, ঠাটারী বাজারে যাব।'

শরীফ বলল, 'তার চেয়ে তুমি এখনই তৈরি হয়ে গাড়িতে চল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওইদিক দিয়ে বাজারে চলে যেয়ো।'

আজকাল রাস্তায় খালি গাড়ি দেখলেই আর্মির লোক থামিয়ে কয়েক ঘন্টা নিজের

কাজে ব্যবহার করে নেয়। সারা শহরে এ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গাড়িতে মহিলা থাকলে থামায় না।

ঠাটারী বাজারের অবস্থাও অন্য জায়গার চেয়ে এমন কিছু ভালো না। ২৫ মার্চের রাতে পুড়ে যাবার পর এখন এখানে-ওখানে কিছু কিছু মেরামত করে বাজার বসছে। আমি ড্রাইভারকে বললাম, 'গাড়ি বন্ধ করে আমার সঙ্গেই এসো।'

বাজারের পরিবেশ মোটেও ভালো লাগল না। দগ্ধ, বিধ্বস্ত বাজারের মাঝে-মাঝে দোকানী লোকগুলো কেমন যেন অস্বাভাবিক নির্বিকারভাবে বসে আছে। চোখে বাবা দৃষ্টি। সারা বাজারজুড়ে পানি থইথই করছে। এতে পানি কেন? এর মধ্যে তো বৃষ্টি হয় নি। মনে হচ্ছে সকালে প্রচুর পানি ঢেলে পুরো বাজারটা ধোয়া হয়েছে। কেন? হালে আবারো কিছু হয়েছে নাকি? কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। তাড়াতাড়ি কিছু গোশত আর কিমা কিনে চলে এলাম। দরকার নেই বাবা। নিউ মার্কেটে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই চালাবো।

দুপুরে খেতে বসেছি এমন সময় লুলু এল। সেও একটা প্লেট নিয়ে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে বলল, 'জানেন মামী, গতকাল নাকি বিহারিরা ঠাটারী বাজারে কয়েকজন বাঙালি কসাইকে জবাই করেছে।'

'ঠাটারী বা-জা-রে! দূর! বাজে কথা, আমি তো আজ সেখানে গিয়েছিলাম, কই, লোক জবাই হলে দোকানীদের মধ্যে যে রকম ভয়চকিত হাবভাব হওয়া উচিত ছিল, সে রকম তো কিছুই দেখলাম না। লোক জবাই হলে ওরা কি ওরকম নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে পারতো? তোরা কোথা থেকে যে এসব গুজব ধরে আনিস।'

কথাটা উড়িয়ে দিলাম বটে কিন্তু গা শিরশির করতে লাগলো।

খেয়ে উঠে কাসেমকে বললাম, 'নিউ মার্কেট থেকে গোটা কতক মুরগি আর কিছু মাছ কিনে আন। ওগুলো কুটে বেছে দিয়ে তারপর বাড়ি যেয়ো।'

২৩ এপ্রিল
শুক্রবার ১৯৭১

কিছুই ভালো লাগে না। জীবনের, পৃথিবীর সব রসকষ তো আগেই শুকিয়ে গেছে। যে ভয়, আতঙ্ক আমাদের সবাইকে টানটান করে রেখেছে, তাও যেন শিথিল হয়ে আমাদের দিনরাতগুলোকে এলিয়ে দিয়েছে।

মা'র বাসায় গেছিলাম সকালে। নিচতলায় রফিকরা আর মণিরা ভাগাভাগি করে থাকছে। মণি আমার চাচাতো বোন। ওরা নাখালপাড়ায় থাকতো। ২৫ মার্চের কয়েকদিন পর এ বাসায় এসে উঠেছে। মণির স্বামী, ছেলেমেয়ে, রফিক, জুবলী, তাদের দুটো বাচ্চা, কাজের মেয়ে আনোয়ারা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা পরিবারের এতগুলো লোক ছোট ছোট চারটে ঘরে থাকছে। বেশ কষ্ট করেই থাকছে। তবে রফিক ভাবছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি রোডে ওর ভাই আতিকুল ইসলামের বাসায় উঠে যাবে কিনা।

আমরা থাকতে থাকতেই মা'র মামাতো ভাইয়ের মেয়ে তারা আর তার স্বামী বেড়াতে এল। ওরা আসাদ গেটের কাছে নিউ কলোনিতে থাকে। ওরা বলল, ওই অঞ্চলে একটা থাকার জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে। কারণ ওদিকে বাঙালিদের থাকাটা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। মিরপুর-মোহাম্মদপুরের বিহারিরা দিন দিন অত্যাচারী

হয়ে উঠছে। সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভিন্ন জায়গাতে বাঙালিরা যে বিহারিদের মেরেছে, তার প্রতিবাদে তারা মিছিল বের করবে আগামীকাল। মোহাম্মদপুরের অনেক বাঙালিই ইতিমধ্যে বাসা ছেড়ে শহরের অন্য অঞ্চলে আত্মীয়দের বাসায় চলে গেছে।

আমি বললাম, 'বাঙালিরা বিহারিদের মেরেছে, তার প্রতিবাদে তারা মিছিল বের করবে? আর বিহারিরা যে বাঙালিদের কচুকাটা করেছে, তার বেলায় কে প্রতিবাদ করে?'

গতকাল প্রচুর রান্নাবান্না করেছি। কাসেম মাত্র চারদিনের ছুটি নিয়ে গেছে, কিন্তু জানি চারদিনের জায়গায় চোদ্দ দিন হয়ে যাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। আজ কোন কাজ নেই। তাই কি এগারোটার সময় গরম পানিতে সাবান গুলে একগুচ্ছ কাপড় ধুতে বসলাম? বড় বড় বেড কভারও। কিছু একটা কষ্টসাধ্য, ভারি কাজ করা দরকার। কিছু পেটানো, আছড়ানো। সারাদিন ধরেই কাপড় ধোয়া চলছে।

২৪ এপ্রিল
শনিবার ১৯৭১

মুজিবনগর বলে একটা জায়গায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে গত ১৭ এপ্রিল। ১০ তারিখেই নাকি এই প্রবাসী সরকার গঠিত হয়, আকাশবাণী, বিবিসি থেকে সে খবর আগেই জানা গেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও নাকি এই প্রবাসী সরকারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের এক বক্তৃতা প্রচার হয়েছে—আমরা নিজের কানে শুনতে পাই নি কিন্তু অন্যদের কাছে শুনেছি।

এসব খবর শুনে আনন্দে উত্তেজনায় আমরা সবাই শিহরিত। তবু খবরগুলো সঠিক কি না, বিশ্বাস করব কি করব না—এসব ভাবনায় দুলতে দুলতে শুনি আরেকটা খবর। ১৮ তারিখে কলকাতায় পাকিস্তানি দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন মিশনের পুরো দলবল নিয়ে।

এরপর কদিন ধরে ঢাকার কাগজে যে সব খবর বেরোল, তাতে ওদিকের খবরাখবরের ব্যাপারে অবিশ্বাসের কোনো অবকাশ রইল না—

: কলিকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন বেআইনী দখল থেকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

গত ১৮ এপ্রিল ভারতীয় বেতারের এক খবরে বলা হয়েছে—কলিকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অস্তিত্বহীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি পরিচয়দানকারী ব্যক্তিরা দখল করেছে।

: পাকিস্তান সরকার কলিকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

: ঢাকায় ভারতীয় মিশন গোটাতে বলা হয়েছে।

এর আগে যে আকাশবাণী আর বিবিসিতে শুনেছিলাম ৬ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশনের সেকেন্ডে সেক্রেটারি কে. এম. শাহাবুদ্দিন আর প্রেস এটাচি আমজাদুল হক পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূতাবাস ত্যাগ করেছেন, সে খবরটাও এতদিনে পুরোপুরি বিশ্বাস হল।

২৫ এপ্রিল
রবিবার ১৯৭১

আজ নাসির আমেরিকার পথে জেনেভা রওনা হবে। প্লেন বিকেলে, কিন্তু যাত্রী ছাড়া অন্য কারো এয়ারপোর্টে ঢোকার হুকুম নেই। তাই দুপুরেই বাসায় গিয়ে নাসির ও লীনাকে বিদায় জানিয়ে এসেছি।

ঢাকার বিমানবন্দরে এখন কড়া সিকিউরিটি। শুনেছি, বিমানযাত্রীর গাড়িও এয়ারপোর্টের গেট পেরিয়ে ভেতরে যেতে পারে না। গেটের বাইরে রাস্তার ওপর নেমে যেতে হয়। গেটের ভেতরে বাউন্ডারি ওয়াল ঘেরা জায়গাটা কম বড় নয়—আগে এখানে এক সঙ্গে প্রায় ৬০/৭০ টা গাড়ি পার্ক করা যেত। এতটা চৌহদ্দি মালপত্রসহ হেঁটে তারপর এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ে ঢোকা। যাত্রীদের কষ্টের আর শেষ নেই।

বাসায় ফিরে আমের আচার দিতে বসলাম। এবার আচার অনেক বেশি করে বানিয়ে বয়েম ভরে রেখে দেব। দুর্দিনে আর কিছু নাই পাই, শুধু আচার দিয়েই ভাত খাওয়া যাবে।

নারিন্দা থেকে আতাভাই এসেছিলেন খোঁজখবর নিতে। খোদাভক্ত, পরহেজগার সদাপ্রসন্ন মানুষ, কিন্তু ইসলামের নামে পাকিস্তানিরা যা করছে, তাতে তার প্রসন্নতা, শান্তি এবং ঘুম—সব নষ্ট হয়ে গেছে। বললেন, 'বুঝলে জাহানারা, ওদের আর বেশিদিন নাই। ইসলামের নামে ওরা যা করছে, তাতে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। মসজিদে বসে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন ক্বারী সাহেব, তাকে পর্যন্ত গুলি করে মেরেছে। খোদার ঘরে ঢুকে মানুষ খুন! মায়ের সামনে ছোট বাচ্চাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের সামনে মাকে বেইজ্জত করেছে। ভেবেছে খোদাতালা সইবেন এত অনাচার? ওরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছে।'

বিহারিরা শেষ পর্যন্ত তাদের মিছিল বের করতে পারেনি, সরকার পারমিশান দেয়নি। বাঁচা গেল। তবু গতকাল তারার মুখে শোনার পর থেকে রুমী-জামীকে একা কোথাও বেরোতে দিচ্ছি না।

২৮ এপ্রিল
বুধবার ১৯৭১

আজকের কাগজে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। নিউইয়র্কে পাকিস্তান দূতাবাসের ভাইস কনসাল মাহমুদ আলীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বুঝলাম আরেকজন দেশপ্রেমিক বাঙালি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করলেন।

বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করেছে—এটা খুশির খবর। তবে কি না মাহমুদ আলী আমাদের আত্মীয়—নাতজামাই। ওর শ্বশুর আবদুল খালেক শরীফের ভাগনে। এখন ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে সিলেটে রয়েছে। ২৫ মার্চের পর রটেছিল পাকি আর্মি ওদের সবাইকে গুলি করে মেরেছে। পরে খবর পাওয়া গেছে খালেক বাবাজি আর লেবু বউমা প্রাণে বেঁচে আছে। ওদের কাছাকাছি বাড়ির এক ইঞ্জিনিয়ারকে আর্মি গুলি করে মেরে ফেলার পর ওরা গ্রামে পালিয়ে যায়। মাহমুদ আলী ওদের জামাই।

কি জানি মাহমুদ আলীর কারণে পাক আর্মি ওদের আবার কোন অত্যাচার না করে।

কলিম এসেছিল। ওরা সবাই এখনো নিজ নিজ বাড়িতেই আছে—প্রাণ হাতে করে। ওর কাছে শহরে মিলিটারিদের অব্যাহত তৎপরতার কথা আরো কিছু শুনলাম। ট্রাকভর্তি চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা যুবকদের এখনো দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রায়। কলিম আরো বলল, 'মিরপুর-মোহাম্মদপুরে মাঝে-মাঝে ছুটকোছাট্‌কা গোলমাল হয়েছে। কিছু ছুরি মারামারি, কিছু ঘরবাড়িতে আগুন দেয়াদেয়ি।'

রঞ্জু এসে একটা মজার খবর দিল। গ্রীন রোড যেখানে ময়মনসিংহ রোডে গিয়ে মিশেছে, সেইখানে আজ বিকেল চারটার সময় শান্তি কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতামণ্ডলী : তিনটি ট্রাফিক পুলিশ, একটি মিলিটারি পুলিশ এবং একটি আর্মির জওয়ান।

২১ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

নাসরিনের বাবা মোতাহার সাহেব আমাদের বহু বছরের পরিচিত। ১৯৫০ সালে প্রথম যখন রেডিও প্রোগ্রাম করি, উনি তখন ছিলেন প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট। মাইকের সামনে কিভাবে, থেমে, দম নিয়ে পড়লে রিডিং পড়ার মতো শোনাবে না, কথা বলার মতই শোনাবে—এই কায়দা উনিই আমাকের প্রথম শিখিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে মোতাহার সাহেব তাঁর এক বন্ধু আশরাফ আলী সাহেবের সঙ্গে মিলে 'খাওয়াতীন' নামে যে মহিলাদের মাসিক পত্রিকা বের করেন, তাতে প্রথম দিকে আমাকে বেশ কিছুদিন সম্পাদিকার কাজ করতে হয়েছিল। তারপর বহুদিন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। আমাদের গলিতে ওঁর মেয়েজামাই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে, তাও জানতাম না।

হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, আমাদের বাসার সামনে মোতাহার সাহেব! কি ব্যাপার? উনি শ্যামলীতে থাকতেন, এই রকম সময়ে ওদিকে থাকা নিরাপদ নয়, তাই ওঁর জামাই সামাদ ওঁকে সপরিবারে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছে।

মোতাহার সাহেব এ পাড়ায় আসার পর সন্ধ্যেটা আমাদের ভালোই কাটে। খুব মজলিসী মানুষ। কতো জায়গার খবর যে বলেন। এক সঙ্গে সবাই মিলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনি। পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও ও সংবাদপত্রের খবর, আকাশবাণী ও বিবিসির খবর এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর চালাচালি করে আসল খবর বের করার চেষ্টা করি। এ কাজে মোতাহার সাহেবের জুড়ি নেই। ওর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়েরও শেষ নেই।

মা'র বাসায় গেছিলাম সকাল দশটায়। গিয়ে দেখি ওঁর জ্বর। রুমী সঙ্গে ছিল। ওকে দিয়ে রুটি আনিয়ে মা'র কাছে খানিক বসে বারোটার দিকে বাড়ি ফিরে দেখি—মোতাহার সাহেব আমাদের বসার ঘরে বসে কোথায় যেন ফোন করছেন। ওঁর চুল উষ্কখুষ্ক, মুখে উদ্বেগের ছাপ। কি ব্যাপার? ওঁর জামাই সামাদের বড় ভাই আজ ভোরের কোচে পাবনা রওনা দিয়েছিল। খানিকক্ষণ আগে উনি লোকমুখে খবর শুনেছেন—মিরপুরের বিহারিরা নাকি মোহাম্মদপুরের বাঙালিদের মেরে ধরে শেষ করে দিচ্ছে। ও পথে যত বাস, কোচ যাচ্ছে সেগুলোও থামিয়ে যাত্রীদের মেরে ফেলছে।

পাবনার কোচ তো আরিচার পথে মোহাম্মদপুর, মিরপুরের ওপর দিয়েই যাবে।

মারামারির খবর শোনার পর থেকেই উনি ফোন করছেন কমলাপুর কোচ স্টেশনে। রিং বেজে যাচ্ছে, কিন্তু কোচ স্টেশনে কেউ ফোন তুলছে না।

খবর শুনে আমারও বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। আমাকে বাসায় নামিয়ে রুমী আবার বেরোবার উদ্যোগ করছিল। এই খবর শোনার পর রুমীকে আর বেরোতে দিলাম না। শরীফকে তার ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিসে ফোন করে খবরটা জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বললাম।

মোতাহার সাহেব খানিক পরপরই এসে কোচ স্টেশনে ফোন করার জন্য ডায়াল করতে লাগলেন। রিং হয়, ফোন বেজেই যায়, কেউ ধরে না।

শেষে দুটোর দিকে মোতাহার সাহেব বললেন তিনি নিজেই কমলাপুর কোচ স্টেশনে যাবেন খবর নিতে।

উনি সামাদের ছোট ভাইকে নিয়ে কমলাপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা কয়েকজন বাড়িতে স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না, বাড়ির সামনে গলিতে দাঁড়িয়ে হোসেন সাহেব, রশীদ সাহেব, আহাদ সাহেব—এঁদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম।

ঘণ্টা দুয়েক পর মোতাহার সাহেব বিস্তারিত খবর নিয়ে ফিরলেন। কোচের ড্রাইভার আড়াইটের দিকে কমলাপুর কোচ স্টেশনে ফিরলে তার মুখে সব খবর জানা যায়। মিরপুর ব্রিজের কাছে বিহারিরা ওদের কোচ এবং অন্য একটা ছোট বাস থামিয়ে বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর সব যাত্রীকে নামায়। যাত্রীদের ভয়ার্ত চিৎকার, বিহারিদের রণহুঙ্কার ইত্যাকার হৈ চৈ গোলমালের সুযোগ নিয়ে পাবনাগামী কোচের ড্রাইভারটি বাসের তলায় লুকিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পুরো হত্যাযজ্ঞটি প্রত্যক্ষ করে। বিহারিরা যাত্রীদের নামিয়ে ধারাল দা বড় চাকু—এসব দিয়ে মারতে থাকে। বাসে দু'জন যাত্রী ছিল তারা কেবল মক্কা থেকে হজ্ব করে দেশে ফিরেছে। বিহারিরা কেবল ওই হাজি দু'জনকে ছেড়ে দেয়। বাকি সবাইকে মেরে ফেলেছে। কয়েকজনকে তারা ছুরি মেরে ব্রিজের ওপর থেকে নিচে নদীতে ফেলে দিয়েছে—ড্রাইভারটা তাও দেখেছে। মিনিবাসটাকে বিহারিরা ভেতরের রাস্তায় আরো খানিকদূর নিয়ে গিয়েছিল। বড় রাস্তার মোড়ে কোচের যাত্রীদের শেষ করে লাশগুলো ওখানেই ফেলে রেখে উল্লাসে উন্মত্ত বিহারিরা ঐ মিনিবাসটার দিকে চলে যায়। তখন ড্রাইভার কোনমতে জান নিয়ে পালিয়ে কমলাপুর কোচ স্টেশনে চলে গিয়ে সবাইকে এই খবর দেয়।

৩০ এপ্রিল
শুক্রবার ১৯৭১

বেশ গরম পড়ে গেছে। ক'দিন আগের তুমুল বৃষ্টির ফলে হিউমিডিটি বেড়ে গরমটা আরো অসহ্য লাগছে। সন্ধ্যায় গাড়ি-বারান্দার সামনের ছোট খোলা জায়গাটায় বেতের চেয়ারে বসেছিলাম। আজ মোতাহার সাহেব বেড়াতে আসেন নি। উনি সারাদিন ধরে মেডিক্যাল ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে, থানায় এবং সম্ভব অসম্ভব আরো বহু জায়গায় ছুটে বেরিয়েছিলেন। শরীফ বলল, 'চল, আমরাও ওঁর বাসায় যাই। খোঁজ নিয়ে আসি কি হল।'

আমাদের বাড়ি থেকে দুটো বাড়ির পরে মেইন রোডের কাছাকাছি সামাদের বাসা। এটা আসলে সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ি—এ গলিতে ওঁর বাড়িটাই একমাত্র তেতলা—সামাদরা একতলায় ভাড়া থাকে।

সামাদদের বসার ঘরের একপাশে একটা খাট আছে। মোতাহার সাহেব সেই খাটে শুয়েছিলেন। আমাদের দেখে উঠে বসলেন। দু'দিনেই ওর দশ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে, মনে হল।

আমরা চেয়ারে বসে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মোতাহার সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, 'কোথাও খোঁজ পেলাম না। মর্গে যত লাশ দেখলাম, সব পেটের নাড়িভুড়ি বের করা। পিশাচগুলো প্রথম কোপ দিয়েছে পেটে। তারপর শরীরের অন্য সব জায়গায়। উঃ! এমন বীভৎস দৃশ্য জীবনে চোখে দেখি নি। পুলিশে সব লাশ তুলে আনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ড্রাইভারতো নিজেই দেখেছে অনেকগুলোকে নদীর পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছে। ছুঁড়ে ফেলার পরিশ্রমে বোধহয় পারে নি, নইলে সব লাশই নিশ্চয় নদীতেই ফেলত।'

মোতাহার সাহেব চোখ বন্ধ করলেন।

'আপনি ওসব কথা এখন আর বলবেন না, মনেও করবেন না। আজ রাতে বরং দুটো ভ্যালিয়াম খেয়ে শোবেন।' এই বলে আমরা চলে এলাম।

সে রাতে ভ্যালিয়াম আমাদেরও খেতে হল। তা সত্ত্বেও ঘুম এল না। মাঝে-মাঝে তন্দ্রার মধ্যে চমকে উঠতে লাগলাম।

মে

কাছেই বোমা পড়েছে, বিকট শব্দ, লোকজনের চিৎকার শুনেছি, আগুন দেখেছি। আর তখুনি একবস্ত্রে পালিয়েছি পাশের এক গ্রামে। কিন্তু সেখানে একরাত থাকার পরই শুনলাম মিলিটারি আসছে। যাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম তারাসুদ্ধ পালালাম। দু'দিন পর ফিরে এসে দেখি— পুরো গ্রাম আগুনে পুড়ে ছাই।

১ মে
শনিবার ১৯৭১

চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা লোকজনকে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, নদীতে চোখ-হাত বাঁধা বুলেটবিদ্ধ লাশ ভেসে যাওয়া—এসব খবরের পাশাপাশি আরেকটা রক্ত হিম-করা খবরও মাঝে-মাঝে শুনছিলাম। দু'একজনের কাছে, অবিশ্বাসযোগ্যভাবে, অল্প-স্বল্প শুনতে শুনতে এখন সে খবরটাই সবার মুখে মুখে দ্রুত ছড়াতে ছড়াতে সারা শহরময় কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান আর্মি যুবা ও বয়স্ক লোকদের ধরে নিয়ে এখন আর গুলি করে মেরে ফেলছে না, তাদের শরীর থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত রক্ত বের করে নিয়ে তারপর লাশ ফেলে দিচ্ছে। এত রক্ত কেন দরকার হচ্ছে? দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে যুদ্ধ হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে, তাতে প্রচুর সংখ্যায় পাকিস্তানি সৈন্য জখম হচ্ছে। তাদের চিকিৎসার জন্য প্রচুর রক্ত দরকার। এত রক্ত ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে নেই। তাই এভাবেই তারা রক্ত সংগ্রহ করছে।

প্রথম খবরটা কিভাবে বেরিয়েছিল? গুলি করে, ছুরি মেরে লাশ ফেললে বোঝা যায়, রক্ত বের করে নিয়ে লাশ ফেললে কিভাবে লোকে বুঝবে? শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, অথচ মৃত। প্রথমে লোকে বুঝে পায় নি কি করে মরল। দু'একজন ফেলে দেওয়া লোক মরে নি। তারা কোনমতে বেঁচে উঠে যখন এই খবর ছড়াল, তখন লোকে বুঝতে পারল কোনরকম আঘাতের চিহ্ন ছাড়াই মরে যাবার রহস্যটা কি।

সারা ঢাকা শহরে এখন ভয়ানক আতঙ্ক। অথচ কোন হাসপাতালের কোন ডাক্তার বলতে পারছে না কোথায় এসব কাণ্ড হচ্ছে। কারণ রক্ত বের করে নিতে হলে একটা টেবিল, একজন ডাক্তার বা কম্পাউন্ডার, রক্ত বের করার সিরিঞ্জ, রবারের নল, রক্ত ভরবার বোতল বা প্লাস্টিক ব্যাগ—এসব দরকার। কোন হাসপাতালে এসব যত গোপনেই করা হোক, ব্যাপারটা জানাজানি হবেই। কোন হাসপাতালেই এসব হচ্ছে না, পরিচিত বহু ডাক্তার বলেছেন। তাহলে? পাকিস্তানিরা নিশ্চয় গোপন ক্লিনিক বসিয়ে ফেলেছে এসব কাজের জন্য। আমাদের জানাশোনা অনেক ডাক্তার ব্যাপারটা স্রেফ গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন। আমরাও তো তাই চাই। কিন্তু আতঙ্ক যে ছাড়ে না।

রঞ্জু একটা রক্ত হিম-করা খবর আনল। মহাখালি থেকে যে রাস্তাটা টঙ্গী-জয়দেবপুরে দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তার বাঁদিকে বেশ কতকগুলো দোকানপাট আছে। মাঝে-মাঝে সরু গলি চলে গেছে বাঁদিকে ভেতরে। সেদিকে বাড়িঘর-পাড়া আছে। অন্যদিকে তো গুলশান। এই রকম জায়গায় একটা ওষুধের দোকানে রঞ্জুর এক বন্ধুর এল.এম. এফ ডাক্তার রোজ সন্ধ্যায় বসে, দু'চারটে রুগী দেখে। ক'দিন আগে সন্ধ্যার পরে দু'জন পাকিস্তানি সৈন্য আর দু'জন বিহারি বন্দুকের মুখে ডাক্তারটিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ওরা প্রথমে ডাক্তারকে জিপে তুলে একটু এগিয়ে বাঁয়ে এক গলিতে ঢোকে, সেই সময় পেছন থেকে একজন ওর চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে দেয়। তারপর মিনিট দশেক চলার পর জীপ থামলে ডাক্তারকে লোকগুলো ধরে ধরে একটা বাড়ির ভেতর নিয়ে তারপর চোখ খুলে দেয়। ডাক্তার দেখে, একটা টিনের ছাদওয়ালা বেড়ার ঘর। একপাশে একটা সরু লম্বা টেবিল, সেটার মাথার কাছে আরেকটা চৌকো ছোট টেবিলে অনেক কয়টা বোতল, সিরিঞ্জ, রবারের নল ইত্যাদি

সাজানো। আরেক পাশে লম্বা বেঞ্চে চোখ বাঁধা অবস্থায় বসা তিনটে লোক। সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্য আর বিহারিদের নির্দেশে ডাক্তারটিকেও ঐ লোক তিনটির শরীর থেকে রক্ত বের করতে হয়। রঞ্জুর বন্ধুটি কিন্তু এইরকম ভয়াবহ অবস্থাতেও বুদ্ধি হারায় নি। কাজ শেষে পাকিস্তানি সৈন্য আর বিহারিরা যখন তর্ক করছিল ডাক্তারটিকে মেরে ফেলা হবে কি না, তখন ডাক্তারটি ওদেরকে বলে : ওরা যখনই বলবে, সে এভাবে এসে ওদের কাজ করে দেবে। ডাক্তারটির কপাল ভালো ওরা তাকে বিশ্বাস করে। ছাড়া পাওয়া মাত্রই ডাক্তারটি উর্ধ্বশ্বাসে রঞ্জুর বাসায় এসে তাকে সব বলে সেই রাতেই পালিয়েছে বর্ডার পেরিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবার জন্য।

রঞ্জু চলে যাবার পরেও আমরা বহুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, 'আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। রঞ্জুর বন্ধু যে বানিয়ে বলে নি, তার প্রমাণ কি?'

রুমী রেগে উঠল, 'আম্মা সবটাতেই তোমার অবিশ্বাস। সবকিছুতেই তোমার প্রমাণ চাই।'

শরীফ ধীর গলায় বলল, 'বিশ্বাস হতে চায় না এই জন্যে যে এত সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে ধরে নিতে কষ্ট হয়।'

'কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী কি করেছে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বন্দীদের ওপর, পড় নি? বাড়িতে কমপক্ষে দশটা বই রয়েছে এই বিষয়ে।'

রুমীর মেজাজটা আজকাল খুব ভালো যাচ্ছে না। এখানো ও যুদ্ধের যেতে পারে নি। সঠিক যোগাযোগের লোক পাচ্ছে না। প্রায় প্রায় গজগজ করে, 'প্রথম চোটে আমার যে সব বন্ধুরা গেছে তাদের সঙ্গে গেলে কত সহজে বর্ডার ক্রস করতে পারতাম। তখন নিরাপদও ছিল। বর্ডার ঘেঁষে বহু জায়গা মুক্ত ছিল। এখন তো পাকিস্তানি সৈন্য বেশির ভাগ জায়গাই আবার দখল করে নিয়েছে। এখন যাতায়াতের রাস্তায় বিপদ অনেক বেড়ে গেছে।'

আমি চুপ করে থাকি। এখন যেন মনে হয়, অনেক আগে যেতে দিলেই হতো। এই যে জলজ্যান্ত মানুষ ধরে নিয়ে, ঠাণ্ডামাথায়, সাবধানে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে সবটুকু রক্ত বের করে নিয়ে মেরে ফেলছে—এই রকম আতঙ্কময় রটনার মাঝে রুমীর মতো তাগড়া ছেলে নিয়ে বসবাস করতে দম আটকে আসে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে বিছানায় উঠে বসে থাকি।

২ মে
রবিবার ১৯৭১

ধানমণ্ডি ১৩ নম্বর রোডে মকু অর্থাৎ মাহবুবুল হক চৌধুরীর বাড়ি। ভিখু চৌধুরীর বড় ভাই। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন ল' সেক্রেটারি। ভিখুর বোন, মা ও মেয়েরা করটিয়া থেকে ফিরে এসেছে কয়েকদিন হল। দেখা করতে গেলাম ওদের সঙ্গে। বজ্রাহতের মতো বসে আছে সবাই। কেবল খালাম্মা অর্থাৎ ভিখুর মা কথা বলছেন, মাঝে-মাঝে কাঁদছেন। ভিখুর বোন বুলু অর্থাৎ মাসুদার স্বামী শরফুল আলম পোলান্ডে পাকিস্তান দূতাবাসে রয়েছেন। বুলু ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসে এই কাণ্ড। তার ডান

কাঁধের নিচে গুলি লেগেছিল। ভিখুর মা'র মুখে পুরো ঘটনাটা শুনলাম।

ওদের বিরাট একটা দল ঢাকা থেকে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। করটিয়ায় জাহাঙ্গীরের (ইঞ্জিনিয়ার নূরুর রহমানের ডাক নাম) ফুফার বাড়িতে আশ্রয় নেবার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে। সকালবেলা নাশতা তৈরি হচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে সবাই মুখ-হাত ধুচ্ছিল, এমন সময় পাক আর্মি এসে সে বাড়ি ঘেরাও করে গুলি চালাতে থাকে। ভিখুর মা ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই দেখেন গুলিবিদ্ধ ছেলে ও পুত্রবধূর দেহ বাড়ির পুকুরপাড়ে। মিলির পা দুটো পুকুরের পানিতে, মাথা পুকুরের পাড়ে। গুলি লাগে তাঁর তলপেটে, বুলুর কাঁধের নিচে। জাহাঙ্গীরের ফুফা ঘরের মধ্যে ছিলেন, তিনি সেখানেই গুলি খেয়ে ঢলে পড়েন। গুলি খেয়ে ঢলে পড়ে জাহাঙ্গীর। আরো অনেকে মারা পড়ে, বাকিরা চিৎকার করে দৌড়ে পালাতে থাকে। আর্মি খানিকক্ষণ গুলি চালিয়ে মেরে-ধরে চলে যায়। ভিখুর মা তলপেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভিখুর মেয়ে দু'টিকে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে ইয়েন ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে যাচ্ছে অন্য কতকগুলো লোকের পেছন পেছন। ভিখুর মা ঐরকম আহত অবস্থাতেই একহাতে তলপেট চেপে ধরে ছুটে গিয়ে অন্য হাতে নাতনীকে টেনে আনেন। মিলিটারি চলে যাবার পর সেই গ্রামের একটি সহৃদয় ছাত্র অনেক কষ্টে বুলু ও তার মাকে মির্জাপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওরা প্রায় তিন সপ্তাহ থাকেন। তারপর আত্মীয়বন্ধুর সহায়তায় ঢাকা এসেছেন। বুলু ও তার মার দেহে তখনো গুলির টুকরো রয়ে গিয়েছিল, ধানমণ্ডিতে ডাঃ মনিরুজ্জামানের ক্লিনিকে খুব গোপনে, খুব সাবধানতার সঙ্গে এঁদের দু'জনের শরীর থেকে গুলির টুকরো বের করা হয়েছে।

আমি সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। সমস্ত দেশের ওপর কি মহা সর্বনাশের প্রলয় ঝড় নেমে এসেছে। ভিখু, মিলি, হামিদুল্লাহ, সিদ্দিকা, খোন্দকার সাত্তার, রঞ্জুর কলিগ, নূরুর রহমান—কি এদের অপরাধ ছিল? শান্তিপ্রিয় নাগরিক, নিজের দেশকে ভালোবাসতো। ভিখু প্রেস চালিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করে খেত, আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিল। এই তার এতবড় অপরাধ? হামিদুল্লাহ, শান্ত নিরীহ মানুষ, পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম এবং একমাত্র ষোলআনা বাঙালি মালিকানার ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এই অপরাধে তার এত বড় শাস্তি? নিষ্ঠুর হত্যাকারীদের গোলার আঘাতে একমাত্র সন্তানকে চোখের সামনে মরতে দেখল, ভয়ানক আহত বউও কয়েকদিন পরে তার কোলেই শেষ নিশ্বাস ফেলল। নূরুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার—স্বাধীন ব্যবসা করে খেত, বিয়ে করেনি বলে কোন পিছুটান ছিল না। দেশের ও দশের উপকার করে বেড়াত। সেই অপরাধে তাকে প্রাণ দিতে হল?

৩ মে
সোমবার ১৯৭১

আজ আমার জন্মদিন।

২৯ মার্চ রুমীর জন্মদিনে তবু ভাবতে পেরেছিলাম কিছু স্পেশাল রান্না করা দরকার। কারণ তখনো ২৫ মার্চ কালরাত্রির আকস্মিকতার আঘাত মনকে পুরোপুরি ধরাশায়ী করতে পারে নি; কারণ তখনো এই নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞের ব্যাপকতা বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু সেই ধ্বংসযজ্ঞের পাঁচ সপ্তাহ পর এখন মনমানসিকতা যেন একেবারে

মরে যায় নি। কিন্তু সেই ধ্বংসযজ্ঞের পাঁচ সপ্তাহ পর এখন মনমানসিকতা, চিন্তাধারা কিছুই আর চিরাচরিত, গতানুগতিক খাতে বইছে না। যে জীবন এতকাল যাপন করে এসেছি, তা বড়ই অর্থহীন মনে হচ্ছে। ভিখু, মিলি, সিদ্দিকা, নূরুর রহমানের অনর্থক হত্যা মনকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছে।

তবু প্রতিবছরের অভ্যাসমতো, রুমী-জামী যখন আজ সকালে আমাদের ঘরের দরজার ওপাশ থেকে বলল, 'আম্মা আসি?' তখন চোখ ভরা পানি নিয়ে বললাম, 'এসো।'

ওরা প্রতিবছরের অভ্যাসমতই ঘরে ঢুকল, কিন্তু প্রতিবছরের মতো হাসিমুখে নয়, সুন্দর প্যাকেটে মোড়া হাতভর্তি 'সারপ্রাইজ প্রেজেন্ট' নিয়েও নয়। ওদের মুখও মেঘাচ্ছন্ন, তবে তাতে পানি নেই, বজ্রের আভাস আছে—টের পেলাম। রুমীর হাতে একটা পুরনো বই, জামীর হাতে বাগান থেকে তোলা একটি আধা-ফোটা কালো গোলাপ যার নাম 'বনি প্রিন্স।'

রুমী বইটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আম্মা এই বইটা তুমি পড়লে মনে অনেক জোর পাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি অতর্কিত আক্রমণ করে পোলান্ড দখল করে নেবার পর সেখানে পোলিশ ইহুদীদের ওপর নাৎসী বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে পোলিশরা যে অসাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারই কাহিনী এটা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কিভাবে তারা লড়াই করে গেছে, লড়াই করে মরেছে, তবু মাথা নোয়ায় নি, তারই কাহিনী এটা। এই বইটা পড়লে তোমার মনের সব ভয় চলে যাবে, সব দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যাবে। জার্মানরা ইহুদীদের মানুষ বলে গণ্য করত না। পশ্চিম পাকিস্তানিরাও আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না, মুসলমান বলেও গণ্য করে না। অথচ ওদের চেয়ে আমরা বহুগুণে খাঁটি মুসলমান। পড়লে তুমি বুঝতে পারবে, এই বইতে যা লেখা আছে, দেশ আর জাতির নাম বদলে দিলে তা অবিকল বাংলাদেশ আর বাঙালির দুঃখের কাহিনী, প্রতিরোধের কাহিনী, বাঁচা-মরার লড়াইয়ের কাহিনী বলে মনে হবে।'

চেয়ে দেখলাম লিয়ন উরিস-এর লেখা 'মাইলা-১৮'। রুমীর নিজস্ব লাইব্রেরিতে 'এক্সোডাস'-এর বিখ্যাত লেখক লিয়ন উরিস-এর সবগুলো বই-ই আছে। আগে দেখেছি, তবে পড়া হয়ে ওঠে নি।

জামী কালো গোলাপের আধফোটা কলিটি আমার হাতে দিল, রুমী বলল, 'আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। এইরকম রঙের রক্ত ঝরিয়ে তবে স্বাধীনতার রাজপুত্র আসবে।'

বনি প্রিন্স-এর পাপড়িগুলো কালচে ঘন মেরুন রঙের, জমাট বাঁধা কালচে রক্তের মত। এখনো পুরো ফোটে নি, মখমলের মতো মসৃণ, পুরু পাপড়িগুলো মুঠি বেঁধে আছে। আমাদের স্বাধীনতার এখনো অনেক দেরি।

রুমী বলল, 'তোমার জন্মদিনে একটি সুখবর দিই আম্মা।' সে একটু থামল, আমি আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম, 'আমার যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। ঠিকমত যোগাযোগ হয়েছে। তুমি যদি প্রথম দিকে অত বাধা না দিতে, তাহলে একমাস আগে চলে যেতে পারতাম।'

আমি বললাম, 'তুই আমার ওপর রাগ করিস নে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুই হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছিস, না, সত্যি সত্যি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যেতে চাচ্ছিস।'

'হুজুগে পড়ে?' রুমীর ভুরু কুঁচকে গেল, 'বাঁচা-মরার লড়াই, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে যেতে চাওয়া হুজুগ?'

'না, না, তা বলি নি। ভুল বুঝিস নে। বন্ধুরা সবাই যাচ্ছে বলেই যেতে চাচ্ছিস কি

না, যুদ্ধক্ষেত্রের কষ্ট ও ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পেরেছিস কি না সেসব যাচাই করবার জন্যই তোকে নানাভাবে বাধা দিচ্ছিলাম। তুই-ই তো বলেছিস, তোর কোন কোন বন্ধু যুদ্ধের কষ্ট সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছে।'

'তা এসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। কোটিতে দু'জনার বেশি হবে না।'

'কবে যাবি? কাদের সঙ্গে?'

'তিন-চারদিনের মধ্যেই। কাদের সঙ্গে—নাম জানতে চেও না, বলা নিষেধ।'

লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন পাঁজরের সবগুলো হাড় ছেপে ধরেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, চোখের বাইরে, নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে। জানতে চাওয়াও চলবে না—কোন পথে যাবে, কাদের সঙ্গে যাবে। রুমী এখন তার নিজের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার একান্ত নিজস্ব ভুবন, সেখানে তার জন্ম-দাত্রীরও প্রবেশাধিকার নেই।

মনে পড়ল, খালীল জিবরান তাঁর 'প্রফেট' বইতে এদের সম্পর্কেই লিখে গেছেন :

তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের নয়,
... ...
তারা জীবনের সন্তানসন্ততি
জীবনের জন্যই তাদের আকুতি।
তারা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে
তবু তারা তোমাদের নয়।
তারা তোমাদের ভালোবাসা নিয়েছে
কিন্তু নেয় নি তোমাদের ধ্যান-ধারণা,
কেননা তারা গড়ে নিয়েছে
তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা।
তাদের শরীর তোমাদের আয়ত্তের ভেতর
কিন্তু তাদের আত্মা কখনই নয়
কেননা, তাদের আত্মা বাস করে
ভবিষ্যতের ঘরে,
যে ঘরে তোমরা কখনই পারবে না যেতে
এমনকি তোমাদের স্বপ্নেও না।
... ...
তাদেরকে চেয়ো না তোমাদের মত করতে
কারণ তাদের জীবন কখনই ফিরবে না
পেছনের পানে।

৪ মে
মঙ্গলবার ১৯৭১

সামরিক সরকার নিজেদের অপকর্ম ঢেকে দেশের সবকিছু স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে। আজকের কাগজে একটা হাস্যকর খবর ছাপা হয়েছে কবি সুফিয়া কামালের ছবিসহ। এক রেডিও কথিকায় পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী বেগম সুফিয়া কামাল বলেছেন—যাঁরা তাকে ভালোবাসেন তাঁরা জেনে সুখী

হবেন যে তিনি ভলোই আছেন এবং সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে অতিশয় বিষণ্ণবদন কবির সামনে রেডিও'র মাইক ধরে আছে একটি অদৃশ্য হাত। মাইকটাকে মনে হচ্ছে যেন উদ্যত সঙ্গীন।

ভারতীয় বেতার তাঁর মৃত্যুর খবর বের করেছিল, সেই প্রেক্ষিতে তাঁর এই ফটো তোলা হয়েছে। কবির মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তাঁর পিছে যেন বেয়নেট ঠেকানো রয়েছে। কাগজে আরো ফলাও করে বেরিয়েছে :

গতকাল বাংলা একাডেমির ডিরেক্টর কবীর চৌধুরী ঢাকা রেডিও থেকে মুনশি মেহেরুল্লাহ সম্পর্কে এক কথিকা প্রচার করেন।

সম্প্রতি কতিপয় মার্কিন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব কবীর চৌধুরীর পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য আবেদন ছাপিয়ে, তিনি সাম্প্রতিক গোলযোগে মারা গেছেন—একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।

গত পরশুর কাগজেও ঠিক এই একই ধরনের খবর ছাপা হয়েছে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মফিজুল্লাহ কবির ১ মে শনিবার ঢাকা টিভিতে মুসলিম বাংলার দু'জন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হাজি শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার জীবন ও অবদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ মোহর আলী।

ডঃ কবীর সাম্প্রতিক গোলযোগে মারা গেছেন—এই গুজবের অবসানকল্পে তাঁকে টিভিতে হাজির করা হয়েছে।

আমাদের মত অখ্যাত রেডিও টকার ছাড়াও ওরা এখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বিখ্যাত লোকদের ধরে ধরে রেডিও-টিভিতে হাজির করে সবাইকে জানাতে চাচ্ছে—ওঁরা সামরিক জান্তার হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় নি। খুব ভালো কথা। তা সামরিক জান্তা দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জি. সি. দেব, জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার জনাব মুকতাদির, সয়েল সায়েন্সের সিনিয়র লেকচারার ডঃ এফ. আর. খান, গণিত বিভাগের লেকচারার জনাব শরাফত আলী, ফিজিক্স্-এর জনাব খাদেম, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের মিঃ ভট্টাচার্য, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের মিঃ সাদেক ও ডঃ সাদত আলী—এঁদেরকেও একে একে এনে রেডিও-টিভিতে হাজির করুক না। বলুক না সারা দুনিয়ার লোককে—এঁদেরকে ওরা ২৫ মার্চের কালরাত্রে গুলি করে মেরে ফেলে নি।

৬ মে
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রুমী আগামীকাল রওনা হবে। ওর প্যান্টের কোমরের কাছে ভেতর দিকে মুড়ির সেলাই খুলে সেখানে কয়েকটা একশো টাকার নোট লম্বালম্বি ভাঁজ করে রেখে আবার মুড়ি সেলাই করে দিলাম। পকেট ওয়ালেটে শ'দুয়েকের বেশি রাখবে না, কারণ পথে খানসেনারা হাতিয়ে নিতে পারে।

কাপড়-জামা রাখার জন্য রুমী সঙ্গে নিচ্ছে একটা ছোট আকারের এয়ারব্যাগ। তাতে দু'সেট কাটা কাপড়, তোয়ালে, সাবান, স্যান্ডেল আর দুটো বই—'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'সুকান্ত সমগ্র।'

যে বন্ধু দু'জনের সঙ্গে যাবে—, তাদের নাম অবশেষে বলেছে রুমী—মবু আর শিরাত। সেই সঙ্গে এটাও বলেছে যে, নাম দুটো কাল্পনিক।

রাতে শোবার সময় রুমী বলল, 'আম্মা আজকে একটু বেশি সময় মাথা বিলি করে দিতে হবে কিন্তু।'

জামী বলল, 'মা, আজ আর আমার মাথা বিলি করার দরকার নেই। ওই সময়টাও তুমি ভাইয়াকেই দাও।'

ছোট বয়স থেকে ঘুমোবার সময় দু'ভাইয়ের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। মাঝে-মাঝে এ নিয়ে দু'ভাইয়ের ঝগড়াঝাটিও বাঁধে। রুমী বলে 'আম্মা তুমি জামীর কাছে বেশিক্ষণ থাকছ।' জামী বলল, 'মা তুমি ভাইয়ার মাথা বেশি সময় বিলি দিচ্ছ।'

আমি রুমীর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম, রুমী 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটার সুরে আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগল।

৭ মে
শুক্রবার ১৯৭১

সকালে নাশতা খাওয়ার সময় রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে সেক্রেটারিয়েট সেকেন্ড গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ো। জামী, তুই এয়ারব্যাগটা আগেই গাড়িতে রেখে আয়। পায়ের কাছে রাখবি, যেন দেখা না যায়।'

নাশতা খেয়ে রুমী তার দাদার পাশে বসে তাঁর হাতটা ধরল। বাবা চোখে দেখেন না, তাই যে-ই আসুক, আগে তার হাত ধরে। হাত ধরেই বাবা আস্তে বললেন, 'কে?'

'আমি রুমী, দাদা।'

খানিক একথা সেকথার পর রুমী বলল, 'দাদা, আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি—এক্সকারসনে।'

'এক্সকারসনে? কি-তোমাদের কলেজ থেকে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো বন্ধ। ঠিক কলেজ থেকে নয়; তবে কলেজেরই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে—মানে, বাড়ি বসে বসে একেবারে ঘেঁতিয়ে গেছি—কোন কাজকর্ম তো নেই, তাই—'

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় থেমে থেমে বললেন, 'এক্সকারসন খুব ভালো জিনিস। আমাদের সময়ও হত; তবে ছুটির সময়। তা সাবধানে থেক, এখন তো সব জায়গায় খুব গোলমাল শুনি।'

'না দাদা, গোলমাল আর নেই। সব জায়গা এখন তো শান্ত—'

'শান্ত? জামীদের স্কুল তাহলে এখনও বন্ধ কেন? তোমার কলেজ খোলে না কেন?'

বাবাকে নিয়ে এই এক সমস্যা। চোখে না দেখলে কি হবে, চিন্তা ও ধারণাশক্তি এখনও টনটনে। সবকিছু জানতে চান, একটু কোথাও উনিশ-বিশ হলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ব্লাড প্রেসার ধাই করে চড়ে যায়। সেই জন্য ওঁকে সবকিছুর খবর বেশ ভালো মত সেন্সার করে বলতে হয়। তবে বাবার একটা পরিমিতিবোধ জন্মে গেছে। আগে যেমন অনেক ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করতেন, এখন আর তা করেন না। সবই মেনে নেন।

ক'দিন থেকেই মাঝে-মাঝে বিকেলে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। লেট কালবৈশাখী। আজ

আবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। ইয়া আল্লা, আজ যেন ঝড়বৃষ্টি না আসে।

জামীকে পাশে বসিয়ে আমি স্টিয়ারিং হুইল ধরলাম। ড্রাইভারকে গতকালই বলে দেওয়া হয়েছে, আজ তাকে লাগবে না। পেছনে শরীফ আর রুমী বসল। শরীফের হাতে খবরের কাগজ। খুলে পড়ার ভান করছে।

রুমী বলল, 'সেকেন্ড গেটের সামনে আমি নেমে যাওয়া মাত্র তোমরা চলে যাবে। পেছন ফিরে তাকাবে না।'

তাই করলাম। ইগলু আইসক্রিমের দোকানের সামনে গাড়ি থামালাম। রুমী আধাভর্তি পাতলা ছোট এয়ারব্যাগটা কাঁধে ফেলে নেমে সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল। যেন একটা কলেজের ছেলে বইখাতা নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আমি হুস্ করে এগিয়ে যেতে যেতে রিয়ারভিউ-এর আয়নায় চোখ রেখে রুমীকে এক নজর দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে পেলাম না, সে ফুটপাতের চলমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গেছে।

৯ মে
রবিবার ১৯৭১

একটা লোহার সাঁড়াশি যেন পাঁজরের দুই পাশ চেপে ধরে আছে। মাঝে-মাঝে নিশ্বাস আটকে আসে। মাঝে-মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে সব কাজ ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মাছের মাকে নাকি শোক করতে নেই। চোরের মাকে নাকি ডাগর গলায় কথা বলতে হয়। রুমী যাবার পর উঁচু ভল্যুমে ক্যাসেট বাজানো হয় প্রায় সারাদিনই। সন্ধ্যে হলেই সারা বাড়িতে সব ঘরে বাতি জ্বেলে জোরে টিভি ছেড়ে রাখা হয়। অর্থাৎ বাড়িতে বেশ একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। বেশ গান বাজনা, হৈচৈ, কলকোলাহল। আশেপাশে কোন বাড়ির কেউ যেন সন্দেহ না করে যে এ বাড়ির লোকগুলোর বুক খাঁখাঁ করছে, ব্যথায় কলজেয় টান ধরছে।

আকাশের বুকেও অনেক ব্যথা। তার কিন্তু আমার মতো চেপে রাখার দায় নেই। তাই সেও ক'দিন থেকে মাঝে-মাঝে অঝোরে ঝরাচ্ছে। না জানি রুমীদের কি কষ্ট হচ্ছে এই বৃষ্টিতে।

জামীও আবদার ধরেছিল সে রুমীর সঙ্গে যাবে। তাকে অনেক করে বুঝিয়েছি, দু'ভাই এক সঙ্গে গেলে পাড়ার লোকে সন্দেহ করবে। সবচেয়ে বড় কথা বাবাকে কি কৈফিয়ত দেব? ওঁকে তো কিছুতেই বলা চলবে না মুক্তিযুদ্ধের কথা। তাহলে উদ্বেগে, উত্তেজনায় ব্লাড প্রেসার বেড়ে স্ট্রোক হয়ে যাবে। তাছাড়া আমিই বা থাকব কি করে?

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। সারারাত জোরে জোরে মাইকে হামদ, নাত, দরুদ, মিলাদ, মওলানা সাহেবদের ওয়াজ-নসিহত এসব শোনা গেছে। এ বছর ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী অনেক বেশি শান-শওকত ধুম-ধড়াক্কার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। চার-পাঁচদিন আগে থেকে খবরের কাগজ, রেডিও-টিভিতে ঢোল-শোহরতের কি ঘটা! ইসলামকে পুরো গলা কেটে জবাই করে এখন তাকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা!

সকালে উঠে চোখ করকর করছিল, শরীরও ম্যাজম্যাজ। ভাবলাম গোসল করলে ঝরঝরে লাগবে। গোসল করে নাশতা খেয়েও স্বস্তি লাগছে না। শরীফ বলল, 'বিষ্টি নেই, চল লিলিবুদের বাড়ি যাই। ওখান থেকে নারিন্দা।'

কোথাও বেরোতে ইচ্ছে করে না, আবার ঘরে বসে থাকলেও ফাঁপর লাগে। তাই

জোর করেই বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক আছে, সব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেই বেড়াব আজ। লিলিবুদের বাসায় খানিক বসে লিলিবু ও একরাম ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নারিন্দায় গেলাম আতাভাইদের বাসায়। ওখান থেকে কাছেই নওয়াব স্ট্রিটে খোকাদের বাসায়। গিয়ে দেখি খোকার বোন আনা তার স্বামী পুত্র শাশুড়িসহ এ বাড়িতে। আনাদের বাড়িও কাছেই—ক্যাপ্টেন বাজারে। ওদের বাড়ির পেছনে বিহারিদের বস্তি। সামনে রেললাইন পেরিয়ে আওয়ামী লীগের অফিস। ২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের অফিস আগুনে পোড়ানো হয়। ২৭ তারিখ সকালে কারফিউ উঠলে আনারা ভাইয়ের বাসায় চলে আসে। খোকা ও আনার বড় বোন মীরা আমার চাচাত দেবর আনুর স্ত্রী। আনু ও মীরা এখন করাচিতে রয়েছে। ওদের জন্যেও খোকারা সবাই খুব উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে খোকার আম্মা। খানিকক্ষণ পরস্পরের জানা খবর বিনিময় করে আমরা উঠলাম। ফেরার পথে একরাম ভাই বললেন, 'মকু মিয়ার বাড়ি চল্ ক্যানে একবার? ভিখুর ছেলেমেয়েরা, মা, বোন সবাই ফিরেছে শুনলাম, দেখে আসি।'

আমি বললাম, 'ভিখুর ছেলে রুবেল ফেরে নি। ও নাকি আগে রাজশাহী দিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। ভিখুর দুই মেয়ে লীরা, ইয়েন মকু মিয়ার বাড়িতে আছে। বুলু, তার মাও আছে।'

মকু চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে বুলুর দেখা পেলাম না : ও আজ ভোরের প্লেনে পোলান্ডের পথে করাচি রওনা হয়ে গেছে। তবে আরো অনেক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হলো—তনজিম, তার বউ ডলি, বুলুর ছোট বোন গুলু অর্থাৎ মওদুদা। তনজিম, ডলি, গুলুর মুখেও খানসেনাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনলাম। এ ছাড়া অন্য কোন কথা নেই কারো মুখে। কানু ছাড়া গীত নেই।

বাসায় ফিরে ঘরে পা দিয়েই চমকে গেলাম। বসার ঘরে সোফায় বসে এক রোগাপাতলা লোক, চুলদাড়ি সব সাদা, গর্তে ঢোকা চোখ, কপালে গভীর ভাঁজ। চিনতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সালাম আলায়কুম, আমি রসুল। চিনতে পারেন নি, না?'

লজ্জিত হেসে বললাম, 'ওয়ালায়কুম সালাম। কি করে চিনব! এত রোগা হয়ে গেছেন! চুলদাড়ি সাদা হলো কি করে? বসুন।'

রসুল সাহেব আমার এক ছাত্রীর স্বামী। ছাত্রী মানে সেই ১৯৫২ সালে আমি যখন প্রথম সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে চাকরি করতে যাই, সেই বছরের ক্লাস টেনের ছাত্রী। মাত্র বছরখানেক পেয়েছিলাম তাকে, তাতেই পরবর্তী সময়ে যখনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমাদের 'বড় আপা' বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বিয়ের পরে স্বামীকে সঙ্গে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। রসুল সাহেব সরকারি চাকুরে। বদলির চাকরি। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান। যখনি ঢাকা আসনে, একবার আমাদের বাসায় আসবেনই। ধর্মভীরু পরহেজগার মানুষ। কালো চাপদাড়ি, মাথায় কালো জিন্না টুপি—এইভাবে তাঁকে দেখে আসছি গত পনের-ষোল বছর ধরে। সেই মানুষের একি চেহারা হয়েছে!

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'বয়েস হচ্ছে, একটু-আধটু পাক ধরেছিল আগেই, কিন্তু গত দেড় মাসে হঠাৎ সব সাদা হয়ে গেল ভয়ে, দুর্ভাবনায়, ছুটোছুটিতে।'

আমি বারেককে চা'র কথা বলে এসে বললাম, 'বলুন, তো কি ব্যাপার? এবার প্রায় চার বছর পর এলেন। কোথায় পোস্টেড ছিলেন? কিভাবে কাটালেন এই দেড় মাস?'

'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি হয়েছিলাম মাত্র ছ'মাস আগে। ভালোই ছিলাম। ক্র্যাকডাউনের

পরেও ওখানেই ছিলাম। প্রথম কিছুদিন এলাকাটা জয় বাংলার দখলেই ছিল। তারপর যখন প্লেন থেকে বোমা ফেলা শুরু হলো, তখন জানের ভয়ে সব ফেলে বউ-ছেলেমেয়ের হাত ধরে গ্রামের দিকে পালিয়েছিলাম। সে যে কি কষ্ট। কোন একটা গ্রামে থিতু হয়ে থাকতে পারি নি। আমার বাড়ি উত্তরবঙ্গে। এদিকের কোন গ্রামে কোন আত্মীয়স্বজন, চেনাজানা কেউ নেই। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এত ভালো ব্যবহার করেছিল যে কি বলব। খেতে দিয়েছে, শুতে দিয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে, পাকিস্তান আর্মি যেভাবে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছিল, তাতে ওরা নিজেরাই একগ্রাম ছেড়ে আরেক গ্রামে দৌড়াচ্ছিল, সেই সাথে আমরাও।'

শরীফ জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, কোন সময় বম্বিং করে, মনে আছে?

'মার্চের শেষে হবে। তারিখ ঠিক মনে নেই।'

শরীফ বলল, 'ওই সময় আমরা প্রায় প্রায়ই দেখতাম বম্বার প্লেনগুলো এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে। ঘরে বসে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু সন্দেহ করতাম—যেসব এলাকা তখনো জয়বাংলার দখলে রয়েছে, সেইসব এলাকায় বোমা ফেলতে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারবেন ওই অঞ্চলে কি রকম যুদ্ধ হয়েছিল?

রসুল মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমাদের বাড়িটা যে পাড়ায় ছিল, সেখানে বোমা পড়ে নি, তবে কাছেই বোমা পড়েছে, বিকট শব্দ, লোকজনের চিৎকার শুনেছি, আগুন দেখেছি। আর তখুনি একবস্ত্রে ছুটে পালিয়েছি পাশের এক গ্রামে। কিন্তু সেখানে একরাত থাকার পরই শুনলাম মিলিটারি আসছে। যাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম তারাসুদ্ধ পালালাম। দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখি—পুরো গ্রাম আগুনে পুড়ে ছাই। বহুলোক—যারা পালাতে পারে নি মরে পড়ে আছে। গরু, ছাগল মরে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সে যে কি বীভৎস দৃশ্য।'

রসুল সাহেব দম নেবার জন্য থামতেই আমি বলে উঠলাম, 'তারপর কি আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে এলেন?

'না, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর তার আশপাশে তখনো প্রায় রোজই বম্বিং হচ্ছিল। আমরা অন্যদিক দিয়ে অন্য এক গ্রামে চলে গেলাম। সেখানেও শান্তি নেই। মিলিটারির তাড়া।'

'আপনার ফ্যামিলি কোথায়?'

'অনেক কষ্টে সবসুদ্ধ ঢাকায় এসে পৌঁছেছি। ভূতের গলিতে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁর বাড়িতে উঠেছি। গ্রামে দৌড়ে পালাতে গিয়ে সালেহার পায়ের তলায় হাড়ের টুকরো ফুটেছিল। প্রথমে কেউ খেয়াল করি নি, একটু আধুটু ব্যথা করত। খেয়াল করব কি করে? সে সময়টুকু ছিল নাকি? একটু চুন-হলুদ দিয়ে বেঁধে রাখলেই ভালো হয়ে যেত, সেটাই বা কে করে! এখন ফুলে-পেকে যা-তা অবস্থা হয়েছে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'কি সর্বনাশ। ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। সালেহা বলল বড় আপার কাছে যাও। উনার সঙ্গে অনেক ডাক্তারের চেনাজানা আছে।'

'আমাদের পাড়াতেই ভালো সার্জন আছেন। মেইন রোড ধরে পুবদিকে খানিক গেলেই পলি ক্লিনিক, ওখানে ডাঃ আজিজ আমার চেনা, খুব ভালো সার্জন।'

তখুনি ফোনে আজিজের সাথে কথা বলে রসুলকে বললাম, 'আজিজ ক্লিনিকেই আছে। এক্ষুণি পেসেন্টকে নিয়ে যেতে বলল। আপনি সালেহাকে নিয়ে যান। আমি আধঘণ্টা পরে ক্লিনিকে যাচ্ছি। এখন যাবার সময় ডানদিকে তাকাতে তাকাতে যাবেন, পলি ক্লিনিকের সাইনবোর্ড চোখে পড়বে।'

আধঘণ্টা পরে পলি ক্লিনিকে গিয়ে দেখি রসুলরা তখনো এসে পৌছায় নি। ডাঃ আজিজের স্ত্রী সুলতানাও ডাক্তার। পাশাপাশি দুটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওরা এই ক্লিনিক করেছে। একটা বাড়ির নিচে এমার্জেন্সি, অপারেশন থিয়েটার, দোতলায় রুগীদের কেবিন। পাশের বাড়ির দোতলায় ওরা নিজেরা থাকে, নিচে রুগীর কেবিন।

সুলতানা-আজিজ দু'জনেই খুব হাসিখুশি, সবসময় চারপাশটা মাতিয়ে রাখতে পারে। ক্র্যাকডাইনের পর কয়েকটা দিন স্তম্ভিত, হতবাক হয়েছিল। মাঝখানে বেশ কয়েকদিন দেখা হয় নি। আজ দেখলাম, আগের মতই। বললাম, 'কি খুব যে হাসিখুশি মনে হচ্ছে।'

সুলতানা হিহি করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ বুবু, প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছি। আমরা ডাক্তার তো, গোলায় নিজের পা উড়ে গেলেও যদি হাত দুটো ঠিক থাকে, তাহলে ওই অবস্থাতেই আরেকজনের ট্রিটমেন্ট করতে হয়। আর এখন তো ক্যাজুয়ালটির সংখ্যা অনেক বেশি, গোপনে ট্রিটমেন্ট করার টেনসানও বেশি, তাই চাঙ্গা থাকার জন্যই হাসতে হয়।'

সুলতানা অবশ্য এমনিতেই হাসে বেশি। সেজন্য ওকে আমরা আদর করে পাগলি বলি। সে আমার হাত ধরে পাশের বাড়িটায় নিয়ে গেল। এটার দোতলায় ওরা থাকে। গেটটা এক পাশে। গেট বরাবর পোর্চ পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গ্যারেজ—পাশের ও পেছনের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে। সুলতানা নিজের হাতে গ্যারেজের দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল ভেতরে একটা গাড়ি। গাড়ির পাশ দিয়ে পেছনে নিয়ে গেল আমায়। দেখলাম মেঝের কাছাকাছি দেয়াল ভেঙে একহাত বাই দেড় হাত একটা ফোকর। বাড়ির দিকে গ্যারেজের যে দেয়াল, তাতে একহাত চওড়া একটা কাঠের দরজা। অর্থাৎ মেইন বাড়ির যে খিড়কি দরজাটা এ পাশে আছে, সেটা দিয়ে বেরিয়ে এই ছোট দরজাটা দিয়ে গ্যারেজে ঢুকে ওই ফোকর দিয়ে পালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। বাড়ির সামনে মেইন গেটের কাছে দাঁড়ানো লোকজন মোটেই টের পাবে না।

'বুঝলেন বুবু, এ গাড়িটা নষ্ট। কখনো বের করা হয় না।' তারপরই আবার মিহি হাসি—'আর বের করলেইতো বিপদ। ফোকরটা দেখা যাবে যে!'

আজিজ ধমক দিল, 'এত কথা বল কেন?' সুলতানা আগের মতই হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে আবার মেইন ক্লিনিকে চলল।

একটু পরেই সালেহাকে নিয়ে রসুল পৌছে গেল। আমাকে দেখে সালেহা কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'বড় আপা গো, আমাদের সব গেছে। ফকির হয়ে গেছি। মরে গেছি একেবারে।'

সুলতানা হৈ-হৈ করে উঠল, 'আরে আরে! কাঁদে কেন? কান্নার কি হয়েছে? হাসুন, হাসুন, হাসলে আদ্দেক অসুখ সেরে যাবে। আসুন আগে একজামিন করি। দেখি কত তাড়াতাড়ি সারানো যায় আপনাকে।'

সালেহাকে ভর্তি করতে হলো ক্লিনিকে। ওকে বেডে শুইয়ে ওর পাশে বসে রইলাম, রসুল আবার বাসায় গেল সালেহার কয়েকটা জিনিসপত্র আনতে। সালেহা আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বড় আপা, খানসেনারা কি মানুষ নয়? ওরা কি মুসলমান নয়? হিন্দু খুঁজে খুঁজে মেরেছে তো বটেই, কলমা জানা মুসলমানকে পর্যন্ত ওরা কাফের মনে করে মেরেছে। বড় আপা, বাড়িঘর, জিনিসপত্র, সব ফেলে পালিয়ে এসেছি। পা পচে গেছে। আমি আর বাঁচব না। বড় আপা, আমি মরে গেলে কে আমার বাচ্চাগুলোকে দেখবে?'

রুবেল, লীরা, ইয়েনের কথা মনে হয়ে আমার বুকে কান্না উথলে উঠল। বললাম, 'সালেহা আল্লার কাছে হাজার শুকুর কর তোমার পরিবারের সবাই বেঁচে আছে। তোমাদের কারো গায়ে আর্মির গুলি লাগে নি। তুমি খুব ভাগ্যবতী, তাই তোমার পায়ে হাড় বিঁধেছে, আর্মির গুলি বেঁধে নি। সামান্য একটু অপারেশন করে তোমার পা ভালো হয়ে যাবে দু'চারদিনে। জিনিসপত্র গেছে, তার জন্য এত শোক কেন? জিনিসপত্র, টাকাপয়সা আবার হবে। জান যদি চলে যেত। তাহলে আর কি জান ফিরে পেতে?'

ওকে ভিখু, মিলি ও তাদের তিনটি নাবালক বাচ্চার কথা বললাম। শুনে সালেহা আরেক দফা কাঁদল, তারপর বলল, 'না বড় আপা আমার আর কোন দুঃখ নেই।'

১০ মে
সোমবার ১৯৭১

বেশ কিছুদিন বাগানের দিকে নজর দেওয়া হয় নি। আজ সকালে নাশতা খাবার পর তাই বাগানে গেলাম। বাগানে বেশ ক'টা হাই-ব্রিড টি-রোজের গাছ আছে। এই ধরনের গোলাপ গাছের খুব বেশি যত্ন করতে হয়—যা গত দু'মাসে হয়নি। খুরপি হাতে কাজে লাগার আগে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাখনের মতো রঙের 'পিস' অর্থাৎ 'শান্তি'। কালচে—মেরুর 'বনি প্রিন্স' আর 'এনা হার্কনেস।' ফিকে ও গাঢ় বেগুনি রঙের 'সিমোন' আর 'ল্যাভেন্ডার।' হলুদ 'বুকানিয়ার', সাদা 'পাস্‌কালি।'

বনি প্রিন্স-এর আধফোটা কলিটি এখনো আমার বেড-সাইড টেবিলে কালিদানিতে রয়েছে। কলি অবশ্য আর নেই, ফুটে গেছে এবং প্রায় ঝরে পড়ার অবস্থা। 'পিস'-এর গাছটায় একটা কলি কেবল এসেছে—যদিও সারাদেশ থেকে 'পিস' উধাও।

বাগান করা একটা নেশা। এ নেশায় দুঃখ-কষ্ট খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যায়। গত কয়েক মাস ধরে নেশাটার কথা ভাববারই অবকাশ পাই নি। এখন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজেই বোধ করি নেশাটার কথা আমার মনে পড়েছে।

১১ মে
মঙ্গলবার ১৯৭১

দুপুরে ভাত খেতে বসেছি, হঠাৎ জোরে কলিংবেল বাজল। বাজল তো বাজল আর থামে না। কে রে কলিংবেলে আঙুল চেপে দাঁড়িয়ে আছে? আমি রেগে হাঁক দিলাম, 'এ্যাই বারেক, দেখ ত' কোন বেয়াদব এরকম বেল টিপে ধরে রেখেছে।'

বারেক দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকল রুমী! চমকে দেবার দুষ্টু চাপা হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত। আমি খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুমী তুই?'

রুমী কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে টেবিলে বসল, 'হ্যাঁ আম্মা, ফিরে আসতে হলো।'

বারেক ইতোমধ্যেই একটা প্লেট এনে রুমীর সামনে রেখেছে, তাকে বলতেও হয় নি। রুমী প্লেটে ভাত তুলতে তুলতে বারেকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বারেক রান্নাঘর থেকে দুটো শুকনো মরিচ পুড়িয়ে আনতো। দেখবি বেশি পুড়ে যায় না যেন। সাবধানে

অল্প আঁচে সেঁকবি আস্তে আস্তে। বুঝলি?'

বারেক চলে গেলে রুমী নিচু গলায় বলল, 'আমাদের যে রাস্তা দিয়ে যাবার কথা ছিল, সেখানে ঘাপলা হয়েছে। আমার কনট্যাক্ট্ অন্য রাস্তা জানে না। তাই ক'টা দিন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।'

রুমীর মুখে হাসি নেই, কিন্তু আমার হাসি আর ধ'রে না।

খাওয়ার পর সবাই বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুনলাম রুমীদের যেতে না পারার কাহিনী। মবু আর শিরাতের আসল নামও রুমী আজ বলতে আপত্তি করল না। মবু অর্থাৎ মনিরুল আলম, সংক্ষেপে মনু আর ইশরাক। ইশরাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ছাত্র, মনু এম.এ'র। দু'জনেই বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। মনু আবার গানও গায়।

মনু-ইশরাকের দলে রুমী ছাড়াও ছিলেন কামাল লোহানী, প্রতাপ হাজরা, বাফার কিছু হিন্দু কর্মচারী ও শিল্পী—তাঁদের পরিবার-পরিজন, আর একজন আহত হাবিলদার। রুমীরা সদরঘাট দিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে প্রায় সাত-আট মাইল পথ হেঁটে যায়। আহত হাবিলদারটিকে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিতে হয়েছিল। কিছুদূর এগিয়ে তাকে তার জানা এক গ্রামে পৌছে দেয়। বিকেলের দিকে ঝড়বৃষ্টি হয়, ফলে গ্রামের কাঁচা রাস্তা কাদায় প্যাচপেচে হয়ে যায়। এইভাবে অনেক কষ্টে ওরা ধলেশ্বরীর পাড়ে পৌছায়। ধলেশ্বরী পার হয়েই সৈয়দপুর। সেখান থেকে আট মাইল দূরে শ্রীনগর। শ্রীনগর থানা তখনো মুক্তাঞ্চল। সেখানে প্রতিদিন ঢাকা থেকে বহুলোকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ছুটে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। মনুরা স্পীডবোটে করে সৈয়দপুর থেকে শ্রীনগর পৌছায় সন্ধ্যারাতে। ওখান থেকে আধমাইল দূরে নাগরভাগ গ্রামে ডাঃ সুকুমার বর্ধনের বাড়ি। রুমীদের দল সে রাতটা ডাঃ বর্ধনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরদিন যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়। শ্রীনগর থেকেই নৌকা ভাড়া করে বর্ডারের উদ্দেশে রওনা দিতে হবে। কিন্তু নানা লোকের মুখে খবর পেতে থাকে যে, পাক আর্মি ধলেশ্বরী পার হয়ে সৈয়দপুর দিয়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবেশ করছে। তখন সবাই মিলে চিন্তাভাবনা করতে বসে কি করা যায়। নাগরভাগ থেকে সিকিমাইল দূরে আরেকটা গ্রাম—বাসাইল ভোগ—সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের বাড়ি। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় প্রেসক্লাবে পাক আর্মির শেলের ঘায়ে তিনি বাম উরুতে আঘাত পান। এখনো ভালো করে সেরে ওঠেন নি। কামাল লোহানীসহ কয়েকজন ফয়েজ আহমদের বাড়িতে যান পরামর্শের জন্য। নানারকম চিন্তাভাবনা-সলাপরামর্শের পর ঠিক হয়—পাক আর্মি পুরো অঞ্চল ঘেরাও করে ফেলার আগেই ওদের দলকে যে করেই হোক, ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সে অনুযায়ী ১০ তারিখ ভোররাতে ওরা ফয়েজ আহমদসহ তাঁর বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয় কুমিল্লার শ্রীরামপুরে পথে। ঐদিক দিয়ে বর্ডার ক্রস করতে হবে। কিন্তু পথে জানা গেল শ্রীরামপুরে ইতোমধ্যেই পাক আর্মি এসে গেছে। তখন ওরা দিক পরিবর্তন করে ঢাকার দিকে আসা সাব্যস্ত করে। এই আসাটা খুব বিপদসঙ্কুল ছিল। কারণ সৈয়দপুর তখন মিলিটারিকবলিত। সেদিন বিকেলে ঝড়বৃষ্টিও প্রচুর হয়েছিল। রুমীরা অনেক ঘুরপথে একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে, কখনো স্পীডবোটে, কখনো ভাঙা বাসে, কখনো কাদাভরা পথে পায়ে হেঁটে প্রাণ হাতে নিয়ে ঢাকা পৌছায় রাত ন'টার দিকে। রাতটা সবাই কামাল লোহানীর বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকে। আজ সকালে সবাই একসঙ্গে ও বাড়ি থেকে বেরোয় নি। দু'তিনজন করে খানিক পর পর বেরিয়েছে যাতে পাড়ার লোকে সন্দেহ করতে না পারে। তাও রুমী সোজা বাড়ি আসে নি। দুপুর পর্যন্ত ইশরাকের সঙ্গে থেকে তারপর এসেছে।

১২ মে
বুধবার ১৯৭১

জামীর স্কুল খুলেছে দিন দুই হলো। সরকার এখন স্কুল-কলেজ জোর করে খোলার ব্যবস্থা করছে। এক তারিখে প্রাইমারি স্কুল খোলার হুকুম হয়েছে, নয় তারিখে মাধ্যমিক স্কুল।

জামী স্কুলে যাচ্ছে না। যাবে না। শরীফ, আমি, রুমী, জামী—চারজনে বসে আলাপ-আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম স্কুল খুললেও স্কুলে যাওয়া হবে না। দেশে কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না, দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা। দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি জানোয়ারদের চলছে নির্মম নিষ্পেষণের স্টিমরোলার। এই অবস্থায় কোন ছাত্রের উচিত নয় বই-খাতা বগলে স্কুলে যাওয়া।

জামী অবশ্য বাড়িতে পড়াশোনা করছে। এবার ও দশম শ্রেণীর ছাত্র। রুমী যতদিন আছে, ওকে সাহায্য করবে। তারপর শরীফ আর আমি—যে যতটা পারি।

জামী তার দু'তিনজন বন্ধুর সাথে ঠিক করেছে—ওরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করে পড়াশোনা করবে। এটা বেশ ভালো ব্যবস্থা, পড়াও হবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় ওরা হাঁপিয়ে উঠবে না।

১৬ মে
রবিবার ১৯৭১

রোজ তিন-চারটে খবরের কাগজ না দেখলে আমার ভালো লাগে না। ওদের মিথ্যে বানোয়াট খবরের ভেতর থেকে আসল খবর বের করে আনতে আমার খুব মজা লাগে। যেমন গত পরশুর কাগজে দেখলাম : 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীকে ২০ মে'র মধ্যে এক নম্বর সেক্টরের উপসামরিক শাসনকর্তার সমীপে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছে।

তার মানে, কিছুদিন থেকে যে স্বাধীন বাংলা বেতারে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম. এ.জি, ওসমানীর নাম শোনা যাচ্ছে, তারই সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তানি কাগজে এই খবর!

'কাজে যোগদান সংক্রান্ত সামরিক আদেশের ব্যাখ্যা' এখনো কাগজে প্রকাশিত হয়ে চলছে! 'পূর্ব পাকিস্তানের' সর্বত্র অফিস-আদালতে, কলে-কারখানায় নাকি সব দলে দলে যোগ দিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সে সবের ছবিসহ খবরও অনেক ছাপা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। তাহলে এখনও কাজে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে এত আদেশ—আবার সে আদেশের ব্যাখ্যা এসব কেন? বোঝাই যাচ্ছে সিকিভাগ লোক ওরা মেরে ফেলেছে, সিকিভাগ বর্ডার পেরিয়ে গেছে, আরেক সিকি ভাগ গ্রামেগঞ্জে লুকিয়ে আছে, বাকি সিকিভাগ লোক নিয়ে অফিস-আদালত কল-কারখানা ভরাতে ওদের রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরো হ্রাস করা হয়েছে। এখন রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত।

ক'দিন আগে শরীফ খবর এনেছে টাইম নিউজউইক-এর কয়েকটা কপি নাকি কোন বিদেশী ব্রিফকেসে আত্মগোপন করে, এয়ারপোর্টে কাস্টমসের শকুনদৃষ্টি

এড়িয়ে ঢাকা এসেছে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক জান্তার বর্বরতা সম্বন্ধে অনেক খবর উঠেছে। শরীফ চেষ্টা করছে কপিগুলো যোগাড় করার। আমরাও সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি একনজর দেখার জন্য। খুব গোপনে, খুব সাবধানতার সঙ্গে কপিগুলো হাতে হাতে ঘুরছে। আমাদের হাতে আসতে কতদিন লাগবে, কে জানে!

১৭ মে
সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েও 'কর্তাদের' তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়! তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধ'রে ধ'রে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন টিচার, রেডিও-টিভির কোন কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গেছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন খানিকক্ষণ! এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ব বাংলার কোন প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

২২ মে
শনিবার ১৯৭১

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মেহমানের যা ভিড়। ভাগ্যিস দু'দিন আগে কাসেম ফিরে এসেছে। চারদিনের ছুটিতে, ছাব্বিশ দিন কাটিয়ে এসেছে। তবু তো এসেছে।

সকালে পাশের বাড়ির হেশামউদ্দিন খান সাহেবের বড় দুই মেয়ে খুকী ও খুকুমণি বেড়াতে এসেছিল। ওরাও গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের কারো কোনরকম ক্ষতি হয় নি। ওদের কপাল ভালো— মিলিটারির তাড়া খেয়ে দৌড়োতে হয় নি, সম্পূর্ণ অচেনা গ্রামের লোকেরা খুব যত্ন করেছে ওদের। গ্রামের লোকজনের মানসিকতা এই রকম : শহরের লোকজন গ্রামে তো আসে না বেশি, বিপদে প'ড়ে এসেছে, তাদের ঠিকমত খাতির-যত্ন করা উচিত। খুকী আরো বলল, 'কি বলব খালাম্মা অনেক গ্রামে বুড়ো মানুষরা পথের ধারে খানিক দূরে দূরে গুড় আর মটকাভর্তি পানি নিয়ে বসে থেকেছে। লোকজন হেঁটে যেতে যেতে যাতে মাঝে-মাঝে পানি খেয়ে নিতে পারে। অনেক বাড়িতে রাতদুপুরে মুরগি জবাই করে রেঁধে খাইয়েছে। মাচায় তোলা ভালো কাঁথা-বালিশ পেড়ে শুতে দিয়েছে।'

সত্যিই ওদের কপাল ভালো। সকলের বেলায় এরকম আতিথেয়তা জোটে না।

আতিথেয়তা জুটলেও মিলিটারির গুলি থেকে রেহাই মেলে না।

খুকুমণিরা থাকতে থাকতেই রেবা এল। ঘণ্টাখানেক গল্প করে তারপর গেল।

রেবা চলে যাবার পর গোসল করবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি রেণু আর চান্মু এসে হাজির। ওরা রইল আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত। শরীফ দুটোয় অফিস থেকে ফিরলে সবাই খেতে বসলাম। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর রেণু আমাদের সাথে খেতে বসল, কিন্তু চান্মুকে কিছুতেই বসাতে পারলাম না। সে শুধু দু'বার দু'কাপ চা খেল, ব্যস।

ওরা যেতে, সাড়ে তিনটেয় আবু আর নজু এল। গতকাল বিকেলে নিউ মার্কেটে আবুর সঙ্গে দেখা—সে রাজশাহী থেকে ঢাকা ট্যুরে এসেছে। তখনই তাকে বাসায় আসতে বলেছিলাম। উদ্দেশ্য : রাজশাহীর খবর জানা। কেননা এ মাসের প্রথমদিকে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের কাছে গিয়ে রাজশাহী সম্বন্ধে জানতে চেয়ে প্রায় কিছুই জানতে পারি নি। ওসমান গনি স্যার একদিন ফোন করে বললেন, 'ডঃ সাজ্জাদ হোসেন রাজশাহী থেকে ঢাকা এসেছেন।' ডঃ হোসেন বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প, তবু গনি স্যারকে বললাম, 'স্যার ওঁর ঠিকানাটা বলুন, আমি যাব ওঁর কাছে।' ওসমান গনি স্যার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যেতে চাচ্ছ, যাও। তবে বেশি খোঁচাখুঁচি কোরো না।'

বুঝলাম। তবে রাজশাহীতে আমাদের আত্মীয়বন্ধু অনেক রয়েছে, রাজশাহীর খবর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু ডঃ হোসেন গম্ভীর গলায় সংক্ষিপ্ত বাক্যে বললেন, রাজশাহীতে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কিছু লোকজন জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুললেও এখন সব শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ওসমান গনি স্যারের উপদেশ মনে করে ডঃ হোসেনকে বেশি প্রশ্ন করি নি।

এখন আবুকে পেয়ে ওকে মনের সুখে জেরা করতে শুরু করলাম।

'রাজশাহী তো প্রথমদিকে জয় বাংলার দখলে ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে মার্চের শেষ কয়দিন ই.বি.আর, ই.পি.আর ও পুলিশদের সঙ্গে পার্ক আর্মির খুব যুদ্ধ হয়। তাদের সঙ্গে যোগ হয় স্থানীয় অনেক লোকজন। তারপর পাক আর্মি ক্যান্টনমেন্টে ঘেরাও হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ক্যান্টনমেন্টের চারপাশ দিয়ে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ওদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে রাখে যে ওরা খাবার কেনার জন্যও বেরোতে পারত না। মুক্তিবাহিনীর প্ল্যান ছিল না-খাইয়ে পাক আর্মিকে ঘায়েল করা।'

'পাক আর্মি এমনি চুপচাপ বসে থাকত? গোলাগুলি ছুঁড়ত না?'

'হ্যাঁ ছুঁড়ত। কিন্তু তাতে মুক্তিবাহিনীর বিশেষ ক্ষতি হত না। তারপর ঢাকা থেকে প্লেন এসে মুক্তিবাহিনীর ওপর যখন বম্বিং শুরু করল, তখন একটু বেকায়দা হয়ে গেল।'

'কত তারিখে বম্বিং শুরু হয়?'

'তারিখ তো মনে নেই মামী। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে।'

'তোমাদের পাড়ায় বোমা পড়েছিল?'

'না, আমরা ছিলাম মালোপাড়ায়। সেটা শহরের মাঝখানে। প্রথমে ক্যান্টনমেন্টের দিকে বম্বিং হয়, সেটা শহর থেকে তিন মাইল দূরে। প্রথমদিন বম্বিংয়ের খবর পেয়েই আমরা শহর ছেড়ে ১২/১৪ মাইল দূরে একটা গ্রামে চলে যাই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। ওই গ্রামে তার বাড়ি।'

'গ্রামে কতদিন ছিলে?'

'তা প্রায় মাসখানেক। অনেকে নদী পেরিয়ে বর্ডার ক্রস করে যাচ্ছিল। কিন্তু মামী, আমার ছোট বাচ্চাটা তখন মাত্র দু'মাসের। ওকে নিয়ে নদী পার হওয়া যেত না। তাই বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে গেলাম। পরে শুনেছি, ক্যান্টমেন্টের চারপাশে মুক্তিবাহিনীর ওপর বম্বিং করে পাক আর্মি হেলিকপ্টারে করে সৈন্যদের জন্য খাবার নামিয়ে দেয়। আর দু'একদিন দেরি হলে সৈন্যগুলো না খেয়ে মারা যেত। তারপর শোনা গেল ঢাকা থেকে আর্মি আসছে রাজশাহী শহর দখল করতে। তখন আরো বহু লোক শহর ছেড়ে পালালো।'

'রাজশাহীতে আর্মি করে ঢোকে?'

'সঠিক বলতে পারব না—খুব সম্ভব ১২/১৩ তারিখে।'

'তোমরা রাজশাহী ফিরে কি দেখলে?'

'দেখলাম, সারা শহর লণ্ডভণ্ড। বহু জায়গা আগুনে পোড়া। শুনলাম, বহু লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'শহরে ফিরে এসে অফিসে যোগ দিলে?'

'আমার অফিস আর বাড়ি একই বিল্ডিংয়ে। একতলায় অফিস, দোতলায় বাসা। কি আর করব?'

'সে তো বটেই। তা অফিসে জয়েন করার পর তোমার ওপর কোন ঝামেলা করে নি?'

'না, আসলে গভর্নমেন্ট অফিস নয় বলেই বোধহয় কোন ঝামেলা হয় নি।'

আবু জীবন বীমা কোম্পানিতে চাকরি করে।

'ঢাকা এলে কিসে করে?'

'কোচে।'

'রাস্তায় কি দেখলে?'

'রাজশাহী থেকে ঢাকা পর্যন্ত পুরো রাস্তার দু'পাশে সমস্ত গ্রাম পোড়া। ঢাকা থেকে রাজশাহী যাবার সময় সৈন্যরা রাস্তার দু'পাশের সমস্ত গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে গেছে। লোকজন যারা পালাতে পারেনি, তারা গুলি খেয়ে মরেছে। গরু-ছাগল মরে প্রায় সাফ হয়ে গেছে।'

শরীফ বলল, 'রাজশাহী বর্ডারে মুক্তিযুদ্ধ কি রকম হচ্ছে, খবর-টবর পাও?'

'পাই মামা। শুধু রাজশাহী বর্ডারে নয় দেশের চারদিকেই বর্ডার ধরে যুদ্ধ হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'দেশের ভেতরেও কিন্তু গেরিলা তৎপরতা শুরু হয়েছে।'

শরীফ বলল, 'আমরা যারা বর্ডার ক্রস করে যুদ্ধে অংশ নিতে পারি নি, তাদের কিন্তু দেশে বসেও অনেক কিছু করার আছে। তুমি ছোট বাচ্চা নিয়ে নদী পেরিয়ে যেতে পার নি বলে আফসোস করছিলে। আফসোস করার কিছু নেই। তুমি রাজশাহীতে ঘরে বসেই যুদ্ধে অংশ নিতে পার।'

আবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল, বললাম, 'শহরে যেসব গেরিলা আসবে, তাদের বাড়িতে লুকিয়ে আশ্রয় দেবে, তাদের খাওয়াবে। একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর পৌছে দেবে। পারলে টাকা-পয়সা যোগাড় করে তাদের সাহায্য করবে।'

আবু খুব ধীর নম্রস্বরে বলল, 'আপনাদের কথা আমি মেনে চলব। যতটা সাধ্যে কুলায়।'

২৩ মে
রবিবার ১৯৭১

দেশের অন্যান্য জেলা থেকে ঢাকায় আসা লোকদের সঙ্গে যত বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে, তত বেশি বেশি খারাপ খবর শুনতে পাচ্ছি। মেয়েদের অপমান ও অত্যাচারের কথা, বিশেষ করে বাপ, ভাই, স্বামী বা ছেলের সামনে তাদের বেইজ্জতি করে মেরে ফেলার কথা প্রায়ই কানে আসত। এখন আরো বেশি করে তাদের অপহরণের কথা শোনা যাচ্ছে।

এখন আরো বেশি করে পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারি তাঁবেদাররা যখন-তখন লোকের বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা, সোনাদানা লুটেপুটে নিচ্ছে। দোকানপাটে ঢুকেও যেটা খুশি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কাজগুলো, লোকমা তুলে ভাত মুখে দেওয়ার চেয়েও সহজ। যে কোনো বাড়িতে ঢুকে রাইফেল উঁচিয়ে সবাইকে সার বেঁধে দাঁড় করালেই হলো। গুলি খরচ না করলেও চলে, মারারও দরকার হয় না। ভয়ের চোটেই টাকা-পয়সা, সোনাদানা সবাই বের করে দিয়ে দেয়। অনেক বাড়িতে গৃহস্থ নিজেই টাকা-পয়সা, সোনাদানা আগ বাড়িয়ে বের করে দেয়—এই নাও সব দিচ্ছি, জানে মেরো না। আজকাল ওরা নিজেও একটু কম জানে মারছে, টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢাকাতেও কোন কোন অঞ্চলে এগুলো নাকি হচ্ছে। যদিও আমাদের চেনাজানার মধ্যে কারো এখনো হয় নি।

আমার গহনাগাটি বেশি নেই কিন্তু যেটুকু আছে, সেটুকু গেলে আর তো কোনদিন করতে পারব না। মা'ও উদ্বিগ্ন, তাঁর গহনাপত্রগুলো রেখেছেন দুই ছেলের বউকে দেবার জন্য। ছেলেরা বিদেশে—কবে দেশে আসবে আর বিয়ে করবে, তার ঠিক নেই। তবু গহনাগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা তো করা দরকার।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম উঠোনে গর্ত করে পুঁতে রাখব। তবে শুনেছি—ওরা অনেক বাড়ির উঠোন খুঁড়ে দেখে। গ্রামে নাকি কাঁচাঘরের মেঝে পর্যন্ত খুঁড়ে দেখে। তাহলে?

রুমী বলল, 'জিনিসগুলো পুঁতে তার ওপর একটা লেবুগাছ লাগিয়ে দাও। তবে ছোট গাছ লাগালে ওরা সন্দেহ করতে পারে। বেশ একটা বড় গাছ আনতে হবে। দেখে যেন মনে হয় দু'তিন বছরের পুরনো গাছ।'

'বড় গাছ তুলে আনলে কি বাঁচবে?'

'চারপাশে অনেক বেশি মাটি নিয়ে খুঁড়ে তুলতে হবে যাতে শেকড় কাটা না যায়।'

তাই ঠিক হলো। শরীফের জানাশোনা এক নার্সারী থেকে বড় একটা লেবুগাছ আনানোর ব্যবস্থা করা হলো।

আমি বললাম, 'চল, মা'র বাসায় যাই। গহনা রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে, বলে আসি।'

মা'র বাসায় যেতেই দেখি উনি বাইরে যাবার জন্য রওনা হচ্ছেন। কি ব্যাপার? খবর এসেছে রাজশাহীতে তারার ভাইকে বিহারিরা মেরে ফেলেছে। তারা মায়ের মামাতো ভাইয়ের মেয়ে, আসাদ গেটের কাছে নিউ কলোনিতে থাকে। বললাম, 'চলুন আপনাকে তারার বাসায় নামিয়ে দিই। আমরাও একটু দেখা করে আসি ওদের সঙ্গে।'

নিউ কলোনিতে আমরা একটুক্ষণ বসে রইলাম। মা এখন খানিক্ষণ ও বাড়িতে থাকবেন। ওখান থেকে গেলাম রাজারবাগ এলাকায় আউটার সার্কুলার রোডে মান্নান

ও নূরজাহানের বাড়ি। ইঞ্জিনিয়ার মান্নান, শরীফের বন্ধু ও সহকর্মী। ক্র্যাকডাউনের আগে মান্নানের চাচাতো ভাইয়ের বিয়েতে চাটগাঁ গিয়ে ওরা ছেলেমেয়ে সুদ্ধ সবাই আটকা পড়েছিল। সপ্তাহখানেক হলো ঢাকা ফিরেছে। ওদের বাসায় গিয়ে নূরজাহান আর মান্নানের মুখে শুনলাম ওদের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু লোমহর্ষক কাহিনী।

চাটগাঁর ও. আর. নিজাম রোডে ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিস ও রেস্ট হাউস। মান্নানরা সপরিবারে ওখানেই ছিলেন। ২৬ মার্চ সকালে বাইরোডে গাড়িতে ওদের ঢাকার পথে রওয়ানা হবার কথা। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে মান্নানের বন্ধু আরেক ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব ফোনে ঢাকায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ঢাকার গোলমালের কথা জানতে পারেন। পরে আরো এঁর-ওঁর কাছে থেকে খবর পেয়ে ওরা ক্রাকডাউনের ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। ফলে ওরা চাটগাঁতেই থেকে যেতে বাধ্য হলেন। ২৬ ও ২৭ মার্চ অবশ্য মান্নানরা চাটগাঁতে রাস্তায় বেরোতে পেরেছিলেন, যদিও ২৬ মার্চ রাতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছোঁড়া ট্রেসার হাউইয়ের আলো দেখতে পেয়েছিলেন এবং গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। ক্যান্টনমেন্টটা ওদের রেস্ট হাউস থেকে বেশিদূরে ছিল না। ২৮ তারিখ সকালে বাধল বিপত্তি। রেস্ট হাউসের পেছনে প্রবর্তক সংঘের পাহাড়, সামনে পুলিশ লাইনের পাহাড়। ওই দিন সকালে হঠাৎ প্রবর্তক সংঘের পাহাড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা পজিশন নিয়ে পুলিশ লাইনের দিকে গুলিগোলা ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশরাও ওদের দিকে গুলিগোলা ছুঁড়তে থাকে। নূরজাহান বলল, 'সে যে কি অবস্থা আপা। রেস্ট হাউসের মাথার ওপর দিয়ে সমানে গুলিগোলা ছুটে যাচ্ছে। ভাবলাম, আর রক্ষে নেই। এইবার শেষ। ছুটে সবাই দোতলা থেকে নেমে নীচের অফিস ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। মাঝে-মাঝে উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। বেলা দুটো পর্যন্ত এই রকম চলল। দুটোর পর মাথার ওপর দিয়ে গুলি করছে। তখন মনে হল, আমাদের বাড়িতে নিশ্চয় আসবে, আর গুলি ছোটা বন্ধ হল। তারপর শব্দ শুনে মনে হলো খানসেনারা পাহাড় থেকে নেমে বাড়ি বাড়ি ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে সব গুলি করে মারবে। শেষ পর্যন্ত কপাল ভাল, ওরা আর আসেনি। তিনটের দিকে সব শান্ত হতে আমরা ঠিক করলাম, এখানে আর নয়। যে করেই হোক, নন্দনকাননে বাঁকা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়া রিস্কি, তাই ঠিক করলাম ডানদিকে এলিট পেইন্টের মালিকের বাড়ি পাশ দিয়ে যে গলি রাস্তা আছে, ওই দিক দিয়ে লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেতে হবে। খানিক দূরে যেতেই একটা বাড়িতে দেখি এক দম্পতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে দেখে গলিতে নেমে এলেন। আমরা এদিক দিয়ে নন্দকানন যাবার চেষ্টা করছি শুনে বললেন, পাগল হয়েছেন! নন্দনকানন পর্যন্ত পৌছতেই পারবেন না। পাকসেনারা সব জায়গায় টহল দিচ্ছে। একবার দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। তার চেয়ে আমাদের বাসায় থাকুন। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দম্পতির এই রকম আন্তরিক ব্যবহারে খুব মুগ্ধ হলাম। পরে জেনেছিলাম ভদ্রলোকের নাম আবদুল হাই। আমাদের জোবেদা খানম আপার ভাই।

'ওঁদের বাসায় ৪/৫ দিন ছিলাম। তারপর ৩০ তারিখ দুপুরের পর বম্বিং হলো— আমরাও বাসার জানালা দিয়ে দূরের আকাশে পরিষ্কার প্লেনগুলো দেখতে পেলাম। ওঁদের বাসায় ৪/৫ দিন থাকার পর আবার আমরা রেস্ট হাউসেই ফিরে গেলাম?'

'স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পেয়েছিলে? প্রথম কবে শুনেছিলে?'

'২৬ তারিখ রাতেই। জামান সাহেবের রেডিও ছিল, উনি ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ পেয়ে যান। তারপর রোজই শুনতাম। আমাদের ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর তো কোন

কাজ ছিল না, তাই রেডিওটাই শোনা হত বেশি। আকাশবাণী, বিবিসি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া, স্বাধীন বাংলা বেতার—সবই শুনতাম। তবে ৩০ তারিখে বম্বিংয়ের পর তিন-চারদিন স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পাই নি। তারপর যখন চাটগাঁ-ঢাকা প্লেন সার্ভিস শুরু হলো, তখন প্লেনে সিট পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দু'সপ্তাহ পরে সিট পেয়ে এইতো গেল সপ্তাহে ঢাকা এসেছি। এই দু'সপ্তাহ কি করলাম জানেন? সকালে কারফিউ উঠলে নাশতা খেয়েই ছেলেমেয়ে, বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে এয়ারপোর্ট যেতাম, ফিরতাম বিকেলে কারফিউ শুরু হবার আগ দিয়ে।'

'বল কি? দুপুরের খাওয়া-দাওয়া?'

'প্রথমদিনের পর থেকে স্যান্ডউইচ, ফ্লাস্কে চা, পানি এসব নিয়ে যেতাম।'

'কেন সারাদিন বসে থাকতে হত কেন?'

'প্লেনে মিলিটারির লোকজন আগে সিট পেত। অল্প ক'টা সিট সিভিলিয়ানদের দেয়া হত। এয়ারপোর্টে গিয়ে লাইন করে দাঁড়াতে হত। কবে ক'টা সিট সিভিলিয়ানদের দেবে, তার কোন স্থিরতা ছিল না। আর লাইন ছিল লম্বা।'

পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বসে অপেক্ষা করার সময় একটা সাংঘাতিক দৃশ্য নূরজাহান এবং নিশ্চয় বাকি সবারও চোখে পড়ত। সবাই সেটা না দেখারই ভান করত। এখন বলতে নূরজাহান শিউরে উঠল, 'একদিন হঠাৎ দেখি কি বেশ দূরে একটা দোতলা বিল্ডিংয়ের সামনে ট্রাক থেকে লোক নেমে লাইন করে ভেতরে ঢুকছে। ট্রাকের সামনে মেশিনগান হাতে মিলিটারি দাঁড়িয়ে। দোতলার জানালা খোলা ছিল। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম ঘরের ভেতরে খানসেনারা চাবুক দিয়ে লোকগুলোকে মারছে।'

'বল কি! চিৎকার শুনতে পেতে?'

'না, বিল্ডিংগুলো বেশি দূরে ছিল। তবে মাঝখানটা ফাঁকা মাঠ বলে দেখা যেত। ঘরের মধ্যে জানালাগুলো ওরা বন্ধ করে নেওয়াও দরকার মনে করত না। দিনের বেলা রোদের আলোতে এত দূর থেকেও ঘরের ভেতরের সব দেখা যেত। দূর বলে চিৎকার শুনতে পাইনি, তবে চাবুকের ওঠানামা বুঝতে পারতাম।'

'রোজ রোজ ট্রাকে করে লোক নিয়ে আসত?'

'যে কয়দিন এয়ারপোর্টে বসে থেকেছি, প্রায় রোজই দেখেছি। যা ভয় লাগত আপা, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত ভয়ে। কিন্তু কি করব, না দেখার ভান করে বসে থাকতাম। আবার ওদিকে না তাকিয়েও পারতাম না।'

২৫ মে
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। বেশ শান-শওকতের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ঢাকায়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান করছে।

সন্ধ্যায় পর টিভির সামনে বসেছিলাম, জামী সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'মা শিগগির এস। নতুন প্রোগ্রাম।'

দৌড়ে ওপরে গেলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারে বাংলা সংবাদ পাঠ করছে নতুন এক কণ্ঠস্বর। খানিক শোনার পর চেনা চেনা ঠেকল কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। সালেহ আহমদ নামটা আগে কখনো শুনি নি। রুমী বলল, 'নিশ্চয় ছদ্মনাম।'

বললাম, 'হতে পারে। তবে ঢাকারই লোক এ। এই ঢাকাতেই এই গলা শুনেছি। হয় নাটক, নয় আবৃত্তি।'

এইসব গবেষণা করতে করতে বাংলা সংবাদ পাঠ শেষ।

আজকের প্রোগ্রামেও বেশ নতুনত্ব। কণ্ঠস্বরও সবই নতুন শুনছি। একজন একটা কথিকা পড়লেন—চরমপত্র। বেশ মজা লাগল শুনতে, শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ শেষের দিকে এক্কেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষাতে দুটো লাইন বলে শেষ করলেন।

অদ্ভুত তো। কিন্তু এখানে আলটিমেটামের মতো কিছু তো বোঝা গেল না।

শরীফ বলল, 'ঐ যে বলল না একবার যখন এ দেশের কাদায় পা ডুবিয়েছ, আর রক্ষে নেই। গাজুরিয়া মাইরের চোটে মরে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে, এটাই আলটিমেটাম।'

'কি জানি।'

জামী জানতে চাইল 'গাজুরিয়া মাইর কি জিনিস?'

রুমী বলল, 'জানি না। আমার ঢাকাইয়া বন্ধু কাউকে জিগ্যেস করে নেব।'

ঐ যে মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতার কথা বলল—ঢাকার ছ'জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে, আমরা তো সাত আটদিন আগে এ রকম বোমা ফাটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করি নি। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি! সত্যি সত্যি তাহলে ঢাকার আনাচে-কানাচে মুক্তিফৌজের গেরিলারা প্রতিঘাতের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেছে? এতদিন জানছিলাম বর্ডা-ঘেঁষা অঞ্চলগুলোতেই গেরিলা তৎপরতা। এখন তাহলে খোদা ঢাকাতেও?

মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারি যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ঐ অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

১২ মে
বুধবার ১৯৭১

আজ লেবুগাছ আনতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শরীফ দুপুরে অফিস থেকে ফিরে জানাল বিকেলে মিনিভাইদের বাসায় যেতে হবে। রেবার খালাতো বোনের স্বামীকে গোপালপুরে মেরে ফেলেছে—খবর এসেছে। ওদের খুব মন খারাপ।

সাড়ে চারটেয় গুলশান গেলাম। রেবার খালাতো বোন শামসুন্নাহারের স্বামী আনোয়ারুল আজিম রাজশাহী জেলার গোপালপুর সুগার মিলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল। তাকে এবং সেই সঙ্গে মিলের আরো অনেক বাঙালি অফিসার ও শ্রমিককে পাক আর্মির লোকেরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। আজিমের বউ-বাচ্চার কি হয়েছে, কেউ জানে না। রেবা—মিনিভাইয়ের দ্বিগুণ মন খারাপ আরো একটি কারণে। শামসুন্নাহারের ছোট ভাই সালাহউদ্দিনও বোনের কাছে ছিল। সেসুদ্ধ পুরো পরিবারের কোনো খোঁজখবর নেই।

আমরাও মন খারাপ করে চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় উঠে বাড়ি ফিরে এলাম।

বাসায় ঢুকে দেখি একরাম ভাই, লিলিবু এসেছে। বাবার সঙ্গে আলাপ করছেন। একরাম ভাই বরিশালের এ.ডি.সি হয়ে বদলি হয়েছেন।

এইরকম সময় ঢাকা থেকে সুদূর বরিশালে বদলি হওয়াতে একরাম ভাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। একি দুর্দৈব! কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। ক্র্যাকডাউনের পরে কঠিন মার্শাল ল' শাসন। এ সময় বদলি ক্যানসেলের কোনো রকম তদবিরেরই অবকাশ নেই। তবে একটা সান্ত্বনা—বদলিটা প্রমোশনের।

একরাম ভাই প্রথমে একাই যেতে চান। কিন্তু লিলিবু গো ধরে বসেছেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। আমরা লিলিবুকে বোঝালাম—এই রকম দুর্দিনে তাঁর প্রথমে না যাওয়াই ভালো। একরাম ভাই দু'একটা ছেলে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে যান, পরে অবস্থা বুঝে লিলিবু যাবেন। এখানেও তো ছেলেমেয়েরা সবাই রয়েছে—বাবা-মা দুজনেই একসঙ্গে গেলে ওরাও তো মুষড়ে পড়বে। তাছাড়া এখানে অনেক কাজও রয়েছে। একরাম ভাই বদলি হলেন, ঢাকার সরকারি বাসা রাখতে পারবেন না, বাসা খোঁজা, সেখানে পুরো সংসার উঠিয়ে নিয়ে গোছানো—লিলিবুর এখানে এখন থাকাটা খুবই জরুরী।

২৮ মে
শুক্রবার ১৯৭১

আজ উঠোনে বিরাট ও গভীর গর্ত করে লেবুগাছ লাগানো হলো। গতকাল বিকেলে অফিসের একটা পিক-আপ নিয়ে অনেক হুজ্জত করে গাছটা আনা হয়েছে। আনতে আনতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছিল বলে গতকাল আর পোঁতা হয় নি, গ্যারেজের পাশে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এমনই যত্ন করে বিরাট পরিধি নিয়ে মাটি কেটে তোলা হয়েছিল এবং আজকে এমনই নিখুঁত, অনড় অবস্থায় গাছটা লাগানো গেছে যে আশা হচ্ছে, গাছটার একটা পাতাও মরবে না।

অবশেষে শরীফ নিউজউইক, টাইম ম্যাগাজিনের সেই দুর্লভ সংখ্যাগুলোর টাইপ করা কপি বাড়ি আনতে পেরেছে। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তিনটে কপি—দুটো নিউজউইকের ৫ এপ্রিল আর ১২ এপ্রিল সংখ্যা। টাইম ম্যাগাজিনের ৩ মে সংখ্যা। পাতলা টাইপ-কাগজে টাইপ করা ম্যাগাজিনে নিশ্চয় ছবিটবি ছিল, টাইপ কাগজে তার স্বাদ পাওয়া গেল না। তবু যে পড়তে পারছি, এটাই বা কম কি?

পাঁচ এপ্রিলের নিউজউইকের প্রবন্ধটার শিরোনাম হলো—পাকিস্তান প্লাঞ্জেস ইন টু সিভিল ওয়ার—পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে রয়েছে নিউজউইকের সাংবাদিক লোরেন জেংকিন্‌সের রিপোর্ট। পড়ে অবাক হলাম, হোটেল ইন্টারকনে গৃহবন্দী থাকা অবস্থাতেও লোরেন জেংকিন্‌স ঢাকার আর্মি ক্র্যাকডাউনের পুরো ঘটনা কি করে জেনে সেগুলো হুবহু তার কাগজে তুলে দিয়েছে সারা বিশ্বকে জানাবার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনা জানার পর তো আর কোনো দেশের বলা উচিত নয় যে পূর্ব বাংলা যা ঘটেছে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার; কিংবা পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহী দলকে সামরিক সরকার যোগ্য শাস্তি দিয়েছে?

বারো এপ্রিলের সংখ্যায় লোরেন জেংকিন্‌স আরো চমৎকার করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। শিরোনাম দিয়েছে—দি অ্যাওয়েক্‌নিং অব এ পিপল—একটি জাতির জাগরণ। টাইম ম্যাগাজিনের কপিটা আরো পরের, ৩ মে তারিখের। টাইমের সংবাদদাতা ড্যান কোগিন তার প্রবন্ধের নাম দিয়েছে, ঢাকা, সিটি অব দ্য ডেড—লাশের শহর ঢাকা।

সবাই মিলে ভাগাভাগি করে এইগুলো পড়তেই আজ সারা দিন কাবার!

জুন

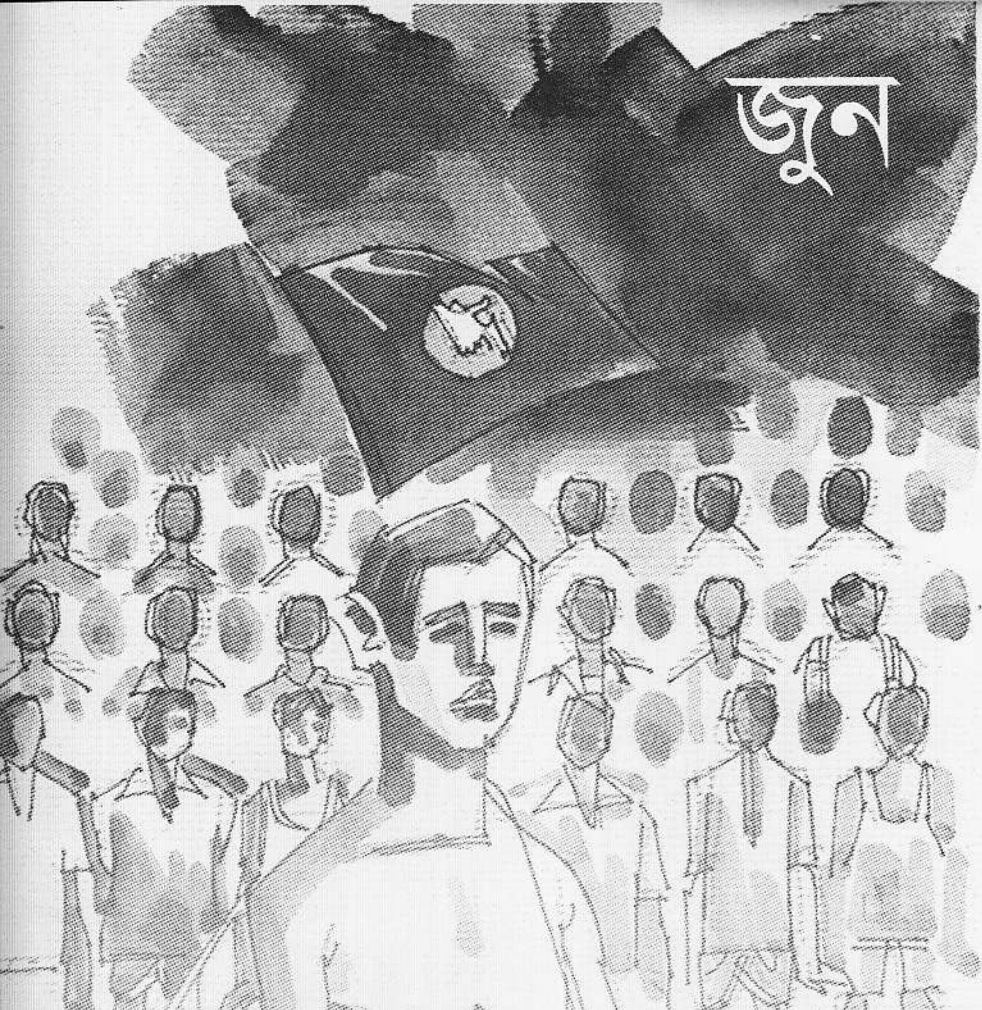

দু'জন বন্ধুর সঙ্গে টাট্টু দাউদকান্দিতে নদী পেরিয়ে পর্যায়ক্রমে বাসে, রিকশায় ও পায়ে হেঁটে বর্ডার ক্রস করে। ওপারে নগরদা বলে একটা জায়গায় যে ক্যাম্পটা ছিল, সেখানে ওরা ওঠে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের এক অধ্যাপক ওখানে এই ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করেছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন ছেলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। অধ্যাপক তাদেরকে রিক্রুট করে বাছাই করে, কোম্পানি গঠন করে তার পর প্লাটুনে ভাগ করে দিচ্ছেন। একজন ল্যান্স নায়েক ছেলেদেরকে ট্রেনিং দেন।

২ জুন
বুধবার ১৯৭১

সকালে একরাম ভাইয়ের ট্রাংকল পেলাম। ভালোমত বরিশালে পৌঁছেছেন।

গতকাল বিকেলের রকেট পি,আর, এস-য়ে বরিশাল রওনা হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল বড় ছেলে আবু আর ভাস্তে আঞ্জু।

এখন ট্রাংকল পেয়ে খবরটা লিলিবু'কে দেবার জন্য বেরোলাম। ওখানে খানিকক্ষণ বসে মা'র বাসা গেলাম।

গতকাল থেকে সর্দি লেগেছে, সেই সঙ্গে অল্প জ্বরজ্বর ভাব। আজ বিছানায় শুয়ে থাকলে ভালো হত। কিন্তু একবার বেরিয়ে যখন পড়েছিই, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না। মা'র সঙ্গে আমার এক খালার বাড়ি বেড়াতে গেলাম। সেখান থেকে মাকে আবার ৬ নংয়ে পৌঁছিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা।

সর্দি সারানোর দেশী টোটকা কাঁচাপেয়াজ কুচি, শুকনো মরিচ পোড়া আর খাঁটি সর্ষের তেল গরম ভাতে মেখে খেলাম।

এত হাঙ্গামা করে এতবড় লেবু গাছটা এনে এত কষ্ট করে পুঁতলাম, কিন্তু কোনো কাজ দিল না। আর দেখছি, এর পাতাগুলো মরতে শুরু করেছে। রুমী বলল, 'যে কেউ দেখে বুঝে ফেলবে এর তলায় কিছু লুকোনো আছে। গাছটা তুলে ফেলে দিতে হবে।'

এতবড় গাছ তুলে ফেলা কি চাট্টিখানি কথা? ডালগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে, কাণ্ডটাও টুকরো করে কেটে গোড়াটা তুলে ফেলা হল। তারপর গাড়ির বুটিতে নিয়ে দূরের একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসা হল। খুব কষ্ট লাগল গাছটা এভাবে কসাইয়ের মতো টুকরো করে কাটতে। ছোটবেলা থেকে জেনে আসছি—ফলের গাছ নষ্ট করতে নেই। কিন্তু কি করব, জান বাঁচানোর তাগিদে গাছ কেটে ফেলে দিতে হল।

এখন আবার নতুন করে চিন্তা করো—আর কোথায় কিভাবে গহনা লুকিয়ে রাখা যায়।

আজ সর্দিটা খুব বেড়ে গেছে। জ্বরটাও যেন। সর্দি সারার একমাত্র ওষুধ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম। দুটো নোভালজিন গিলে শুয়ে রইলাম। একটু পরেই রেবার ফোন : টাট্টু আমাদের বাসায় এসেছে কি না?

কি ব্যাপার?

টাট্টুকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব উদ্বেগেও রেবার গলা সহজে কাঁপে না। রাগ হলেও সে চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না। খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের মেয়ে। কিন্তু আজ ফোনে তার গলায় কাঁপন বুঝতে পারলাম।

দুপুরে আরো দুটো নোভালজিন খেয়ে জ্বরটা দাবালাম। বিকেল হতে না হতেই রুমী, জামী, শরীফসহ গুলশানের দিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি রেবা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে, চারপাশে তার আত্মীয়-স্বজন বিষণ্ন বদনে বসে আছে। মিনিভাই, রেবা ও জাহিরের মুখে টুকরো টুকরো করে পুরো ঘটনাটা শুনলাম : সকালে টাট্টু দেরি করে ঘুমোয়। নাশতা হলে ডেকে তুলতে হয়। আজো ডাকাডাকি হচ্ছিল, কিন্তু আজ আর তার সাড়া পাওয়া যায় না। শেষে রেবা ঘরে ঢুকে দেখে মশারি ফেলাই আছে কিন্তু টাট্টু ভেতরে নেই। প্রথম দিকে হৈ চৈ না করে টাট্টুর বড় ভাই জাহির খুব

সন্তর্পণে টাট্টুর বন্ধুদের কাছে খবর নেয়। না, টাট্টু তাদের কারো কাছে যায় নি। তবে টাট্টুর দুই বন্ধুকেও তাদের নিজ নিজ বাড়িতে পাওয়া যায় নি। জাহির একটু আধটু আঁচ পেত—টাট্টু কিছু একটার সঙ্গে জড়িত আছে। কিন্তু টাট্টু কোনোদিন খোলাখুলি বড় ভাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো আলোচনা করে নি। তবে সবাই ধারণা করছে টাট্টু লুকিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আবার ভয়ও হচ্ছে, পথে কোথাও খানসেনাদের হাতে ধরা পড়ল কিনা? ধরা পড়লেওতো জানবার কোন উপায় নেই।

রেবাকে এই প্রথম আকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম। মিনিভাই-ও খুব বিচলিত, তবে বাড়ির কর্তা বলেই বোধহয় শান্তভাবটা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, ভেতরটা তাঁর ভেঙে যাচ্ছে।

সন্ধ্যের মুখে বাসায় ফিরে এলাম। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। টাট্টু একলাইনের একটা চিঠি রেখে গেলেও তো পারত।

আজ স্বাধীন বাংলা বেতারেও তেমন মন লাগাতে পারলাম না। সেই কে যেন, আজও 'চরমপত্র' পড়লেন। রোজই পড়েন। কে পড়ছেন, নাম শোনার জন্য প্রথম ক'দিন কান খাড়া করেছিলাম। কিন্তু না, কোনো নাম বলা হয় নি।

ঘুরে ফিরে খালি টাট্টুর কথাই মন এলোমেলো করছে। জামীর মুখ চুন। টাট্টু তাকেও কিছু বলে নি। বন্ধুর এই 'বিশ্বাসঘাতকতায়' জামী খুবই মর্মাহত। আমি হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, 'চল, নিচে যাই, মুড়ির মোয়া বানাব।' একটা কিছু কাজ করা দরকার।

৩ জুন
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ বিছানায় সটান। বেশ জ্বর। গত তিনদিন ধ'রে আদার রস দিয়ে বারবার চা খাওয়ার ফলে সর্দি বসে গিয়ে কষ্ট আরো বেড়েছে। বুকে ব্যথা, নিশ্বাস নিতে হাঁপ ধরে।

লুলু বিকেলে এসে বলল, 'মামী, পাঁচশো আর একশো টাকার নোট নাকি অচল করে দেবে?'

'কে বলল? কোথায় শুনলি?'

'সবাই তো বলাবলি করছে।'

'গুজব। কোন রিলায়েব্‌ল্ সোর্স আছে কি না, খোঁজ নে।'

নোট অচল হলে তো মুশকিল। ঘরে দু'তিন হাজার টাকা রাখা আছে। বেশির ভাগই পাঁচশো আর একশো টাকার নোট।

রাতে শরীফ ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরলে ওকে নোট অচলের গুজবটা বললাম। ও বলল, 'ঢাকা ক্লাবেও অনেকে এ কথা নিয়েই আলোচনা করেছে।' আমি বললাম, 'কালই আমাদের ঘরের টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিও।'

'আরে অত ব্যস্ত হবার কি আছে? কথাটা গুজবও তো হতে পারে।'

'তা হোক, আমাদের টাকা পয়সা বেশি নেই। কালকে জমা দিয়ে দাও তো—তারপর না হয় আবার তুলে রাখা যাবে।'

শরীফ একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল কাপড় বদলাতে। অর্থাৎ কথাটা তার মনঃপূত হয় নি।

৫ জুন
শনিবার ১৯৭১

আজও শরীর খুব খারাপ। তবে গত দু'দিন যেমন উঠতেই পারি নি, সেরকম নয়। জ্বর বন্ধ হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি। আজ একটু-আধটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছি।

সকালে খবরের কাগজ দেখিয়ে শরীফ বলল, 'শুধু শুধু খাটালে। এই দেখ।'

দেখলাম কাগজে হেডলাইন : কোন কারেন্সি নোট অচল নয়। গুজব ভিত্তিহীন।

খবরে বলা হয়েছে : পাকিস্তান সরকারের সকল কারেন্সি নোট চালু থাকবে। জনসাধারণের কাছে আইনসম্মত মুদ্রা হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত থাকবে। কোন কোন কারেন্সি নোট অচল করা হয়েছে বলে যে গুজব ছড়িয়েছে, এবং কোন কোন খবরের কাগজে যে লেখা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন এবং তার পেছনে কোনো সত্যতা নেই।

চুপ করে রইলাম। গতকাল আমার জেদে শরীফকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা জমা দিতে হয়েছে। কেবল আমারই নয়, মায়েরও। শুক্রবার এগারোটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং—ন'টাতেই রুমীকে মা'র বাড়ি পাঠিয়ে মা'র একশো টাকার পাঁচটা নোট আনিয়ে আমাদের পুরো তিন হাজার টাকা শরীফের হাতে তুলে দিয়েছি জমা দেবার জন্য। দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়াতে শরীফের অফিসের পাশেই ব্যাঙ্ক। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফোন করে জেনেছি—শরীফ টাকা জমা দিয়েছে কিনা!

কাসেম এসে বলল, 'আম্মা, আর অ্যাক ব্যালার মতন চাউল আছে। চাউল কিনন লাগব।' রেশনের চালে আমাদের সপ্তাহ যায় না। খোলাবাজার থেকেও কিনতে হয়।

ধমক দিয়ে বললাম, 'দু'তিনদিন আগে থেকে বলতে পারিস না? তোদের সব সময় বলি না সব জিনিস ফুরোবার দু'তিনদিন আগে থেকে বলবি? তা যদি মনে থাকে। মাত্র তিনদিন বিছানায় পড়ে আছি—'

শরীফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'চাল কেনার জন্য—'

শরীফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এখন তো সাভার যাচ্ছি বাঁকার সঙ্গে, ফিরতে ফিরতে একটা বেজে যাবে। কালকে টাকা তুলব।' বেশ খুশি মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি কাসেমকে ধমক দিয়ে বললাম, 'যা, বেরো সামনে থেকে, হতচ্ছাড়া। চালে না কুলোয়, রুটি বানাবি।'

শরীফের ফিরতে ফিরতে তিনটে হল। উদ্বিগ্ন হয়ে দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। এত দেরি হওয়া তো উচিত নয়। কি জানি কিছু হলো নাকি?

না, ঐ যে গাড়ি এসে থেমেছে গেটে। শরীফ হাঁকডাক করে ডাকল কাসেম-বারেককে। ওপর থেকে দেখলাম, ড্রাইভার ও কাসেম ধরাধরি করে একটা চালের বস্তা নামাচ্ছে! বারেক নামাচ্ছে দু'জোড়া মোরগ!

৮ জুন
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজকের কাগজে দুই ইঞ্চি মোটা আট কলামজুড়ে হেডিং ছাপা হয়েছে :

পাঁচশো ও একশো টাকা নোট অচল ঘোষণা।

গত রাতেই টিভি'তে অবশ্য এই চাঞ্চল্যকর ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেছে। স্তম্ভিত যা

হবার, লোকে গতকাল রাতেই হয়েছে। সে সময়টা আমি খুব পরিতৃপ্ত মুখ নিয়ে চুপ করেছিলাম। শরীফও চুপ করে ছিল, তবে ভ্রূ কুঁচকানো অবস্থায়। অবশ্য আমার এ পরিতৃপ্তি বেশিক্ষণ বজায় থাকে নি, রুমী একটা কথায় বেলুন ফুটো করে দিল, 'আম্মা, আমার প্যান্টের মুড়িতে পাঁচটা একশো টাকার নোট সেলাই করা আছে!'

বিকেলে নজলু আর কলিম এসেছে। নোট অচল ঘোষণা করার ফলে কি যে হৈচৈ পড়ে গেছে সারা শহরে। সেই সব কথাই শুনলাম ওদের মুখে। কতোজন যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ীরা—যারা কখনো ব্যাঙ্কের ধার ধারে না, নগদেই সব সময় কারবার করে, তাদের মাথায় বাড়ি। যে বুড়ো লোকটা আজ তার মেয়ের বিয়ের বাজার করার জন্য গতকাল ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকা তুলেছিল তার কি উপায় হবে? কতোজনে কতো জরুরী পেমেন্ট আজ সকালেই করবার জন্য গতকাল টাকা তুলেছে, তাদের মহাসর্বনাশ। পাওনাদারের কাছে তাদের মুখ নষ্ট। কারো কারো বাড়িতে বাজার করার মতো টাকা পর্যন্ত নেই। এক কথায় নোট অচল করে সামরিক সরকার দেশের সমগ্র জনজীবন স্থাণু করে দিয়েছে।

৯ জুন
বুধবার ১৯৭১

আজ শরীর একদম ভালো। গোসল করে সাড়ে এগারোটাতে তৈরি হয়ে নিলাম। নজলু আসবে এখুনি। ওকে নিয়ে মা'র বাসায় যাব। গহনা রাখার বন্দোবস্ত অবশেষে হয়েছে। মা'র বাড়ির একতলায় সিঁড়িঘরে সিঁড়ির নিচে ছোট্ট একটা বাথরুম আছে। কয়েক মাস আগেই বাথরুমটা করা হয়েছে, এখনো 'প্যান' বসানো হয়নি। এই প্যান বসানোর খালি জায়গাটায় গহনার বাক্স রেখে সিমেন্ট করে দেওয়া হবে। রাজমিস্ত্রির কাজটা আমরাই করব। বালি, সিমেন্ট মা'র বাড়িতেই রয়েছে। নজলুর বাড়িতে তার বউয়ের ছাড়াও কয়েকজন আত্মীয়ের গহনাও আছে। পরের আমানত নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। নজলুও সেসব গহনা মা'র বাড়িতে পুঁতে রাখবে। নজলু এলে রিকশা করে মা'র বাড়ি গেলাম। আমার গহনা, মা'র গহনা, নজলু এবং তার আত্মীয়ের গহনা—সবগুলো একটা বড় বিস্কুটের চ্যাপটা টিনে রাখা হল। সব গহনার লিস্ট করে তার তিনটে কপি করা হলো। একটা লিস্ট গহনার বাক্সে থাকবে—বাকি তিনটে তিনজনের কাছে।

যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে তিনজনে মিলে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেলাম। বিস্কুটের বাক্স প্রথমে তিন-চার পরত প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে দড়ি বাঁধলাম। যাতে বাক্সের ভেতর পানি না ঢোকে। বাক্সটা গর্তে বসিয়ে তার চারপাশে ছোট ছোট ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে তারপর বালি বিছিয়ে ওপরটা সমান করলাম। তারপর সিমেন্ট করতে গিয়ে একেবারে হয়রান। যাই হোক, কাজ শেষ করে তিনজন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারিফ করলাম। খুব খারাপ হয় নি। মাকে বললাম, 'আপনি কাল থেকে রোজ দু'বেলা এটা পানি দিয়ে ভেজাবেন চার/পাঁচ দিন। তারপর আমরা আবার এসে বাড়ির যত ড্রাম, টিন, মটকা, কলসি হাবিজাবি জিনিস আছে, সব এখানটায় ঠেসে একটা স্টোররুম বানিয়ে ফেলবো।'

নজলু হেসে বলল, 'আশা করি তার আগেই খানসেনারা এসে হামলা করবে না।'

আমি ধমকে উঠলাম, 'বালাই ষাট। অকথা কুকথা কেন বলছ?'

মা বললেন, 'কোন ভয় কোরো না। রোজ আমি দোয়া-দরুদ পড়ে বাড়ি বন্ধ করি। আল্লার রহমতে কোন খানসেনা কি বিহারি এ বাড়িতে আসতে পারবে না।'

মা'র প্রত্যয়ে আমরাও অনেকখানি ভরসা পেলাম।

১০ জুন
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

দুপুরে খেয়ে কেবল একটু শুয়েছি, অমনি ফোন বেজে উঠল। একটু বিরক্তই হলাম। কে এমন অসময়ে—

ফোনে রেবার গলা : 'আপা, টাট্টু ফিরেছে। এই এখখুনি।'

ফোন রেখে তড়াক করে উঠে হাঁক পাড়লাম, 'রুমী, জামী, শিগগির তৈরি হ'। গুলশান যাব। টাট্টু ফিরেছে।'

পনের মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে চারজনে বেরিয়ে পড়লাম গুলশানের পথে।

রুমী বলল, 'আম্মা, তুমি যেন মেলাই প্রশ্ন কোরো না। ও নিজে থেকে যেটুকু বলবে, সেইটুকু শুনে সন্তুষ্ট থেক।'

একটু রাগতস্বরে বললাম, 'ঠিক আছে, মুখে তালা এঁটে রাখলাম।'

রেবার বিছানার ওপর টাট্টু বসে আছে—এলোমেলো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গর্তে বসা লাল চোখ। এমনিতেই সে রোগা-পাতলা, মুখটা চিকন। এখন মনে হচ্ছে কতদিন না খেয়ে খেয়ে মুখ দড়িপানা হয়ে গেছে।

টাট্টু অসম্ভব ক্লান্ত। এর আগে নিশ্চয় বাড়ির সবাইকে বলতে হয়েছে তার উধাও হবার কাহিনী। তবু আমাদেরকে আবার সব বলল সে।

দু'জন বন্ধুর সঙ্গে টাট্টু দাউদকান্দিতে নদী পেরিয়ে পর্যায়ক্রমে বাসে, রিকশায় ও পায়ে হেঁটে বর্ডার ক্রস করে। ওপারে নগরদা বলে একটা জায়গায় যে ক্যাম্পটা ছিল, সেখানে ওরা ওঠে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের এক অধ্যাপক ওখানে এই ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করেছেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন ছেলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। অধ্যাপক তাদেরকে রিক্রুট করে, বাছাই করে কোম্পানি গঠন করে তারপর প্লাটুনে ভাগ করে দিচ্ছেন। একজন ল্যান্স নায়েক ছেলেদেরকে ট্রেনিং দেন। তাঁকে সবাই ওস্তাদ বলে, নাম তোফাজ্জল মিয়া। প্রত্যেক দলের চারদিন করে ট্রেনিং। একেবারেই এলিমেন্টারি ট্রেনিং। টাট্টুরা যাবার পরদিন ওদের ট্রেনিং শুরু হল। প্রথমদিকে গুলিগোলা বুলেট গ্রেনেড এসব কম ছিল বলে ট্রেনিং পাবার পর সব দলই অপারেশনে যেতে পারত না। টাট্টুর কপাল ভালো, সেই সময় কিছু গুলিগোলা গ্রেনেড পাওয়া গিয়েছিল। তাই টাট্টু দু'একটা অপারেশনে যেতে পেরেছিল।

রুমীর নিষেধ ভুলে মুখ ফসকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?'

টাট্টু বলল, 'আমাকে ঢাকাতেই কিছু কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে। ওখানে ক্রমেই ছেলেদের ভিড় বাড়ছে। থাকার জায়গার অভাব, খাবার অভাব। খাওয়া শুধু ভাত আর ডাল। তাও সব সময়ই চাল যোগাড়ের ধান্দায় থাকতে হয়। তার ওপর বৃষ্টি। সে যে কি কষ্ট। ভাতের কষ্ট তো ছিলই, বৃষ্টিতে ভিজে সেঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে বহু ছেলের জ্বর হয়ে গেল। আর পেটের অসুখ। ওষুধেরও অভাব। তাই

অধ্যাপক একেক দলকে একেক দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন দিকে পাঠাতে লাগলেন।'

আমি আবার একটা প্রশ্ন করে ফেললাম, 'এ ক'দিন ঘুম-খাওয়া কিছুই হয়নি নাকি?'

টাট্টু হাসল, 'খাওয়া মোটামুটি হয়েছে। ঘুমোনোর সময় একেবারেই পাই নি। একে যাওয়ার পরিশ্রম, গিয়েই ট্রেনিং, তারপর অপারেশনের ধকল, আবার ফিরে আসা—টেনশনও তো ছিল। তাছাড়া ওখানে যাবার চারদিন পর ক্যাম্প সরাবার অর্ডার হল। সব ভেঙেচুরে নিজেরাই মাথায় বয়ে তিন মাইল দূরে গিয়ে নতুন ক্যাম্প করা হল।'

আমি আর থামতে পারলাম না। আবার প্রশ্ন: 'কি ভেঙে নিয়েছিলি?'

'ঘরের বেড়া, তাঁবু, বাঁশ, চাটাই। হাঁড়িকুড়ি, অন্যান্য জিনিসও মাথায় বইতে হয়েছে। সে খাটনিটাও কম ছিল না। তবে একটা সান্ত্বনা ছিল, নতুন ক্যাম্পে এসে একটা ফ্রেশ পুকুর পাওয়া গেল।'

'ফ্রেশ পুকুর মানে?'

টাট্টু হেসে ফেলল, 'সাধারণত ক্যাম্প করা হয় পুকুর বা নদীনালার পাশে—যাতে পানি পাওয়া যায়। নগরদা ক্যাম্পের পাশে একটা পুকুর ছিল, সেটার পানি নাওয়া-খাওয়া, ধোয়াপাখলা সব কাজ করতে করতে একেবারে পচে যাবার মত হয়েছিল। তাই তিন মাইল দূরে যে পুকুরটার পাশে নতুন ক্যাম্প করা হল, সেটার পানি তখনো ফ্রেশ ছিল। অবশ্য এটাও জানতাম—এতগুলো ছেলে ব্যবহার করতে করতে কয়েকদিনের মধ্যে সেটাও পচিয়ে ফেলবে।'

আমরা উঠলাম। এতদিনে মুক্তিযুদ্ধের একটা বাস্তব ছবি মনের চোখে ফুটে উঠল। এর আগে বহুবার শুনেও যেন বিশ্বাস হতে চাইত না। মুক্তিযুদ্ধ সত্যি সত্যি হচ্ছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্প থেকে ফিরে আসা একটি ছেলের মুখে শুনে মনে হল সত্যি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে। এবং দলে দলে ছেলে যুদ্ধ করতে ছুটে যাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরোবার আগে রুমী বলল, 'এক কাজ কর। খুব ভালো করে সাবান ঘষে গোসল করে পেট ভরে ডাল-ভাত খাও। তারপর দরজা বন্ধ করে কষে একটা ঘুম দাও।'

সারাটা সময় জামী একটাও কথা বলে নি।

১১ জুন
শুক্রবার ১৯৭১

ইয়াহিয়া সরকার বেশ ভালো ফ্যাসাদেই পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও জাতিসংঘকে ভালোমতো বুঝিয়ে উঠতে পারছে না যে, পূর্ব পাকিস্তানে যা চলছে, তা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কতিপয় দুষ্কৃতকারী'র নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ মাত্র। এবং সে ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর পাকিস্তানের সশস্ত্র সেনাবাহিনী এখন রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজে প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করছে। প্রদেশের সর্বত্র এখন স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ সব পুরোদমে চলছে। কল-কারখানায় পুরোদমে উৎপাদন চলছে। বাস, কোচ, ট্রেন, স্টিমার সব পুরোদমে চলছে। জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ইয়াহিয়া মোটেও ভোলেন নি। পূর্ব পাকিস্তানের ঐ 'বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক' আন্দোলনের জন্যই তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি একটুখানি পিছিয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অভ্রান্ত রয়েছে:

তিনি নির্বাচন বিফলে যেতে দেবেন না। জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা তিনি অতিশীঘ্রই ঘোষণা করবেন। তবে হ্যাঁ, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গিয়ে তিনি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দিতে পারেন না। সেই জন্যই একটুখানি দেরি হচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের খুঁজে বের করার জন্য ইয়াহিয়া বেগম আখতার সোলায়মানকে ঢাকা পাঠিয়েছেন তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণার পর পরই। বেগম আখতার ঢাকায় এসে ইতোমধ্যেই অনেক আওয়ামী লীগ এম.এল.এ ও এম.পি.এ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন। খবরের কাগজে প্রকাশ : তিনি ১০৯ জনের স্বাক্ষর যোগাড় করে ফেলেছেন! (খুবই নিবেদিতপ্রাণ করিতকর্মা মহিলা, বোঝা যাচ্ছে।)

বার বার এসব কথা বলে, রেডিও-টিভি খবরের কাগজের প্রচার মাধ্যমে এত সব সাফাই গেয়েও পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ভোলাতে পারছে না। চলতি বছরের বৈদেশিক ঋণের মে-জুন মাসের কিস্তি ৩ কোটি ডলার শোধ দেওয়া পাকিস্তানের পক্ষে এখনই সম্ভব নয় বলে এইড কনসর্টিয়ামের কাছে পাকিস্তান ছয় মাসের সময় চেয়েছিল গত মাসের পয়লা তারিখেই। সে সময় দেওয়া হবে কি না, এখনো পর্যন্ত তার কোন সুরাহা হয় নি। গত মাসের শুরুতেই এসব বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত (পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমের ভাষায় 'আলোচনা'!) করার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের এইড-টু-পাকিস্তান কনসর্টিয়াম-এর চেয়ারম্যান মিঃ পিটার কারগিল একদল সহকর্মী নিয়ে ইসলামাবাদে হাজির। কয়েকদিন সেখানে খোদ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমদ পর্যন্ত অনেক বড় বড় কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কি হল, আল্লা জানে। কদিন পর এম.এম. আহমদ দৌড়ালেন ওয়াশিংটনে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার কাছে দরবার করতে। তারপরও তো মাস কাবার হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে ইয়াহিয়া ২৪ মে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাও ঘোষণা করলেন। কিন্তু কোথায় কি? বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন এখন দশদিন ধরে পূর্ব পাকিস্তান সফর করছে।

ওদিকে উ থান্ট পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে, তবে সে সাহায্য জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। পাকিস্তান তাতে রাজি নয়। পাকিস্তান সরকার জোর গলাতে মাথা নেড়ে বলছে—পাকিস্তানের নিজস্ব রিলিফ সংস্থা এসব সাহায্যসামগ্রী বিতরণের কাজে যথেষ্ট পটু। কিন্তু উ থান্ট-ভবী তাতে ভুলছে না!

জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর রিফিউজীজ প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানও এখন ঢাকায়। তাকে বোধহয় 'মুশকিল আসান' হিসেবে ইয়াহিয়া জাতিসংঘ থেকে ডেকে এনেছেন।

'পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যেসব প্রকৃত পাকিস্তানি, বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতকারীদের ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের মুখে পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয়ে সীমান্তের অপর পারে গমন করেছেন' তাঁদের সকলকে সাদরে ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসিত করবেন—এই মর্মে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বিবৃতিতে আশ্বাস প্রদান করেছেন। এবং এর প্রেক্ষিতে গত সপ্তাহেই ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথের ওপর অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে।

ঢাকায় আসার আগে প্রিন্স সদরুদ্দিন ইসলামাবাদে কয়েকদিন ছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যথাযোগ্য ব্রিফিং নেবার জন্যই। গতকাল

ঢাকায় পৌছেই প্রিন্স ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 'খাঁটি পাকিস্তানিদের' পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে গভর্নর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনি আজই চুয়াডাঙ্গা আর বেনাপোলের কাছে দুটো অভ্যর্থনা কেন্দ্র পরিদর্শন করে এসেছেন।

(কি নিষ্ঠা! কি উদয়াস্ত পরিশ্রম!)

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত তিনদিন আগেই উথান্টকে জানিয়েছেন যে, আমেরিকান সরকার আরো অতিরিক্ত পনের মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছেন ভারতে পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য। আরো খবর—মিশর ভারতে পাঠাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কলেরা ভ্যাকসিন।

কল্পনার চোখে দেখলাম ইয়াহিয়া এ খবর পেয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন। আর উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিনকে 'কোন কর্ম্মের নয়' বলে গাল দিচ্ছেন!

আজ থেকে ঢাকায় সান্ধ্য আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।

১২ জুন
শনিবার ১৯৭১

শহরে কলেরার প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। দেশের অন্যান্য জায়গায় কলেরার কথা আগেই কানে এসেছে। কলকাতার শরণার্থী শিবিরে কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। মজার কথা, দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে কলকাতার কলেরার কথা যতটা ফলাও করে বলা ও লেখা হচ্ছে, দেশের কলেরার ব্যাপার ততটাই চেপে যাওয়া হচ্ছে। কলেরা এখন ঢাকাতেও। সবাই সবাইকে বলছে 'মাছ খেয়ো না।' মাছতো কবে থেকে খাওয়া ছেড়েছি। সেই নদীতে লাশের বহর ভেসে থাকার পর থেকেই।

টি.এ.বি.সি. ইনজেকশান নেওয়া দরকার। মিয়াকে ফোন করা হয়েছিল গতকাল। সে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ আসবে বাসায়। মিয়া অর্থাৎ ডাঃ জহুরুল হক রেবার বড় বোনের দেবর। হোলিফ্যামিলি হাসপাতালে কর্মরত।

দশটার দিকে নিউ মার্কেটে গিয়ে ইনজেকশানের জন্য ওষুধ কিনে মা'র বাসায় গেলাম। টি.এ.বি.সি. দেবার জন্য মা আর লালুকে নিয়ে এলাম।

পাঁচটার সময় রুমী বলল, 'গাড়িটা একটু নেব আব্বু।'

শরীফ বলল, 'আমাকে ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে যা।'

রুমী গাড়িতে ওঠার আগে আস্তে করে বললাম, 'সাবধানে।'

রুমী একটু হাসল আমার দিকে চেয়ে।

সন্ধ্যার আগ দিয়ে মনু এল, বললাম, 'রুমীতো একটু বেরিয়েছে। এসে পড়বে এক্ষুণি। যাও, ওপরে ওর ঘরে গিয়ে বস।' মনু দোতলায় উঠতে না উঠতে রফিক এল। শরীফ নেই শুনে বেশিক্ষণ বসল না, আমিও চাপাচাপি করলাম না। এখন মনুর সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

রফিককে বিদায় দেবার জন্য দরজা খুলতেই দেখি ওয়াজেদ সাহেব ঢুকছেন—শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু! বলে উঠলাম, 'শরীফ যে এক্ষুণি ক্লাবে গেল। আপনারও নাকি যাবার কথা?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'তাই নাকি? তাহলে ক্লাবেই যাই।'

উনি চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে আমি দুদ্দাড় ওপরে উঠে এলাম। মনু আর জামী বসে বসে গল্প করছে। আমাকে দেখে মনু একটু উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসল। বললাম, 'কি খবর বল।'

'খবর আর কি! এই চলছে। বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ ঢাকায় আসছে, আলাদাভাবে নির্দেশমত কাজ সেরে আবার চলে যাচ্ছে। আমরা ইচ্ছে করেই একদল আরেক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি না। অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ হয়েই যায়—বন্ধুবান্ধব সব গ্রুপেই আছে।'

মনু চুপ করল। আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। প্রশ্ন করা নিষেধ। বেশি জানা বিপজ্জনক। আমি অন্য প্রসঙ্গ তুললাম। 'পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা তো খুব খারাপ।'

মনু সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল। বললাম, 'তিন মাস থেকে উৎপাদন বন্ধ। রপ্তানি বন্ধ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের লোন শোধ করার ক্ষমতা নেই, নতুন লোন পাবার কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। অথচ বাজেট তৈরির সময় এসে গেল। এত ঢাকঢাক করার পরেও গভর্নমেন্ট এতটুকু কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—মার্চ-এপ্রিলে প্রদেশের উৎপাদনের যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা কঠিন হবে। গত বছর রপ্তানি খুব ভালো হয়েছিল। এবার এক্কেবারে গোল্লা।'

মনু বলল, 'অথচ পাকিস্তান সরকার কি রকম দু'কান কাটা নির্লজ্জ দেখুন, বলছে-জাপানের কাছে যে তিন কোটি ডলার ধার পাওয়ার কথা ছিল, সেটা জাপান দেয় নি বলেই পাকিস্তান এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ধার শোধ করতে পারছে না।' মনু দেখছি, দেশের হালচালের বেশ ভালো খবর রাখে।

হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠলাম। দূরে কোথাও বোমা ফাটল বোধহয়। প্রথমটার রেশ মিলাতে না মিলাতেই আরেকটা শব্দ, তারপর আরো একটা।

আমি ছটফট করে উঠে দাঁড়ালাম। ঘড়িতে দেখলাম আটটা বাজে। কথায় কথায় এতটা সময় চলে গেছে। রুমী এখনো ফিরছে না কেন। ঐ এক দোষ, গাড়ি হাতে পেলে হয়। সময়জ্ঞান তখন আর থাকে না। জামী রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার ধরল। আমি স্থির হয়ে শুনতে পারছিলাম না। 'তোমরা শোনো' বলে ছাদে উঠে গেলাম।

একটু পরেই গাড়িটাকে গেটে ঢুকতে দেখলাম। তরতর করে নিচে নেমে গিয়ে নিজেই দরজা খুললাম। রুমীর মুখে কাঁচুমাচু হাসি। ধমক দিয়ে বললাম, 'গাড়ি হাতে পেলে হুঁশ থাকে না, না? ওদিকে মনু এসে বসে আছে সেই সন্ধ্যে থেকে। কোন রাস্তা দিয়ে এলি? কোনো শব্দ পেয়েছিস?'

'পেয়েছি। ঠিক বুঝতে পারলাম না কোথায়।'

একটু পরে শরীফ বাড়ি ফিরল। বলল, ওরা ঢাকা ক্লাব সুইমিং পুলের বারান্দায় বসেছিল। উত্তরদিকে বোমা ফাটার শব্দ পেয়েছে। খুব সম্ভব রেডিও স্টেশনে ফেটেছে। কারণ ঢাকা ক্লাবের উত্তরেই রেডিও স্টেশন।

রুমী হঠাৎ বলে উঠল, 'না, না, রেডিও স্টেশনে না, রেডিও স্টেশনে না। নিশ্চয় ইন্টারকনে। ওখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক মিশনের লোকজন আর ইউনাইডেট নেশন্‌স্‌-এর প্রিন্স সদরুদ্দিন আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি—বোমা ওখানেই ফেটেছে।'

আমাদেরও তাই মনে হলো। ওখানে বোমা ফাটানোর যৌক্তিকতাই সবচেয়ে বেশি।

মনু উঠে দাঁড়াল, রুমীর দিকে চেয়ে, ধীর শান্ত গলায় বলল, 'আমরা পরশুদিন সকালে রওনা দেব।'

১৩ জুন
রবিবার ১৯৭১

দুপুর হতে হতে বহুজনের মুখে বিস্তারিত খবর জানা গেল। তিনটে গ্রেনেড গতকাল ইন্টারকনের পোর্চেই বিস্ফোরিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের কাজ এটা। বিশ্বব্যাঙ্ক মিশনের লোকজন ও উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিনকে একটুখানি জানান দেওয়া যে পূর্ব পাকিস্তান আর নেই। এটা এখন যুদ্ধরত বাংলাদেশ।

রুমী আগামীকাল যাবে। ওর প্যান্টের মুড়ি খুলে একশো টাকার নোট বের করে জমা দিতে হয়েছে। এখন আবার পঞ্চাশ টাকার নোট ভাঁজ করে সেলাই করলাম। আগের মতো অত দেওয়া গেল না। মুড়ি বেশি মোটা দেখায়। খানসেনারা সার্চ করার সময় কোমর হাতিয়ে দেখে।

সন্ধ্যার পর রুমী নাদিমকে বাসায় নিয়ে এল। মেজর (অবঃ) কাজি নূরুজ্জামানের ছেলে। মেজর জামান ক্র্যাকডাউনের সঙ্গে সঙ্গেই ওপারে চলে গেছেন। বর্ডার সংলগ্ন কোনো এক রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে রত আছেন। ওঁর স্ত্রী সুলতানা জামান এবং দুই মেয়ে নায়লা এহমার ও লুবনা মরিয়ম মে মাসে চলে গেছে ওপারে। বাকি শুধু নাদিম। এখন রুমীর সঙ্গে যাবে। আজ রাতটা এখানে থাকবে।

রাত নটার দিকে নাদিমের মামা এলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। আর এল সাদ আন্দোলিব। রুমীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সাদ আবার নাদিমের ফুফাত ভাইও বটে। ওরা খানিকক্ষণ থেকে তারপর চলে গেছে।

১৪ জুন
সোমবার ১৯৭১

আবার সেই সকালে উঠে যন্ত্রচালিতের মত তৈরি হওয়া, নাশতা খাওয়া, গাড়িতে নিয়ে মাঝপথে কোথাও নামিয়ে দেওয়া।

নাদিম আর রুমী চলে গেল।

সারাটা দিন বাগানে কাটালাম। কাসেমকে রান্নাঘরে আর জামীকে বাবার কাছে রেখে বারেককে নিয়ে সারা দিন ধরে আগাছা নিড়ালাম। সেই সঙ্গে বারেককে বকুনি— 'তোকে না রোজ বিকেলে আগাছা নিড়াতে বলেছি? কদ্দিন খুরপি লাগাস নি? দাঁড়িয়ে না দেখলে কাজ করবি না? তাহলে বলে দে, এক্ষুণি মাইনেপত্র দিয়ে বিদায় করে দি।'

কে যেন গেট দিয়ে ঢুকে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে দেখি খুকু। ডাঃ এ. কে খানের মেয়ে। ওরা কিছুদিন থেকে রাজশাহীতে। ডাক্তার এখন ওখানকার হাসপাতালে পোস্টেড।

বললাম, 'খুকু কবে এলে? কার সঙ্গে? ডাক্তার এসেছে? চল, ঘরে চল।'

খুরপি ফেলে খুকুকে নিয়ে ঘরে গেলাম। নিচের বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এসে বসলাম।

খুকু, তার ভাই খোকন আর খালা মঞ্জু, এই তিনজনে মার্চের মাঝামাঝি পাবনার এনায়েতপুরে নানার বাড়িতে চলে যায়। এতদিন ওরা গ্রামেই ছিল। ক্র্যাকডাউনের পর প্রায় তিন সপ্তাহ রাজশাহীর কোনো খবর পায় নি। তারপর বাপের চিঠিতে জানে— সবাই বেঁচে আছে।

'তোমাদের গ্রামে মিলিটারির কোনো উৎপাত হয়েছিল?'

'না, আমাদের গ্রামে মিলিটারি যায় নি। তবে খবর পেতাম অন্যদিকে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। টেলিফোন টেলিগ্রাফ লাইন সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রও অনেকদিন যায় নি।'

'ঢাকায় এলে কার সঙ্গে?'

'সারওয়ার মামার সঙ্গে।'

'খোকন, মঞ্জু কোথায়?'

'ওরা এনায়েতপুরেই আছে। পরে আসবে। এক সঙ্গে সবাই আসতে সাহস পেলাম না। পথঘাট কি রকম আছে, কিছুই তো জানা ছিল না। খালাম্মা, আব্বাকে ফোন করতে হবে।'

'নিশ্চয়।'

তক্ষুণি ট্রাঙ্কল বুক করলাম রাজশাহীতে। খুকুকে বললাম, 'ফোন না পাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক। চা-নাশতা খাও, কাগজ পড়। টিভির সময় হলে টিভি দেখ। তারপর স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনো। গ্রামে শুনতে স্বাধীন বাংলা?'

'শুনতাম খালাম্মা। গ্রামে ট্রানজিস্টার ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। তাই সবসময় রেডিওই শুনতাম। ২৫ মার্চের পরে তো খালি আকাশবাণী আর বিবিসি শুনতাম। তারপর স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনতে পেলাম।'

অনেক রাত পর্যন্তও লাইন পাওয়া গেল না। শেষে খুকু বলল, 'এখন বাসায় যাই খালাম্মা। কাল সকালে আবার চেষ্টা করব।'

১৫ জুন
মঙ্গলবার ১৯৭১

সকালে উঠেই ডাঃ এ.কে. খানকে আবার ফোন বুক করলাম। খুকুর পৌঁছানোর খবরটা দেওয়া দরকার। খুকুকে বললাম, 'তুমি ওপরে থাক। জামীর সঙ্গে গল্প কর। ফোন এলে আমার বেডরুমে ধোরো। আমি নিচে একটু সংসারের কাজ করি।'

এগারোটার সময় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং লেখক। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় একদিন বাংলা একাডেমীতে 'স্বাধীন বাংলার রূপরেখা' বলে একটা দুঃসাহসী প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। আগেও চিনতাম কিন্তু ঐ প্রবন্ধ পাঠের পর থেকেই যোগাযোগটা বেড়েছে।

চা-নাশতা দিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'হাসান হাফিজুর রহমানের কোনো খবর জানেন?

বোরহান চমকে বললেন, 'না। কেন, কিছু শুনেছেন?'

'না, না, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ওঁর কোনো খবর জানি না কি-না-তাই—'

'আমিও জানি না। লুকিয়ে আছেন কোথাও। হয়তো কোনো গ্রামে।'

'ওঁর খবর পেলে আমাকে জানাবেন।'

'জানাবো।'

বোরহান খুব কম কথা বলেন। দুটো কাজের ভার দিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক মনসুর মুসার স্ত্রী শামসুন্নাহার মুসা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের

মহিলা শাখায় কাজ করেন। বলাকা বিল্ডিংয়ে ব্যাঙ্ক। ওঁর কাছে গিয়ে কিছু কথা বলতে হবে। আর বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর কবীর চৌধুরীকে একটা চিঠি দিতে হবে।

'ঠিক আছে। কালকে যাব।'

রাজশাহীর লাইন পেলাম দেড়টায়। খুকু তার আব্বা, মা'র সঙ্গে কথা বলল। আমিও দু'চারটে কথা বললাম। এ.কে.খান জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা সবাই ভালো তো? শরীফ? রুমী-জামী? শরীফের আব্বা?'

'হ্যাঁ, সবাই ভালো।'

জবাব দেবার সময় বুকে ব্যথা লাগল। রুমী ভালো আছে কি? জানি না তো।

১৬ জুন
বুধবার ১৯৭১

কবীর চৌধুরী বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছেন। বাংলা একাডেমিতে চিঠি সঙ্গে নিয়ে ঢোকা ঠিক হবে না। বোরহানও সেই কারণে নিজে যায় নি। দশটার সময় ফোন করলাম কবীর চৌধুরীকে । ওঁর ফোন ট্যাপ হয়। কথাবার্তা সাবধানে বলতে হবে। নামটাম কিছু না বলে শুধু বললাম, 'আপনার বন্ধুর যে খুব অসুখ। আজই একবার আসবেন।' আমার যা মার্কামারা গলা, নাম না বললেও কারোরই চিনতে অসুবিধা হয় না। উনি বললেন, 'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে এতদিন খবর না নিয়ে। যাব।'

ফোন সেরে হেঁটে হেঁটে গেলাম বলাকা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মহিলা শাখায়। বিরাট একটা ঘর, ম্যানেজারের জন্য কাচের দেয়ালঘেরা আলাদা কোন কিউবিক্‌ল নেই। একেবারে হাট যেন। ম্যানেজার মিসেস শামসুন্নাহার মুসার টেবিল ঘিরেই একগাদা মহিলা। ঘরময় মহিলা থইথই করছে।

ওঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একটা একাউন্ট খুলব। জাহানারা ইমাম নাম।'

উনি খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'একটু বসতে হবে। যারা আগে এসেছেন, তাদের কাজগুলো আগে সেরে নিই।'

দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ার খালি হতেই সেখানে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়লাম।

বসে বসে মিসেস মুসাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। শ্যামলা, স্বাস্থ্যবতী, খুব স্মার্ট চেহারা, তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলার স্বর। মনে হয় একই সঙ্গে দশ হাতে কাজ সারতে পারেন। অন্তত এই মুহূর্তে তাঁর কাজ করার ধরন দেখে তাই মনে হল।

টেবিলের সামনের তিন-চারটে চেয়ার খালি হলে তবে উনি আমাকে ডাকলেন। গিয়ে বসলাম।। নতুন একাউন্ট খোলাম ফরম ইত্যাদি বের করে বললেন, 'একটা লকারও নেবেন নাকি? গহনাপত্র দলিল এসব রেখে দিলে নিশ্চিন্ত।' তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, নেব।'

'কি সাইজের নেবেন? একটু দেখে নিন। ছোট, বড়, মাঝারি সব সাইজের আছে। আসুন, স্ট্রংরুমে গিয়ে দেখে নিন।'

স্ট্রংরুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'খুবই নিরাপদ এই লকারগুলো। অনেকেই নিচ্ছে। একদম নিশ্চিন্ত থাকা যায়।'

স্ট্রংরুমের ভেতর ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতেই নাহারের মুখ-চোখের ভাব বদলে গেল, ফিসফিস করে বললেন, 'বোরহান ভাই আমাকে ফোন কর্‌ বলেছেন

আপনার কথা। ওখানে ভিড়ে কথা বলা যেত না। তাই লকার দেখার নাম করে—। তা আপনিও দেখি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেলেন। এবার বলুন কি কথা?'

আমি মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'মুক্তিযুদ্ধ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে, সে তো বুঝতেই পারছেন।..গেরিলারা এখন ঢাকায় ঘনঘন আসছে, অপারেশন করছে। তাদের শহরে থাকা-খাওয়া প্রোটেকশনের জন্য কিছু কিছু বাড়ি দরকার, জখম হয়ে গেলে লুকিয়ে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আর ক্লিনিক দরকার, ওষুধপত্র, কাপড়-চোপড়ের জন্য টাকা দরকার। এসব কাজে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন কি?'

'নিশ্চয় পারব। এবং করবও। এতো আমাদেরই বাঁচা-মরার প্রশ্ন। শুধু বলে দিন, কিভাবে সাহায্য করতে হবে।'

'বোরহান আপনাকে দরকার মত জানাবে।'

স্ট্রংরুম থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা একাউন্ট খুললাম।

বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা।

কবীর চৌধুরী এলেন একটায়। মিনিট দশেক বসে, উঠলেন। চিঠিটা আমি প্যান্ট্রিতে একটা মুড়ির টিনের নিচে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। সেখান থেকে এনে কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'ময়লা লেগে গেছে। কিছু মনে করবেন না।'

উনি হেসে ফেললেন।

১৭ মে খবরের কাগজে যে বিবৃতি বেরিয়েছিল সেইটাতে সই নেবার জন্য কবীর চৌধুরীর কাছেও লোক গিয়েছিল। উনি সই করেন নি, অফিসেও নিয়মিত যাচ্ছেন।

'বোরহান বলছিলেন, আমিও বলছি, একটু সাবধানে থাকবেন।'

কবীর চৌধুরীর আপাত নম্র বিনীতভাবের অন্তরালে একটা ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা লুকানো আছে, ওঁর হাসিতে সেটা যেন ঝলসে উঠল, 'মরার আগে আর মরতে পারি নে।'

কবীর চৌধুরী যেতে না যেতেই ফকির এসে ঢুকল, 'শরীফ কই?'

'এখনো আছে নি। বসুন, এখুনি চলে আসবে। খেয়ে যাবেন কিন্তু।'

শরীফ এলে আমরা চারজনে খেতে বসলাম। ফকির চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'রুমী কই?'

'ও হো, বলা হয় নি বুঝি। ওর বন্ধু খুরশীদ—ওই যে আমাদের সামনের বাড়িতে থাকে ওকে দেশে যেতে হল। কি একটা জরুরি দরকার। একা যেতে ভয় পেল, তাই রুমীকে সঙ্গে নিয়ে গেল।'

'ও'। ফকির চোখ নামিয়ে খাওয়ার মন দিলেন। ফকির জানেন রুমী মুক্তিযুদ্ধে গেছে। কিন্তু সে কথা মুখে উচ্চারণ করা বারণ। বাঁকার ভাগনে খালেদ মোশাররফ ক্র্যাকডাউনের সঙ্গে সঙ্গে ডিফেক্ট করে বর্ডার ক্রস করে গিয়েছিল। বহুদিন তো কোনো খবর ছিল না। সবাই ভেবেছিল হয়তো মেরেই ফেলেছে পাকসেনারা। এখন জানা গেছে সে আগরতলার দিকে বর্ডার রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। কিন্তু আমরা কখনো তার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি না। আমরা যে জানি, বাঁকা সেটা জানেন। বাঁকা যে জানেন আমরা সেটা জানি। কিন্তু আমরা আর বাঁকারা একত্র হলে কখনো তাঁর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করি না। এইটাই নিয়ম। ফকির বুঝিবা ভুলে জিগ্যেস করে ফেলেছিলেন।

ঢাকাকে জাতে ওঠানোর জন্য সামরিক সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। ঢাকার রাস্তাগুলোর নাম বদলানো হয়েছে। আজকের কাগজে লম্বা ফিরিস্তি বেরিয়েছে। লালমোহন পোদ্দার লেন হয়েছে আবদুল করিম গজনভী স্ট্রিট। শাঁখারিবাজার লেন-গুলবদন স্ট্রিট, নবীন চাঁদ গোস্বামী রোড-বখতিয়ার খিলজী রোড, কালীচরণ সাহা রোড-গাজি সালাউদ্দীন রোড, এস. কে. দাস রোড-সিরাজউদ্দিন রোড, শশীভূষণ চ্যাটার্জী লেন-সৈয়দ সলিম স্ট্রিট। খানিক পড়ার পর হয়রান হয়ে গেলাম। এত নাম পড়া যায় না। পড়তে পড়তে চোখে ধাঁধিয়ে ওঠে।

জামী বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ মা, লেনগুলো সব স্ট্রিট কিংবা রোড হয়ে গেছে।'

শরীফ হেসে ফেলল, 'ঢাকার অলিগলিগুলো এতদিনে একটু মান-মর্যাদার মুখ দেখল!' কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'আরেকটা খবর দেখেছ? বহু বই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।'

'কাদের কাদের বই? কি ধরনের বই? দেখতো, আমাদের বাড়িতে কোন বই আছে কি না।'

শরীফ পড়তে পড়তে বলল, সব ধরনের বই-ই তো দেখছি। রাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক—তবে অনেক লেখকেরই নাম আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। শরীফ নীরবে পড়ে চলল, আমি খানিক তাকিয়ে শেষে অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম, 'জোরে পড় না কেন, আমরাও শুনি।' শরীফ লিস্টের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতেই বলল, 'আমিও তোমার মত হাঁপিয়ে পড়ব তাহলে। শুধু দেখছি, কোন বই আমাদের বাড়িতে আছে কি না।' খানিক পরে, 'এই যে, প্রবোধকুমার স্যান্যালের 'হাসু বানু' কে. এম. ইলিয়াসের 'ভাসানী যখন ইয়োরোপে' এই বই দুটো আমাদের বাসায় আছে। এ দুটো সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'ভাসানী যখন ইয়োরোপে' বইটা অনেক আগে থেকেই তো বাজেয়াপ্ত হয়ে আছে। আমরা তো সেই কবেই বইটা ড্রেসিংরুমে ওয়ার্ডরোবের তলায় লুকিয়ে রেখেছি।'

'কি জানি! মাঝখানে বোধহয় বইটা ছেড়ে দিয়েছিল। এখন তো অত মনে নেই। এবার কিন্তু বাসার ভেতর লুকিয়ে রাখা চলবে না। বাইরে কোথাও সরাতে হবে, না হয় পোড়াতে হবে।'

'রুমী বাউন্ডারি ওয়ালের যেখানটায় মাওয়ের রচনাবলি রেখেছে, সেইখানে রেখে দেব।'

জামী অনেকক্ষণ থেকেই খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন গুনছে মনে হল। তাকিয়ে দেখলাম, ঢাকার রাস্তার নাম পরিবর্তনের তালিকার ওপর দিয়ে আঙুল বুলোচ্ছে আর মুখে বিড়বিড় করে গুণছে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে বলল, 'উঃ! একশো পঞ্চাশটা রাস্তার নাম বদলেছে, তাও শেষে লেখা আছে অসমাপ্ত। তার মানে আরো নাম বদলানো হয়েছে। খবরের কাগজওয়ালারাও এত নাম ছাপিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে নি। আর যাদের ওপর ভার ছিল এতগুলো মুসলমানি নাম যোগাড় করার, তাদের অবস্থা কি রকম ছ্যারাব্যারা হয়েছে, তা বোঝাই যাচ্ছে।'

জামী 'ছ্যারাব্যারা' কথাটা শিখেছে 'চরমপত্র' শুনে। আরো একটা শিখেছে 'গ্যাঞ্জাম।' আমাদের শুনতে বেশ মজাই লাগে।

২০ জুন
রবিবার ১৯৭১

বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন এসে 'তদন্ত' করে ফিরে গেছে। প্রিন্স সদরুদ্দিন এসে 'দেখেশুনে' ফিরে গেছেন। চারদিন আগে তিন সদস্যের ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলও এসে ঘুরে গেলেন। এরা খুলনা, যশোর, সিলেট, চট্টগ্রাম ট্যুর করলেন, চটকল দেখলেন, চা-বাগান দেখলেন। মিল-কারখানা দেখলেন, বেনাপোল সীমান্তে গেলেন, ঝিকরগাছায় অভ্যর্থনা কেন্দ্রও পরিদর্শন করলেন। তারপর গতকাল তাঁরাও ফিরে গেছেন।

এঁরা সবাই ফিরে গিয়ে 'সন্তোষজনক' রিপোর্ট না দিলে বোধহয় কোনো পশ্চিমী দেশ থেকেই এইড-ফেইড আর পাবে না ইয়াহিয়া সরকার। কিন্তু 'সন্তোষজনক' রিপোর্ট দেবার উপায় আছে কি কারো। ক'দিন ধরে, আকাশবাণী, বি.বি.সি., স্বাধীন বাংলা, রেডিও অস্ট্রেলিয়া—সবখান থেকেই কে এক এন্থনী মাস্‌কারেনাসের রিপোর্ট সম্বন্ধে খুব শোনা যাচ্ছে। এই সাংবাদিকটি নাকি পাকিস্তানি নাগরিক, করাচির মর্নিং নিউজের এসিস্ট্যান্ট এডিটর। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইয়াহিয়া সরকার তাঁকে এক দল সাংবাদিকের সঙ্গে পূর্ব বাংলায় পাঠায়। সব দেখেশুনে করাচি ফিরে গিয়ে প্রথমে বউ-ছেলেমেয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। তারপর নিজে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের সানডে টাইমসে প্রকাশ করেন তাঁর রিপোর্ট। এই রিপোর্ট বেরোনোর পরপরই ইয়োরোপ-আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে গেছে। এতদিনে সত্যি সত্যিই সবার প্রত্যয় হয়েছে যে পূর্ব বাংলায় ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী যা করেছে, তাকে 'গণহত্যা' ছাড়া অন্য কোন কিছু বলা যায় না।

শরীরটা কেন জানি ভালো ঠেকছে না। শরীরের চেয়ে মনই বেশি বেঠিক। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে দুই পাঁজর চেপে ধরলে যেমন দম আটকানো ব্যথা হয়, সেই রকম ব্যথা ধরছে পাঁজরে—মাঝে মাঝেই। রুমী কি বর্ডার ক্রস করতে পেরেছে? পথে কোথাও খানসেনাদের সামনে পড়ে নি তো? কি করে জানব? জানার কোনো উপায় নেই। শুধু সহ্য করে যাওয়া।

ঘরের ভেতরে শরীফ, জামী,—আর বাইরে থেকে সাদ এলে কেবল তার সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে মন হালকা করার কোন উপায় নেই। অন্য সবার সঙ্গেই সপ্রতিভ হাসিমুখে অভিনয়। এমনকি মা'র সঙ্গে, লালুর সঙ্গে। মা একটু চেষ্টা করেছিলেন জেরা করে জানবার। তাকে কঠিন, গম্ভীর মুখে বলেছি, রুমী তার বন্ধুর সঙ্গে দেশের বাড়িতে গেছে।

মোতাহার সাহেব প্রায় প্রায়ই আসেন। আমরাও যাই। ওঁর বড় ছেলে শামীমকেও ক'দিন থেকে দেখি না। একদিন বেভুলে জিগ্যেস করতেই মোতাহার সাহেব খুব সপ্রতিভ মুখে বললেন, 'ও শামীম? ও তো দেশে গেল সেদিন। এসে পড়বে দু'চারদিনের মধ্যেই।' বুঝলাম। শামীমও মুক্তিযুদ্ধে গেছে।

২৭ জুন
রবিবার ১৯৭১

সকাল থেকে শরীর খারাপ। সেই সঙ্গে থেকে পাঁজরে ব্যথা। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে পাঁজর চেপে ধরার ব্যথা। নিঃশ্বাস নিতে পারি না।

ডি.সি.জি.আর-এ (ঢাকা ক্লাব জিমখানা রেসেস) কি যেন কাজ পড়েছে, শরীফ নাশতা করে সেখানে গেছে। আমার কিছু ভালো লাগছে না, তাই একটা নতুন কাজ নিয়ে বসেছি। বাড়ির যত তালা—নতুন, পুরনো, ছোট, বড়, জংধরা, বিকল—সব নিয়ে বসেছি। প্রায়, প্রায়ই গুজবের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে—মোহাম্মদপুর-মিরপুর থেকে বিহারিরা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে এদিকপানে আসবে। একটা তাৎক্ষণিক হৈচৈ পড়ে যায় চারপাশে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ফোন করা বেড়ে যায়, সবাই নিজ নিজ বাড়ির দরজা-জানালার হুক-হুড়কো দেখে, ঠিক না থাকলে মিস্ত্রি ডেকে মেরামত করায়। আমাদের বাড়ির দুটো সদর দরজার পাল্লাই বেশ পলকা—ওগুলো ফেলে ভারি পাল্লা বানানো দরকার। আমাদের পুরনো কাঠমিস্ত্রি চৈতন্যকে খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার কোনো হদিস নেই। মনে হচ্ছে নিউ মার্কেট থেকে মুসলমান কাঠমিস্ত্রি এনে কাজ করাতে হবে। এখন তালাগুলো নিয়ে বসেছি। জংধরা তালায় তেল দিয়ে, চাবি ঠিকঠাক করে, ডুপ্লিকেট চাবি আলাদা করে সব হিসাবমতো বিভিন্ন রিঙয়ে লাগিয়ে সিজিল করে রাখলাম।

শরীফ ফিরল সন্ধ্যা পার করে। এসেই বলল, 'তৈরি হও। বাঁকার বাসায় যেতে হবে।'

'কেন, কি ব্যাপার?'

'বাঁকা ফোন করেছিল। কি যেন জরুরি ব্যাপার। ফোনে বলা যায় না।'

বাঁকার বাসায় গেলাম।

খালেদ মোশাররফের চিঠি নিয়ে দুটি মুক্তিযোদ্ধা ছেলে গতকাল বিকেলে বাঁকার বাসায় এসেছিল। সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর যে পাতলা কাগজের মোড়ক থাকে, সেই কাগজ বের করে তাতে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে আবার সেটা প্যাকেটের মধ্যে রেখে সিগারেট ভরে রাখা হয়েছিল। এই রকম সাবধানতার সঙ্গে ছেলে দু'টি খালেদের চিঠি নিয়ে এসেছিল।

শরীফ জিগ্যেস করল, 'হাতের লেখা চিনেছেন?'

বাঁকা বললেন, 'হ্যাঁ, মণিরই হাতের লেখা।'

'কি লিখেছে মণি?'

বাঁকা চিঠিটা দেখালেন। মাত্র দুটো লাইন, 'পত্রবাহক দু'জনকে দরকার হলে কিছু সাহায্য করবেন। আমি ভালো আছি।—মণি।'

শরীফ আবার জিগ্যেস করল, 'কি ধরনের সাহায্য চায় ওরা?'

'আপাতত টাকা-পয়সা।'

'দিয়েছেন কিছু?'

'না, কাল সন্ধ্যেয় এসেছিল। আজ তো রোববার। তাছাড়া তোমার সঙ্গে পরামর্শ করাও দরকার।'

শরীফ বলল, 'মণির হাতের লেখা যখন চিনেছেন, তখন ওদের বিশ্বাস করা যায়। টাকার তো খুবই দরকার এখন ওদের।'

আমি কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ওরা দেখতে কি রকম? বয়স কত হবে? কেমন পোশাক পরে ছিল?'

'একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মনে হলো। আরেকজন একটু কম বয়সী। সাধারণ প্যান্ট-সার্ট পরা। লম্বা-লম্বা চুল, জুলফি, গোঁফ।'

'নাম বলেছে?'

'বলেছে। একজনের নাম শাহাদত চৌধুরী। সে আরেকটা ছোট স্লিপ দেখাল, তাতে মণি তাকে অথরিটি দিয়েছে—সেক্টর টু-এর তরফ থেকে সে ঢাকায় প্রয়োজনমত সব ধরনের যোগাযোগ করতে পারবে। স্লিপটাতে আবার খালেদের সিল মারা আছে। কমবয়সী ছেলেটার নাম আলম।'

শরীফ বলল, 'তাহলে তো সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই। কিছু টাকার যোগাড় রাখতে হবে। যখনই আসে, দিয়ে দেবেন।'

বাড়ি ফিরে সারারাত ঘুম হলো না। সেক্টর টু থেকে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা এসে বাঁকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে! খালেদ মোশাররফ সেক্টর টু'তে যুদ্ধরত। মনে হচ্ছে—এতদিনে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আমাদেরও একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল।

৩০ জুন
বুধবার ১৯৭১

রাজশাহী থেকে ডাঃ এ. কে. খানের ট্রাঙ্কল পেলাম। উনি আগামীকাল ঢাকায় আসছেন।

সাতক্ষীরা থেকে আইনু ঢাকা এসেছে। ওর বড় ভাই শামু অর্থাৎ ডাঃ শামসুল হক আমেরিকার মিশিনগানে থাকে। শামু আইনুকে মিশিগানে নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

আইনুর কাছে সাতক্ষীরার এবং ঢাকা আসার পথের বিভিন্ন জায়গায় পাক আর্মির নৃশংস অত্যাচারের অনেক কাহিনী শুনলাম। নতুনত্ব কিছু নেই—সেই ঠাঠাঠাঠা করে মেশিনগান চালিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করা, শিশু-কিশোর-বৃদ্ধকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা, মেয়েদের অসম্মান করা, ঘরবাড়ি, গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া। কাহিনী পুরনো হলেও আইনুর কাছে তা অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য। নিজের চোখে এসব দেখে আইনুর স্তম্ভিত, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব এখনো কাটে নি।

এগারোটার দিকে বদিউজ্জামানের ফোন পেলাম, 'আপা, আপনি মেহের আপাকে চেনেন তো?'

'মেহের আপা? মানে—'

'ঐ যে মিসেস দেলোয়ার হোসেন, ধানমণ্ডি ছ'নম্বর রোডে বাসা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি, মোটামুটি জানাশোনা আছে। ওঁর মেয়ে তো ইয়াসমিন, ছেলে নাসিম।'

'হ্যাঁ উনিই। উনি আপনাকে খবর দিতে বলেছেন—আপনি যেন আজ সময় করে ওঁর সঙ্গে দেখা করেন।'

'দেখা করব? কি ব্যাপার?'

রুমীর খবর! এটুকু বলে বদিউজ্জামান ফোন রেখে দিল।

রুমীর খবর! আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এক্ষুণি যাব? নাকি বিকেলে? ঘড়ির দিকে তাকালাম—এখন সাড়ে এগারোটা বাজে। নাঃ, বিকেল পর্যন্ত থাকা যাবে না এখুনিই যাই। জামীকে ডেকে দাদার কাছে থাকতে বলে, বারেক-কাসেমকে রান্নাঘরের সব বুঝিয়ে দিয়ে তক্ষুণিই একটা রিকশায় করে মিসেস হোসেনের বাড়ি চলে গেলাম।

মিসেস হোসেন দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে বসালেন। কেমন আছেন, কি—ইত্যাদি কুশল প্রশ্নাদি শেষ হবার আগেই হঠাৎ তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আপা, শিগগির আমার সঙ্গে ও ঘরে চলুন।' বলেই হাত ধরে টান দিলেন।

কিছুই না বুঝে হতভম্বের মতো ওঁর টানে টানে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এ ঘরে ওঁর ছেলেমেয়েরা রয়েছে, দেখলাম। উনি ঘরের অন্য প্রান্তে ছোট ড্রেসিং রুমটায় আমাকে ঢুকিয়ে বললেন, 'এইখানে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি গেট দিয়ে এক ভদ্রমহিলাকে ঢুকতে দেখেছি। উনি আপনাকে দেখলে মুশকিল হবে। পরে সব বলব।' বলেই আবার দ্রুত পায়ে বসার ঘরে চলে গেলেন।

আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কি ব্যাপার? রুমীর খবর জানতে এসে কোন বিপদে পড়লাম না তো?

দশ-পনের মিনিট পরে মিসেস হোসেন এসে আমাকে ডেকে নিয়ে মেয়েদের এই শোবার ঘরটাতেই খাটে বসলেন। খুলে বললেন সব ব্যাপার।

তখন গেট খুলে মিসেস এম. ঢুকছিলেন। ভাগ্যিস, মিসেস হোসেন যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে জানালা দিয়ে গেটটা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই সময়মত রক্ষা পাওয়া গেছে। মিসেস এম. আমার উপস্থিতি টের পান নি।

মিসেস এম. মিসেস হোসেন এবং ঢাকার আরো কিছু মহিলার অনেক দিনের পুরনো বান্ধবী। তবে গত বছর দুয়েক তেমন যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ মাস দুই থেকে উনি আবার সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে, উনি ইদানীং যে সব বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন, তার পরপরই সে সব বাড়ির কোনটাতে পাক আর্মির হামলা হচ্ছে বা কোন বাড়ির মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে যাচ্ছে। এতে এঁদের সবার সন্দেহ হচ্ছে যে, মিসেস এম. হয়ত গোপনে পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে কোনভাবে সহযোগিতা করছেন।

মিসেস হোসেন বললেন, 'বুঝলেন আপা, উনি আমি বহু বছরের পুরনো বন্ধু, অথচ আপনি নন। তাই আপনাকে আমার বাসায় দেখে উনি আসল ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ফেলতেন। আপনার ছেলে যে মুক্তিযুদ্ধে গেছে—এটা উনি বের করে ফেলতেন।'

মিসেস হোসেনের অনেক আত্মীয়ের ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে। এক বোনের দেওরের এক ছেলে সম্প্রতি ঢাকায় এসেছে। সে বলেছে রুমী আগরতলার কাছাকাছি এক ক্যাম্পে আছে, ট্রেনিং নিচ্ছে, ভালো আছে।

এইটুকু মাত্র খবর? যে ছেলে খবর এনেছে, তাকে পর্যন্ত দেখলাম না, তার মুখ থেকে নিজে কিছু শুনলাম না! মনটা ভীষণ দমে গেল। সেই ছেলের কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। মিসেস হোসেন বললেন, 'সে ছেলে এখন খুব অসুস্থ—অসুস্থ বলেই ঢাকা ফিরে এসেছে। এখন সেখানে যাওয়ার অসুবিধে আছে।'

আমি খুব নিরাশ, খুব অতৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

জুলাই

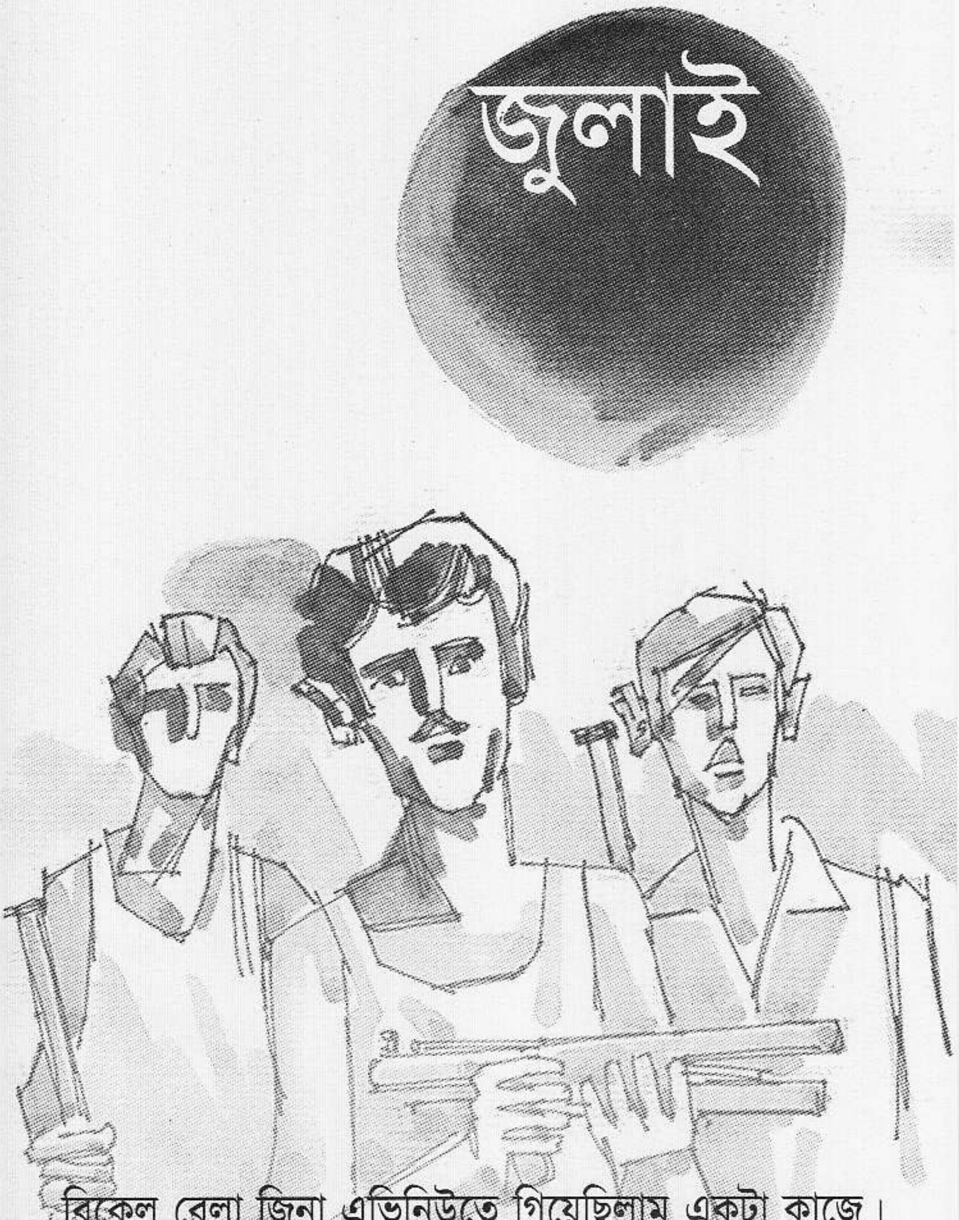

বিকেল বেলা জিন্না এভিনিউতে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গ্যানিজের দোকানটা আছে না? ওইখানে কয়েকজন বিচ্ছু গুলি আর গ্রেনেড ছুঁড়ে কয়েকজন পুলিশ মেরে দিয়ে চলে গেল। উঃ, কি সাহস ছেলেগুলোর। একবারে প্রকাশ্য দিবালোকে, বুঝলেন?

১ জুলাই
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রেবার সেই খালাতো বোন শামসুন্নাহার আজিম—যার স্বামীকে গোপালপুর সুগার মিলে আর্মি মেরে ফেলেছিল, তাঁর খবর পাওয়া গেছে। শামসুন্নাহার তার তিন বাচ্চা আর ছোট ভাই সালাহউদ্দিনকে নিয়ে গ্রামে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বহু কষ্টের ভেতর দিয়ে শেষমেষ তারা ঢাকায় এসে পৌঁছেছে গত মাসের মাঝামাঝি। ওদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, কিন্তু রেবা-মিনি ভাইয়ের মুখে শুনলাম পুরো ঘটনাটা।

শামসুন্নাহারের স্বামী আনোয়ারুল আজিম গোপালপুর সুগার মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেও সাড়া দিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গোপালপুর সুগার মিলে চিনি উৎপাদন বন্ধ করা হয়। ২৯ মার্চ পর্যন্ত এলাকা ছিল পাক শত্রু-মুক্ত। ৩০ মার্চ সকালে লোকমুখে খবর পাওয়া গেল নাটোর/বনপাড়ার রাস্তা দিয়ে পাক আর্মি মিলের দিকে আসছে। তখন মিল এরিয়ার সমস্ত লোক একত্র হয়ে মিলে আসার রাস্তার ওপর যে রেলক্রসিং ছিল, সেইখানে একটা ইঞ্জিন টেনে এনে ব্যারিকেড দিল। পাক আর্মি ব্যারিকেডের ওপাশে পজিশান নিয়ে গুলিগোলা মর্টারশেল যা আছে সব বর্ষণ করল, এ ধারে মুক্তিযোদ্ধারা মান্ধাতা আমলের বন্দুক, রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে তার উত্তর দিল। তখনকার মতো কিছু আহত সৈনিকসহ পাক আর্মি ফিরে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আজিম মিলের হিন্দু শ্রমিকদের পালিয়ে যেতে বলে। নিজেরাও আধ-মাইল দূরে নরেন্দ্রপুর ফার্মে সাময়িকভাবে সরে যায়। সেখানে ওরা ১০/১২ দিন ছিল।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিল এরিয়া থেকে কিছু লোক নরেন্দ্রপুরে এসে আজিমদের বলে যে, ওরা শুনেছে কয়েকদিন আগে মুলাডোলে পাক আর্মি আর মুক্তিবাহিনীর মধ্যে নাকি একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। তাতে আসলাম বলে এক পাকিস্তানি মেজর আর দু'জন সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। মুক্তিবাহিনী ওদের লালপুর বলে একটা জায়গায় নিয়ে গুলি করে। কিন্তু গুজব ছড়িয়েছে ওদের লাশ নাকি মিলের ভেতর ফেলে দেওয়া হয়েছে। নাটোরে পাকিস্তানি মেজর শেরওয়ানি খান খুব ক্ষেপে রয়েছে। এসব শুনে আজিম ইন্ডিয়া চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ঐ এলাকার অধিবাসীরা আজিমকে অনুরোধ করে, তাদেরকে বাঘের মুখে ফেলে আজিম যেন চলে না যায়। আজিম গোপালপুরে তার তিন বছরের চাকরির সময়ে এলাকার সকলের কাছে খুব প্রিয় ও পরিচিত হয়ে উঠেছিল, সবাই তাকে নেতার মতো গণ্য করতো। ওদের অনুরোধে পড়ে আজিমের ইন্ডিয়া যাওয়া হলো না। তবে নিরাপত্তার জন্য আরেকটু দূরে কৃষ্ণা ফার্মে গেল। সেখানে দিন সাত/আট ছিল।

ইতোমধ্যে রাজশাহীর পতন হয়েছে, সমগ্র উত্তরাঞ্চল পাক আর্মির নিয়ন্ত্রণে। মিল থেকে কিছু লোক ও আশপাশের গ্রামের আখচাষীরা এসে আজিমকে ধরল, 'আপনি মিলে ফিরে আসুন, আর্মি বলছে মিল চালু করতে হবে, আর কোনো ভয় নেই।'

আজিমরা মিলে ফিরে গেল। কিন্তু মিল চালু করা তো মুখের কথা নয়, সময় লাগে অথচ পাক আর্মি তা বুঝতে চায় না। নাটোরে ছিল পাকিস্তানি মেজর শেরওয়ানী খান।

সেখানে আজিম ও আরো কয়েকজন অফিসারকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিল চালু করার জন্য হুকুম দেওয়া হলো। গোপালপুর মিলে বিহারি শ্রমিক ছিল প্রচুর। তাদেরই এখন দিন। তারা মুখে বিনয় দেখিয়ে বলে, 'স্যার, আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আমরা মিল চালু করার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করব।' এসব বলে আর পাহারার মতো করে ঘিরে রাখে। মাঝে-মাঝে একদল করে পাকিস্তানি সৈন্য মিলে আসে, বিহারিদের সঙ্গে হৈ হৈ করে—তখন আবার মিলে বাঙালিদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। কোয়ার্টার্স ছেড়ে পালায়-আবার ফিরে আসে। মাঝে-মাঝে কিছু সৈন্য বাঙালিদের বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা দাবী করে, দামি জিনিসপত্র উঠিয়ে নিয়ে যায়। আজিমের কোয়ার্টার্সেও একবার এই রকম হামলা হয়। সেবার ঘরে যা টাকা-পয়সা ছিল, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। তখন আজিম ঠিক করে নিজের কোয়ার্টার্সে থাকবে না। অন্য এক স্টাফের কোয়ার্টার্সে থাকতে শুরু করে। মিল চালু করতে আজিমের টালবাহানায় পাকিস্তানিরা ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। দেশের সর্বত্র কলকারখানা ঠিকমতো চলছে, উৎপাদন ঠিকমতো হচ্ছে—এসব দেখানো দরকার। অথচ আজিম স্থির করেছে—মিল সে চালু করবে না। পাকিস্তানি ও বিহারিদের ধোঁকা দেবার জন্য প্রাথমিক কিছু তোড়জোড় শুরু করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে কয়েকজন বাঙালি অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়—পাঁচ মে মিল বন্ধ ঘোষণা করে ঢাকা চলে যাবে।

পাঁচ মে সকালে আজিম কয়েকজন অফিসারসহ মিলের বাইরে যায়। মিলের স্টোর অফিসার সে সময় আসন্ন প্রসবা স্ত্রী নিয়ে মিল এরিয়ার বাইরে থাকত। পাঁচ মে খুব সকালে খবর আসে স্টোর অফিসারের বাসায় ডাকাতি হয়েছে। আজিম তাড়াতাড়ি কাপড় পরে সামান্য নাশতা খেয়ে সেখানে যায়। শামসুন্নাহারের সঙ্গে তার স্বামীর এই শেষ দেখা।

পরে যে আজিমরা মিলের পেছন দিকের এক গেট দিয়ে মিলে ফিরে এসে অফিসে গেছে, শামসুন্নাহার তা জানে না। বেলা প্রায় দশটার দিকে সে ছোট ছেলের গেঞ্জি খুলেছে তাকে গোসল করাবে বলে। যে ভদ্রলোকের বাসায় তারা ছিল, সেই এসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট রহমান সাহেবের চাকর বাইরে থেকে দৌড়ে এসে খবর দিল—মিলের মধ্যে মিলিটারি ঢুকেছে, বাড়ি বাড়ি দরজা ধাক্কা দিয়ে সবাইকে বের করছে। চারদিকে লোকজন ছুটে পালাচ্ছে। তখন মিসেস রহমান সবাইকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্য একটা বাসায় (এক বিহারি ফোরম্যানের খালি বাসা) খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। সে বাসার সদর দরজায় একটা তালা ঝুলছিল। এই তালাই পরে এদের বাঁচিয়ে দেয়।

শামসুন্নাহার জানতে পারে নি যে, আর্মি মিলের অফিস থেকে আজিম ও অন্যান্য বাঙালি অফিসারকে ডেকে মিল এরিয়ার ভেতরে যে পুকুরটি আছে, তার পাড়ে নিয়ে গিয়েছে। এই পুকুরের পাড়ে আজিম, অন্যান্য অফিসার ও শ্রমিক মিলে প্রায় তিনশো বাঙালিকে পাকসেনারা মেশিনগানে ব্রাশ ফায়ার করে মারে। শামসুন্নাহাররা সবাই যে বাসাটাতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে ছিল, সেটা এই পুকুর থেকে অনেক দূরে। কিছু দেখা বা শোনা যায় না। তাছাড়া সুগার মিলের বয়লারে এক ধরনের ঝিকঝিক শব্দ হবার দরুনও তারা গুলির শব্দ শুনতে পায় নি। এই বাড়িতে বসে শামসুন্নাহার ভাবছে, আজিম তো মিল এরিয়ার বাইরেই আছে। অতএব, সে নিরাপদ। ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা সবাই ঐ কোয়ার্টারের পেছনের ভাঙা (আগে থেকে ভেঙে রাখা হয়েছিল) বাউন্ডারি

দিয়ে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে আধ-মাইল দূরে এক গ্রামে যায়। দেখে চারপাশ দিয়ে লোকজন ছুটে পালাচ্ছে। মিলের ভেতরে গুলিবিদ্ধ এক লোককে তার আত্মীয়স্বজন বাঁশের ভারে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ গ্রামের লোকজনও ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। আরো মাইল খানেক হেঁটে বিলসরিয়া বলে এক গ্রামে আশ্রয় নেয় শামসুন্নাহাররা সবাই। এখানে দেখে মিলের এক অফিসার শওকত তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে এক গরিব গৃহস্থের বাড়িতে কোনমতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন গরুগাড়ি করে পাঁচ মাইল দূরে বিলমারিয়া নামে আরেকটা গ্রামে গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই বাড়িতে ওরা সবাই বারো দিন ছিল। শামসুন্নাহার এক কাপড়ে এই বারো দিন কাটায়। ছেলে খালি গায়ে। সেই যে গোসল করার আগে জামা খুলেছিল, সেই অবস্থাতেই পালাতে হয়েছিল। পায়ে জুতো লাগাবারও সময় পায়নি। শওকত জানত যে আজিমকে গুলি করে মারা হয়েছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সে শামসুন্নাহারকে বলতে পারে নি কথাটা। তবে মিলের বাইরে এসেও আজিমের কোন খোঁজ না পেয়ে এবং বিভিন্ন গ্রামীবাসীর কথাবার্তায় সন্দিগ্ধ হয়ে শামসুন্নাহার শওকতকে চাপ দিয়ে আসল খবর বের করে ফেলে।

শামসুন্নাহার জানত—বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে যুগীপাড়া গ্রামে তার নানাশ্বশুরের বাড়ি। একজন লোককে কিছু টাকা কবুল করে যুগীপাড়ায় খবর পাঠায়। যুগীপাড়া থেকে লোক এসে দুটো গরুগাড়ি ভাড়া করে শামসুন্নাহারদের নিয়ে রওয়ানা দেয়। অর্ধেক রাস্তা গিয়ে গরুগাড়ির গাড়োয়ানরা আর যেতে অস্বীকার করল। তখন টমটম ভাড়া করে খানিক গেল। এক নদীর পারে এসে টমটম ছেড়ে দিয়ে নৌকায় নদী পেরিয়ে হেঁটে গেল কতকদূর। এভাবে যুগীপাড়ায় পৌঁছায় ওরা। এখানে এসে শামসুন্নাহার দ্বিতীয় কাপড় পরে। ছেলের গায়ে জামা ওঠে। এখানে ওরা বিশ-পঁচিশ দিন থাকে।

রাজশাহীর রাণীনগরে শামসুন্নাহারের শ্বশুরবাড়ি। ওর শ্বশুর ইন্ডিয়ান রেডিওতে ছেলের খবর জেনে পাগলের মতো পুত্রবধূ, নাতি-নাতনীদের খোঁজ করে শেষমেষ যুগীপাড়ায় খোঁজ পান। ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে যুগীপাড়া থেকে শামসুন্নাহারদের আনিয়ে নেন। আবার কিছুদূর গরুগাড়ি, কিছুদূর নৌকা, কিছুদূর পায়ে হেঁটে শেষে টমটমে ওরা সবাই রাণীনগরে পৌঁছায়।

ওদিকে শামসুন্নাহারের বাবা-মা বরিশালে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন, তাঁরা ইন্ডিয়ান রেডিওতে জামাইয়ের খবর শুনে পাগলের মত হয়ে ঢাকা চলে আসেন। মেয়ের খোঁজ বের করতে তাঁদের অনেকদিন লেগে যায়। তারপর বি.আই.ডি.সিতে বলে-কয়ে একটা জীপ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন রাণীনগরে। সঙ্গে পাঠান বোনের ছেলেকে আর নিরাপত্তার জন্য এক বিহারি অফিসারকে।

রাণীনগর থেকে ঢাকা আসার রাস্তাও খুব সহজ ছিল না। জীপ রাণীনগর পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হয় নি। আত্রাই নদীর এপারে জীপ রাখতে হয়েছিল। শামসুন্নাহাররা নৌকায় নদী পেরিয়ে অনেক দূর হেঁটে তারপর জীপে ওঠে। গত মাসের মাঝামাঝি শামসুন্নাহার তার তিন ছেলেমেয়ে ও ছোট ভাই সালাহউদ্দিন এমনি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে অবশেষে ঢাকা এসে পৌঁছেছে।

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কারবালার ঘটনা কি এর চেয়েও হৃদয়বিদারক ছিল?

২ জুলাই
শুক্রবার ১৯৭১

গতকাল সন্ধ্যার পর ডাক্তাররা এসে পৌঁছেছেন। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছেন। পরশু দিন ট্রাঙ্কলে বলেছিলেন সকালেই রওয়ানা দেবেন। সে হিসেবে তাঁদের বিকেল তিনটে-চারটের মধ্যে এসে পৌঁছানোর কথা। দেরি দেখে আমরা সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। বিশেষ করে খুকুর যা অবস্থা। দেরির কারণ সম্বন্ধে বললেন, পথে বহু জায়গায় পাক আর্মি গাড়ি থামিয়ে চেক করেছে। উনি রাওয়ালপিন্ডিতে মিটিং করতে যাচ্ছেন শুনে এবং করাচি থেকে আসা মিটিংয়ের চিঠি দেখে ওঁকে সব জায়গায় ছেড়ে দিয়েছে। গতকালই ওঁর কাছ থেকে রাজশাহীর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছিল; কিন্তু সারাদিন ধরে পথের ধকলে ওদের সবার যা বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে—তাতে সে ইচ্ছে চেপে বললাম, 'আজ বিশ্রাম নিন। কাল সব শুনব।'

আজ সারাদিন ডাক্তার ব্যস্ত ছিলেন, পি.জি হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ নূরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করা, প্লেনের টিকিট ও যাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থা করার জন্য। সন্ধ্যার পর এসে বসলেন আমাদের বসার ঘরে। সঙ্গে সানু—ডাক্তারে স্ত্রী।

ডাক্তার বললেন, 'আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম ঢাকায় কিছু নেই। সব ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মিসমার করে দিয়েছে। কোনদিক থেকে কোন খবর পাবার উপায় নেই। শুধু ইন্ডিয়ান রেডিও, বিবিসি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া আর ভয়েস অব আমেরিকার খবর। তা সেসব খবর শুনে তো মাথা খারাপ। ঢাকার সঠিক খবর পেতে অনেকদিন লেগেছে।

'রাজশাহী ফল করে করে?'

'খুব সম্ভব তের কি চোদ্দ এপ্রিল। ভোরবেলা নদীর ধার দিয়ে পাক আর্মি শহরে ঢুকে পড়ল। সেদিনের স্মৃতি ভয়াবহ। টাউনের চোদ্দ আনা লোক বোধহয় পালিয়েছে, বাকি দু'আনা ঘরের দরজা-জানালা সেঁটে বসে ছিল। রাজশাহী টাউন সেদিন শ্মশানের মত দেখাচ্ছিল। পরে জেনেছি, পাক আর্মি পথের দু'পাশে সব জ্বালাতে জ্বালাতে শহরে ঢুকেছিল। বহু লোক মরেছে তাদের গুলিতে। ক'দিনের মধ্যেই পাকবাহিনী রাজশাহী শহরের পুরো কন্ট্রোল নিয়ে নিল। আমাদের সবাইকে বলা হল, কাজে জয়েন করতে, হাসপাতাল চালু করতে। আমরা প্রাণ হাতে করে হাসপাতালে যাতায়াত করতে লাগলাম।'

'হাসপাতলে রুগী ছিল?'

'মাঝে কিছুদিন ছিল না। কিন্তু হাসপাতাল আবার চালু করার পর রুগী আসতে লাগল। খালি জখমের রুগী।'

'জখমের রুগী?'

'হ্যাঁ। সাধারণ কোন রুগী বহুদিন হাসপাতালে কেউ আনে নি, এনেছে গুলি খাওয়া, বেয়নেট খোঁচানো, হাত পা উড়ে যাওয়া রুগী। আরো একরকম রুগী হাসপাতালে লোক আনত, তারা আমাদের জীবনে ব্যথা হয়ে আছে।'

ডাক্তারের গলা ভারি হয়ে উঠল, আমরা সবাই নীরবে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ডাক্তার প্রায় আর্তনাদের মতো স্বরে বললেন, 'ধর্ষিতা মহিলা। অল্প বয়সী মেয়ে থেকে শুরু করে প্রৌঢ় মহিলা, মা, নানী, দাদী—কেউ রেহাই পান নি। অনেক বুড়ি মহিলা বাড়ি থেকে পালান নি, ভেবেছেন তাঁদের কিছু হবে না। অল্প বয়সী মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরা থেকেছেন, তাঁদেরও ছেড়ে দেয় নি পাকিস্তানি

পাষণ্ডরা। এক মহিলা রুগীর কাছে শুনেছিলাম তিনি নামাজ পড়ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে টেনে রেপ করা হয়। আরেক মহিলা কোরান শরীফ পড়ছিলেন, শয়তানরা কোরান শরীফ টান দিয়ে ফেলে তাঁকে রেপ করে।'

ডাক্তার থমথমে মুখে চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। আমরা খানিকক্ষণ স্তম্ভিত, বাকহারা হয়ে বসে থাকলাম।

খানিকক্ষণ পর ডাক্তার আপন মনেই বললেন, 'যদি আল্লার অস্তিত্ব থাকে, তবে এই শয়তানের চেলা পাকিস্তানিদের ধ্বংস অবধারিত। আর যদি এরা ধ্বংস না হয়, তাহলে আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে।'

৩ জুলাই
শনিবার ১৯৭১

আজ ডাঃ এ. কে. খান রাওয়ালপিন্ডির পথে করাচি রওয়ানা হয়ে গেছেন ডাঃ নূরুল ইসলামের সঙ্গে। পাকিস্তান মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হয়েছে পিন্ডিতে। এঁরা দু'জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাউন্সিলের সদস্য। গেছেন মাত্র চার-পাঁচদিনের জন্য। তবু দুশ্চিন্তা হয়। ঠিকমত ফিরে আসবেন তো? কতোজনের গ্রাম থেকে ফিরে শহরে চাকরিতে জয়েন করতে অফিসে গেছে, আর বাড়ি ফেরে নি। তবে একটা ভরসার কথা, ডাঃ ইব্রাহীম করাচিতে রয়েছেন। ওখানকার জিন্না পি. জি. হাসপাতালে পোস্টেড। উনি এই মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও। এই মিটিংটা উনিই ডেকেছেন।

বিকেলে বাগানে চেয়ার পেতে বসে সানুর সঙ্গে এসব কথা বলাবলি করছিলাম। মাগরেবের আজান পড়তে সানু উঠে নিজের বাড়ির দিকে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীফের গাড়ি ঢুকল গেট দিয়ে। নেমেই মৃদুস্বরে বলল, 'ঘরে এস।' তার দুই চোখ চক্‌চক্‌ করছে কি এক চাপা উত্তেজনায় সারা মুখ লাল হয়ে আছে।

বেডরুমে ঢুকে শরীফ বলল, 'রুমীর চিঠি—'

রুমীর চিঠি! আমার হাত-পা কেঁপে সারা শরীর অবশ হয়ে এল। ধপ করে বিছানায় বসে পড়লাম। 'কই, কোথায়।'

শরীফ প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট চিরকুট বের করে আমার হাতে দিল, চেয়ে দেখলাম সেই প্রিয় পরিচিত হাতের লেখায় তিনটি ছত্র : আমি ভালো। মণি ভাইদের সঙ্গে আছি। এদের যা যা দরকার, সব দিয়ো।—রুমী।

'কোথায় পেলে? কে এনেছে?'

'সেই ছেলে দুটো। সেই শাহাদত আর আলম, গেল শনিবারে যারা বাঁকার বাসায় গিয়েছিল। ওরা আজ আমাদের অফিসে এসেছিল।'

'টাকা নিতে?'

'না। ওরা এখন ব্রিজ চায়।'

'ব্রিজ? সে আবার কি?'

শরীফ হাসল হা-হা করে। ওকে এরকম সুখী হয়ে হাসতে দেখি নি অনেকদিন। এমনিতেই রাশভারী স্বল্পবাক মানুষ। হাসেও মেপে মেপে। এই রকম খোলামেলা হাসি খুব কম সময়েই হাসতে দেখেছি ওকে।

শরীফ বুঝিয়ে বলল : খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশের সবকটা ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রিজ ও কালভার্ট ওড়ানোর ব্যাপারে কতকগুলো

তথ্য। ব্রিজের ঠিক কোন্ কোন্ পয়েন্টে এক্সপ্লোসিভ বেঁধে ওড়ালে ব্রিজ ভাঙবে অথচ সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর খুব সহজে মেরামত করা যাবে— তার বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশ। তাদের উদ্দেশ্য ভেতরে যতগুলো পারা যায় ব্রিজ আর কালভার্ট ভেঙে পাক সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ও চলাচল ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া।

'রুমী সম্বন্ধে মুখে কিছু জিগ্যেস কর নি? জায়গার নাম, কি করছে—'

'ওরা আগরতলার কাছাকাছি একটা জায়গায় আছে। ওটাকে ওরা নাম দিয়েছে দুই নম্বর সেক্টর। খালেদ মোশাররফ ওখানে সেক্টর কমান্ডার। ঢাকার বেশি ভাগ ছেলে ওইখানেই যায়। ঢাকা থেকে আগরতলার দিকটাই সবচেয়ে কাছে। রুমী ওখানে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে।'

'রুমী কবে নাগাদ আসবে কিছু বলেছে?'

'অত কথা জিগ্যেস করা যায়? যা লোকের ভিড় আর কাজের চাপ অফিসে!'

৫ জুলাই
সোমবার ১৯৭১

জামী স্কুলে যায় না, আমি প্রতি মাসে একবার গিয়ে তার মাইনেটা দিয়ে আসি। হেডমাস্টার খান মুহম্মদ সালেক সাহেব ব্যস্ত না থাকলে তাঁর সাথে, না হয় টিচার্স রুমে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে খানিক গল্প করে আসি। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চাকরি করেছি মাত্র দু'বছর। কিন্তু ঐ সময় গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যে হৃদ্যতা হয়েছিল, তা আজো অটুট রয়েছে।

আজ সালেক সাহেব একাই বসেছিলেন তাঁর ঘরে। ফলে বেশ সুযোগ পাওয়া গেল সেন্সরবিহীন কথাবার্তা বলার। একটু পরেই ফোন বেজে উঠল। সালেক সাহেব ধরে কথা বলতে লাগলেন, আমি চুপচাপ শুনে গেলাম। কোন অভিভাবকের সঙ্গেই হচ্ছে বোঝা গেল। সালেক সাহেবের কথাগুলো এরকম :

'জি হ্যাঁ স্কুল তো খোলাই। টিচার, দপ্তরী, দারোয়ান সবাই তো হাজির।'

'জি, জি, রোজই আসছে। আজো তো পঁয়তাল্লিশজন ছাত্র স্কুলে এসেছে।'

'না না, এক ক্লাসে হবে কেন? আঠারোটা ক্লাসে।'

'পাঠাতে চাইলে নিশ্চয় পাঠাবেন। পথের দায়িত্ব আমরা নেই কি করে বলুন? স্কুলের গেটের ভেতর ঢুকলে, তার পরে দায়িত্বটুকু আমাদের।'

আরো খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন, 'জি হ্যাঁ, জি না, হ্যাঁ হ্যাঁ—' করে গেলেন। তারপর ফোন রেখে হাসলেন, 'বেচারী গার্জেন! কিছুতেই ডিসিশান নিতে পারছেন না। ছেলে পাঠাবেন কি পাঠাবেন না। ঘরে রাখার মতো মনের জোর নেই, স্কুলে পাঠাবার মতও দাপট নেই এ যেন সেই মাথায় রাখলে উকুনে খাবে, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে।'

সালেক সাহেবের স্ত্রী-পুত্রকন্যারা কেউ কোয়ার্টার্সে থাকে না, একেকজনকে একেক জায়গায় রাখার বন্দোবস্ত করেছেন। ক্লাস নাইনে পড়া একটি মাত্র ছেলে ওঁর সঙ্গে থাকে। হেসে বললাম, 'অন্তত দেখাবার মতো একটি কুমির ছানা সঙ্গে রেখেছেন।'

'কি করব বলুন। সরু চুলে বাঁধা ডেমোস্থিনিসের খাঁড়া ঝুলছে মাথার ওপর। তাই একটু সাবধানে থাকতে হয়। রাতে বাসায় থাকি না। তবে কেয়ারও করি নে। হায়াত যদ্দিন আছে, কেউ মারতে পারবে না। সুতরাং আগে থেকেই মরে কি লাভ?'

একটু পরে জিগ্যেস করলেন, 'জামী কেমন আছে? ও বাড়িতে ঠিকমতো পড়াশোনা

করছে তো? দেখবেন যেন ঢিলা দিয়ে সব ভুলে খেয়ে বসে না থাকে। স্কুল বয়কট করা যেমন দরকার, বাড়িতে বসে স্কুলের পড়াটা ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়াটাও তেমনিই দরকার।'

বাড়ি ফিরে দেখি সাদ আর গালেব রুমীর খাটে বসে দাবা খেলছে। জামী খাটের পাশেই মেঝেতে বসে খাটের ওপর কনুই রেখে খেলা দেখছে। বারেককে ডেকে চা-নাশতার কথা বলে আমিও খাটের অন্য পাশে কনুই রেখে মাটিতে বসলাম ওদের খেলা দেখবার জন্য।

৭ জুলাই
বুধবার ১৯৭১

গত তিনদিন ধরে বাঁকা আর শরীফের নাওয়া-খাওয়া বলে কিছু নেই। সারা দেশের সবগুলো ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা বানানো মুখের কথা নয়। প্রথমত, রোডস এন্ড হাইওয়েজ-এর ডিজাইন ডিভিশন থেকে ব্রিজের ফাইলগুলো বের করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ডিজাইন ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সামাদ শরীফের খুব ভক্ত। সরকারি চাকরিতে শরীফ যখন ডিজাইন ডিভিশনে ছিল, তখন সামাদকে সে ডিজাইন অফিসের জন্য গড়ে পিঠে তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু ফুলের বোঁটায় কাঁটার মতো সামাদের সঙ্গে কাদের খানও শোভা পাচ্ছে—ডিজাইন ডিভিশনের অবাঙালি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তার সন্দেহ উদ্রেক না করে অফিস থেকে ফাইল সরানো যায় কিভাবে? বাঁকা, শরীফ আর মঞ্জুর একত্র হয়ে অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক করল, চীফ ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান সাহেবকে ধরতে হবে। মশিউর রহমান সাহেব কাদের খানকে বললেন ব্রিজের ফাইলগুলো তাঁর অফিসে দিয়ে যেতে। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে ফাইল গেল সামাদের বাসায়। তারপর শরীফ আর বাঁকার দীন-দুনিয়া নেই। ৩,৫০০টি ব্রিজ আর কালভার্ট। সে সবের তালিকা বানানো কি চাট্টিখানি কথা? আবার বেশি লোক জানাজানি হলে চলবে না। সামাদের বাসায় বসে বসে বাঁকা নিজের হাতে ফাইল থেকে তালিকা কপি করেছেন। শরীফ বিভিন্ন টাইপের ব্রিজের ড্রয়িং করিয়ে প্রত্যেকটির স্পেসিফিকেশান লিখেছে।

শরীফ ও বাঁকার হাতের লেখা যাতে চেনা না যায়, সেজন্য দু'জনের হাতে লেখা অংশগুলো অন্য একজনকে দিয়ে আবার কপি করানো হয়েছে।

এখন সব রেডি। এক বোঝা কাগজ গোল করে গুটিয়ে শরীফ আজ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ছেলে দুটি আজ-কালের মধ্যেই বাসায় আসবে ওগুলো নিতে। শরীফ ওদের বলে দিয়েছে ওদের পক্ষে ওগুলো হাতে করে অফিস থেকে বেরোনো রিস্কি। কারণ ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিসের ওপর আই.বি'র লোকেরা চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখে।

৮ জুলাই
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গত রাত থেকে জামী অসুস্থ। জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, নিশ্বাস নিতে শোঁ-শোঁ শব্দ, কষ্ট।

সন্ধ্যের মুখে আমি আর শরীফ বাগানে বসেছিলাম। দু'টি ছেলে গেট দিয়ে ঢুকে

ধীর পায়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। এদেরকে আগে কখনো দেখি নি, তবু একপলক তাকিয়েই চিনলাম। পরনে সাধারণ প্যান্ট-সার্ট, মাথার লম্বা চুল প্রায় ঘাড় অব্দি, গাল পর্যন্ত নেমে আসা জুলপি, প্রায় চিবুক ছোঁয়া ঝোলানো গোঁফ। দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী আর হাবিবুল আমল।

ছেলে দু'টি একটু হেসে আদাব দিল। শরীফ মৃদুস্বরে বলল, 'বস।' সামনের দুটো খালি বেতের চেয়ারে ওরা বসল। শরীফ বলল, 'সবই রেডি। বাসায় এনে রেখেছি। একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।'

শরীফ আমার দিকে তাকাতেই আমি উঠে ভেতরে গেলাম। ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম টেবিলটা পরিষ্কারই আছে, পাশের জানালার পর্দাও টেনে ঢাকা আছে। রান্নাঘরে গিয়ে কাসেমকে বললাম, 'গোটা চারেক শামি কাবাব আর দুটো চপ এখুনি ভেজে ফেল। ফ্রিজ খুলে রস-মালাইয়ের হাঁড়ি থেকে খানিকটা রস-মালাই একটা বাটিতে তুলে দিয়ে বললাম, 'ওগুলো ভাজা হলে এই মিষ্টিসুদ্ধ ট্রেতে সাজিয়ে কোয়ার্টার প্লেট, চামুচ, পানি সব দিয়ে ডাইনিং টেবিলে দিবি পনের মিনিট পর। আমি আর আসতে পারব না। বুঝলি?'

বাইরে বেরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কোন বাড়ির জানলায় কারো চেহারা দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাতেও কেউ নেই। শরীফকে বললাম, 'ডাইনিং টেবিলে বসো গিয়ে।'

ওরা তিনজন ঘরে গেলে আমি বাগানেই বসে রইলাম গেট পাহারা দিতে। বুক দুরু দুরু করছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গিয়ে বসতে, ওদের মুখ থেকে রুমীর কথা শুনতে। কিন্তু গেট ছেড়ে আমার যাবার উপায় নেই। জামীটাও অসুখ বাঁধিয়ে পড়ে থাকার আর সময় পেল না।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আমাদের উল্টোদিকের দুটো বাড়ির পরে রেজা সাহেবের ছেলে সাজ্জাদ এসে দাঁড়াল গেটে, 'খালাম্মা, একটা ফোন করব।' আমি বললাম, 'ফোন তো খারাপ।' ও চলে যেতেই দ্রুত পায়ে ঘরে গেলাম। এক্ষুণি কোথাও থেকে ফোন এলে মুশকিলে পড়ে যেতাম। দোতলায় উঠে বেডরুমের এক্‌স্‌টেনশান ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম এক ডায়াল করে। তারপর আবার বাগানে গিয়ে বসলাম। আমাদের সিঁড়িটা ডাইনিং রুমের ভেতর পুবের দেয়াল ঘেঁষে। নামার সময় পায়ের গতি শ্লথ করে ডাইনে আড়চোখে ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকালাম। শরীফ টেবিলে ড্রয়িংয়ের কাগজ মেলে তার ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মৃদুস্বরে কিছু বলছে, কানে এল দু'চারটে শব্দ। অ্যাবাটমেন্ট , পিয়ার, গার্ডার, বিয়ারিং। ছেলে দু'টি কাগজের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে এক মনে শুনছে।

সন্ধ্যারও অনেক পরে ছেলে দু'টি গোল করে গোটানো কাগজ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। আমার গলার কাছে কি যেন পাকিয়ে উঠল। এই কাগজের রোল হাতে নিয়ে বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো খুবই বিপজ্জনক। ওদের তাড়াতাড়ি ডেরায় পৌছানো দরকার। একটা প্রশ্ন করলেও দেরি হয়ে যাবে। বোবার মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা নীরবে মাথার কাছে হাত তুলে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

৯ জুলাই
শুক্রবার ১৯৭১

আজ সকালেই ড্রয়িং-ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র কিছু সরা-নড়া করে ব্যবস্থা বদলে দিলাম। ড্রয়িং ও ডাইনিং রুমের মাঝখানে দুটো রুম—ডিভাইডার আলমারি বসানো

আছে। ঘরের এ জায়গাটার প্রস্থ হল ষোল ফুট। আলমারি দুটো চার ফুট করে আট ফুট চওড়া। আলমারির দু'পাশের চার ফুট করে জায়গা খোলা। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে ড্রয়িং রুম, ডানদিকে ডাইনিং রুম। কোন লোক দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে তাকালেই ডাইনিং টেবিলসহ প্রায় পুরো ঘরটাই একনজরে দেখে ফেলবে। শরীফ, কাসেম, বারেক আর ড্রাইভার আমিরুদ্দি—এই চারজনে মিলে আলমারি দুটো ঠেলে সদর দরজার পাশে দেয়ালে লাগিয়ে দিল। এখন এদিকের দেয়াল থেকে শুরু করে ঘরের আট ফুট পর্যন্ত দুটো আলমারি দাঁড়িয়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে তাকালে ডাইনিং রুমটা আর দেখা যাবে না। এখন বাকি আট ফুটের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাইনিং রুমের দূরতম উত্তর-পশ্চিম কোণে যে চার ফুট চওড়া আলমারিটা ছিল, সেটা ঠেলে এনে ঘরের অপর পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হল। এখন এই আলমারি আর এ পাশের দুটো আলমারির মাঝে ফাঁক রইল চার ফুট। এখানে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দেবো। ব্যস, চমৎকার আলাদা দুটো ঘর হয়ে গেল। ড্রয়িংরুমের কেউই আর কোন মতে দেখতে পাবে না ডাইনিংরুমে কে কি করছে। আর একটা ছোট্ট সমস্যা রইল। রুম ডিভাইডার আলমারি দুটোর দু'দিকেই পাল্লা দেয়া। বসার ঘরের দিকে বই রাখার জন্য, খাবার ঘরের দিকে গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি রাখার জন্য। আর আলমারির পেছন দিক বলে কিছু নেই। কিন্তু অন্য আলমারির পেছন দিকটা একেবারে বার্নিশবিহীন পেছনদিকই বটে। সেটা আবার বসার ঘরের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে। এই পেছনে কিছু সাঁটা দরকার। মাঝখানের চার ফুট ফাঁকের জন্য পর্দার কাপড় কিনতে গিয়ে দোকানে খোঁজ করে একটা মোটা কাপড়ের টুকরো কিনে নিয়ে এলাম। ক্রিম রঙের মোটা কাপড়ের খানিক দূরে দূরে নানা রঙের পোশাক পরা নর্তকীর ছাপ দেওয়া। এই কাপড়টা ঐ আলমারির পেছনে বোমাকাঁটা দিয়ে সেঁটে দিলাম। পর্দার কাপড় কিনলাম খুব মোটা ঘননীল রঙের—ঘন কুচি ফেলার জন্য ডবল চওড়া কাপড় নিলাম। যাতে পর্দাটা বাতাসে উড়লেও ঘন কুচির দরুন দু'পাশ দিয়ে দেখা না যায়। এসব শেষ করতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। সারা দিন অন্য কোনো কাজ করি নি।

সব হয়ে গেলে দু'ঘরের চারটে পাখা ফুট স্পীডে ছেড়ে দিয়ে বসার ঘরে ঘুরে ফিরে বার বার করে দেখতে লাগলাম—কোনভাবে খাবার ঘরের ভেতর দৃষ্টি চলে কি না। না, একেবারেই দৃষ্টি চলে না। এত ঘন কুচিওয়ালা এত ভারি পর্দাও নড়ে না এত ফুল স্পীডের পাখার বাতাসে। খুব সন্তুষ্টি লাভ করলাম সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর। এখন যত খুশি প্রতিবেশীরা ফোন করতে আসুক, যখন খুশি আসুক।

১০ জুলাই
শনিবার ১৯৭১

ডাক্তার সহি-সালামতে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফিরেছেন। দুপুরে আমাদের সঙ্গে ভাত খাবার পর বসে বসে ওঁর করাচি-পিন্ডির ট্যুরের গল্প শুনলাম। করাচি পৌঁছে হোটেলে উঠেই ওঁরা দু'জনে ডাঃ ইব্রাহীমকে ফোন করেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের হোটেলে চলে গিয়ে প্রথমেই শুনতে চান ঢাকা এবং সারা পূর্ব বাংলার খবর। ডাঃ ইব্রাহিম ওঁদের দু'জনকে বলেন, মিটিংটা আমি ইচ্ছে করেই পিন্ডিতে ডেকেছি যাতে তোমাদের মুখ থেকে আসল খবর সব শুনতে পাই। এ কে খান, নূরুল ইসলামের মুখে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার

প্রকৃত অবস্থা জেনে ডাঃ ইব্রাহীম খুবই মর্মাহত ও বিচলিত হন। করাচিতে একরাত থেকে পরদিন ডাঃ ইব্রাহিমসহ ওঁরা দু'জন মিটিং করতে যান পিন্ডিতে।

চারটের দিকে বললাম, 'চলুন, সবাই মিলে কাওরান বাজার যাই। ঢেঁকি-ছাঁটা লাল বিরুই চাল কিনে আনি।'

ডাক্তার বললেন, 'চাল পরে কেনা যাবে। আগে টিউবওয়েল বসানোর কাজটা সেরে নিই।'

ঢাকায় কিছুদিন থেকে গুজব চলছে : মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ক্রমে ক্রমে সবগুলো পাওয়ার স্টেশন অচল করে দেবে। ঢাকা শহরে লাইট, পানি কিছুই থাকবে না। শরীফ কিছুদিন থেকেই ভাবনাচিন্তা করছে বাসায় টিউবওয়েল বসানোর কথা। আমাদের বাথরুমগুলোয় ইয়োরোপিয়ান কমোড, কিন্তু পানি ফ্লাশ করার সিস্টার্নটা সেকেলে। সাত ফুট উঁচুতে দেয়ালে বসানো। ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ দিয়ে পানি আসে। এগুলো বদলে তিন ফুট উঁচুতে লো-ডাউন বসানোর কথাও ভাবছে শরীফ। তাহলে ট্যাঙ্কে পানি না থাকলেও কোন সমস্যা হবে না। লো-ডাউনের ঢাকনা খুলে বালতি থেকে পানি ভরে ফ্লাশ টানা যাবে।

ডাক্তার রাজশাহী ফিরে যাবার আগেই বাসায় টিউবওয়েল বসানোর কাজ সেরে রাখতে চান। এবার উনি একাই ফিরে যাবেন। সানু খুকু লুনা ঢাকাতেই থাকবে। এনায়েতপুরে চিঠি লিখে দিয়েছেন খোকন ও মঞ্জুকে ঢাকা চলে আসার জন্য।

বিকেলে শরীফ ঢাকা ক্লাবে গেল টেনিস খেলতে, আমি মা'র বাসায়। সন্ধ্যার আগ দিয়ে বাসায় ফিরে দেখি বারেক-কাসেম দু'জনেই বাক্স বিছানা বেঁধে উধাও! কি তাজ্জবের কথা! জামী ওপরে ছিল, টেরও পায় নি। কপাল ভালো, খোলা খিড়কি দরজা দিয়ে কোনো চোর বা ফকির বাসায় ঢোকে নি।

১২ জুলাই
সোমবার ১৯৭১

বারেক-কাসেম পালিয়ে যাবার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল—ভালোই হল। এখন মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে-মাঝে আসবে। বাসায় কাজের লোক না থাকাই ভালো। পরশুদিন রাতে টেবিল লাগানো, খাবার গরম করা, খাওয়া শেষে টেবিল সাফ, থালাবাসন ধোয়া ইত্যাদি কাজে জামী-শরীফ দু'জনই সাহায্য করেছে। গতকাল রোববার ছিল, বাপবেটা দু'জনে মিলে বাজার করে এনেছে। রান্নাঘরের কাজেও হাত লাগিয়েছে। তাই ধকল টের পাই নি।

তবে এ বাসার যে একটা 'ব্যারাম' রয়েছে—অত্যধিক মেহমান আসা—আমার মেহমান, শরীফের মেহমান, জামীর মেহমান, বাবার মেহমান, এখন আবার নতুন আরেক ধরনের মেহমান—সকাল-দুপুর, সন্ধ্যা, রাত—তাদের মেহমানদারী করার পরিশ্রমটা গায়ে লাগে না কাজের লোক থাকলে। গতকাল রোববার তবু শরীফ-জামী চা বানানো, ট্রেতে করে এনে দেওয়া ইত্যাদি কাজে হাত লাগিয়েছিল বলে অতটা টের পাইনি। তাই গতকাল সন্ধ্যার মুখে মালু মিয়া হন্তদন্ত অবস্থায় পলাতক দু'জনকে ধরে আনলেও আমি বলে দিয়েছিলাম ওদের আর রাখব না। (মালু মিয়া গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের পিওন, বহু বছর ধ'রে কাজের ছেলে সাপ্লাই দেওয়া ওর একটা বাড়তি কাজ।)

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই 'এলে' গিয়েছি। পুরনো ঠিকে ঝি রেণুর মাকে খুঁজে বের করলাম। দু'বেলা ছুটো কাজের জন্য আবার ওকে রাখলাম। কাজ করে দিয়ে চলে

যাবে—এই ভালো। বাসায় কে এলো, কে গেল অত খেয়াল করবে না। শাহাদত আর আলমের সঙ্গে রুমীর কথা বলতে পারি নি—সেই দুঃখে ক'দিন খুব কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এখন সেই কষ্ট আর নেই। রুমী যেখানে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে, সেই মেলাঘর থেকে বিভিন্ন দিনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে জিয়া, মনু, দুলু, পরভেজ।

পারভেজ বলল, 'খালাম্মা ওদিকে কি যে এক চোখের অসুখ শুরু হয়েছে—'

আমি কথা শেষ করতে না দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এখানেও তো। গেল মাস থেকে। আমাদের চেনাজানা অনেকের হয়েছে। খুব কষ্ট। কপাল ভালো আমাদের বাড়িতে এখনো ঢোকে নি। তোমাদের ওদিক থেকেই নাকি এসেছে?'

নতুন খবরটা দিতে না পেরে পারভেজ হতাশ হয়ে মুখ বন্ধ করেছিল, এখন বলল, 'সবাই তো বলে এদিক থেকেই ওদিকে গেছে।'

'এখানে কি গুজব জান? খানসেনারা এটার নাকি নাম দিয়েছে জয় বাংলা চোখ ওঠা। ওদেরই নাকি বেশি হচ্ছে এগুলো। ওরা বলে 'বিচ্ছু' গেরিলাদের চেয়েও বেশি বিচ্ছু এই চোখ ওঠা।'

'সত্যি বিচ্ছু চোখ ওঠা খালাম্মা। এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তাকানো যায় না, খালি চুলকায় আর পানি প'ড়ে লাল হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, এখানকার খবরের কাগজগুলোতেও এ নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছে। ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস না কি যেন বলে। সারতে আট-দশদিন লাগে। ওষুধ দিলেও সারতে ঐ একই সময় লাগে। আসলে ওষুধে সারে না, একটা সাময়িক আরাম হয় মাত্র।'

'তবে হোমিওপ্যাথিক একটা ওষুধ আছে, খালাম্মা, শুরুতেই খেলে আর চোখ ওঠে না।'

'তাই নাকি? নাম জান ওষুধটার?'

'হ্যাঁ, বেলেডোনা সিক্স্।'

'ঠিক আছে পারভেজ। আমি বেলেডোনা-৬ কিনে রাখব। তুমি মেলাঘর ফেরত যাবার আগে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।'

১৫ জুলাই
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ এস.এস.সি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ট্রাট্টু এ বছরের পরীক্ষার্থী। কিন্তু সে পরীক্ষা দিচ্ছে না। বাঙালি ছেলেমেয়েরা যাতে এস.এস.সি পরীক্ষা না দেয়, তার জন্য মাসখানেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় কোথা থেকে কারা যেন গোপন ইস্তাহার বিলি করে যাচ্ছে—তাই নিয়ে মহল্লায় মহল্লায়, বাড়িতে বাড়িতে উত্তেজনা, আলাপ-আলোচনা, ভয়-ভীতি। পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের বাবা-মার মাথা খারাপ হবার যোগাড়। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে—ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে গেলে কেন্দ্রে নাকি বোমা মারা হবে।

অন্যদিকে, সরকারের তরফ থেকে পরীক্ষা দেওয়ার সপক্ষে প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে মাইকযোগে বলে বেড়ানো হচ্ছে : ছাত্রছাত্রীরা যেন 'দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায়' বিভ্রান্ত না হয়, তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষা বছর নষ্ট না করে। (পাকসেনারা যে গুলি মেরে কত মূল্যবান জীবন নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সে কথা তাদের মনে নেই।) পূর্ব পাকিস্তান কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমুদ্দীন, পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কমিটির

সভাপতি ফরিদ আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি মওলানা নূরুজ্জামান এবং তাদের মতো আরো বহু 'দেশদরদী, জনদরদী নেতা' ক'দিন ধরে পরীক্ষা দেওয়ার সপক্ষে বিবৃতি দিয়ে দিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বহুসংখ্যক রাজাকারকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ। রাস্তায় রাস্তায় টহল পুলিশের গাড়ি। রাজাকারগুলো এই সুযোগে বেশ প্রাধান্য পেয়ে গেল।

আজ ধলু ও চিশতী সপরিবারে ঢাকা আসছে ইসলামাবাদ থেকে—এক মাসের ছুটিতে। শরীফ গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে গেল পৌনে চারটেয়। জামীকে বাবার কাছে রেখে আমি পাঁচটার সময় মা'র বাসায় গেলাম। ধলুরা এল সোয়া পাঁচটায়। কতোদিন পরে দেখা। দু'বোনে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলাম। মা, লালুও কাঁদলেন। কিন্তু আমার কান্না যেন কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না। কেন? ওর মধ্যে কি রুমীর জন্যও কান্না মেশানো ছিল?

১৭ জুলাই
শনিবার ১৯৭১

গতকাল সন্ধ্যারও পরে ডাক্তারের ছেলে খোকন আর খোকনের ছোট খালা মঞ্জু এনায়েতপুর থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছে। ডাক্তার পরশুদিনই সকালে রাজশাহী রওনা হয়ে গেছে। অল্পের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে ওদের দেখা হল না।

আজ সকালে রান্নাঘরে তরকারি কুটতে কুটতে মঞ্জুর কাছে শুনছিলাম ওর ঢাকা আসার পথের আতঙ্কিত, লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনী।

মঞ্জুররা এনায়েতপুর থেকে যমুনা নদীর ঘাটে লঞ্চে ওঠে। লঞ্চ সিরাজগঞ্জ ঘাট ছুঁয়ে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর ঘাটে এসে থামে। এখানে মঞ্জুর এক দুলাভাই শাজাহান ঢাকা থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে গাড়িতে ঢাকা।

লঞ্চে থাকার সময় নদীর বুকে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যেটার কথা মনে করে মঞ্জু এখনো মাঝে-মাঝে শিউরে উঠছে।

'বুঝলেন আপা, সিরাজগঞ্জ ঘাট ছাড়ার পর হঠাৎ একটা আর্মি ভর্তি স্টিমার আমাদের লঞ্চের পাশ দিয়ে আসতে আসতে চিৎকার করে লঞ্চ থামাতে বলল। আমরা তো ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু। আর বুঝি কারো রক্ষা নেই। কিন্তু ওরা শুধু একজন লোককেই খুঁজছিল। সে হলো সিরাজগঞ্জ কওমী জুট মিলের এক ইঞ্জিনিয়ার। তাকেই ধ'রে নিয়ে গেল। অন্য যাত্রীদের কাউকে কিছু বলল না।'

'তুমি চিনতে ঐ ইঞ্জিনিয়ারকে?'

'না আপা, আমি কি করে চিনব? উনাকে ধ'রে নিয়ে যাবার পর লঞ্চের অন্য লোকেরা বলাবলি করছিল—তাই থেকে জানলাম। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল আর্মিগুলো যেভাবে ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করছিল, তা শুনে। ওরা বলছিল, 'তোমার মতো এরকম মশহুর আদমির এত ছোট লঞ্চে যাওয়া কি মানায়? এই দেখ, তোমার জন্য আমরা কতো বড়ো স্টিমার নিয়ে এসেছি।'

আমার বুক ফেটে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ঐ ইঞ্জিনিয়ারটি নিশ্চয় গোপনে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। ওর কপাল মন্দ, ব্যাপারটা কোনভাবে পাক

আর্মির কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস করে দেবার মতো দালাল, রাজাকারদের তো অভাব নেই দেশে। নাকি, দেশের কাজ করতে গেলে এভাবে জীবন দিতেই হবে? কপাল মন্দ বলছি কেন? এতো ঐ লোকটির জন্য গৌরবের কথা।

গৌরবের কথা?

হঠাৎ মনে হল দম আটকে আসছে। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন পাঁজর চেপে ধরেছে।

আর তরকারি কুটতে পারলাম না। বসার ঘরে এসে ডিভানে শুয়ে পড়লাম। মঞ্জুর ভয় পেয়ে জামীকে ডাকাডাকি করতে লাগল। আমি বললাম, 'ও কিছু না। শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। খাটনি বেশি হয়ে গেছে। রান্নার লোক নেই তো, তাই। একটু পরে ঠিক হয়ে যাব।'

১৮ জুলাই
রবিবার ১৯৭১

শরীফের দাঁতে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা ওর জন্য পিস্‌পাস্ রান্না করছিলাম। উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে ফকির এসে হাজির, 'ভাবী, ময়মুরব্বিদের দোয়া ছিল, তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।'

'কি ব্যাপার? কোথায় কি হলো?'

'জীবনে এই প্রথম চোখের সামনে গেরিলা অপারেশান দেখলাম।'

'বলেন কি? দাঁড়ান, দাঁড়ান এক্ষুণি শুরু করবেন না। চুলো থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে আসি।'

'বিকেলবেলা জিন্না এভিনিউতে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গ্যানিজের দোকানটা আছে না? ওইখানে কয়েকজন বিচ্ছু গুলি আর গ্রেনেড ছুঁড়ে কয়েকটা পুলিশ মেরে দিয়ে চলে গেল। উঃ, কি সাহস ছেলেগুলোর। একেবারে প্রকাশ্য দিবালোক, বুঝলেন?'

উত্তেজনায়, আনন্দে ফকিরের চোখ চক্‌চক্ করছে। সারা মুখ লাল টক্‌টকে। শরীফ দাঁতের ব্যথা ভুলে সোজা হয়ে বসে জিগ্যেস করল। 'আঃ আরেকটু খুলে বল না। কয়টা ছেলে ছিল? কিসে করে এসেছিল?'

'অত কি গুনেছি? দুটো তো দেখলাম হাতে স্টেনগান বা মেশিনগান ঐরকম কিছু একটা হবে। দোকানের ভেতরে ঢুকে গেল আর ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনলাম। একটা গ্রেনেডও ফাটিয়েছে। গাড়ি একটা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক গ্যানিজের সামনে তো দেখি নি। সামনে মনে হয় একটা মোটরবাইক ছিল, একটা ছেলেও যেন বসে ছিল বাইকটাতে।'

আমি বলে উঠলাম, 'একটা কথা যদি ঠিক করে বলতে পারেন! খালি 'মনে হয়' আর 'যেন!'

জামী বলল, 'মা তুমি কিন্তু চাচার ওপর অবিচার করছ। তখন মেশিনগান থেকে ব্রাশ ফায়ার হচ্ছে, পুলিশ মরছে। রাস্তার লোকজন ছুটে পালাচ্ছিল নিশ্চয়। তাই না চাচা? আপনি তখন কি করলেন? ছুটে পালাননি কোথাও?' ফকির সোফায় হেলান দিয়ে বললেন, 'পালিয়েছিলাম তো বটেই। ওরকম অবস্থায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে গোরস্থানে যাবার জন্য? গ্যানিজের দুটো দোকান পরে সিঁড়িঘর ছিল একটা সেইখানে ঢুকে সিঁড়ির নিচে লুকোই। আমার সঙ্গে আরো অনেকে।'

শরীফ আবার জিগ্যেস করল, 'ক'জন লোক মরেছে, জানতে পেরেছ?'

'না, ছেলেগুলো চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে আসি। তক্ষুণি তো

মিলিটারিতে ভরে যাবে জায়গাটা। তবে আসার সয় দেখলাম গ্যানিজের দরজার সামনে কয়েকটা মিলিশিয়া পড়ে আছে।'

এমন মুখরোচক বিষয়, আলাপ-আলোচনা করতে করতে কোথা দিয়ে দুই ঘণ্টা উড়ে গেল। গেরিলারা আজকাল বে-শ তৎপর হয়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও প্রায় প্রায়ই বোমা ফাটিয়ে যাচ্ছে এত কড়া পাহারা সত্ত্বেও। কি ক'রে করে ওরা? জানের ডর বলে কিছু নেই বোধ হয়। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য?'

রাত প্রায় দশটা। ফকিরসহ আমরা সবাই মিলে শরীফের জন্য রান্না করা পিস্‌পাস্ খেলাম খুব তৃপ্তি করে।

১৯ জুলাই
সোমবার ১৯৭১

মালু মিয়া আজ আবার বারেককে নিয়ে এসেছে। এ ক'দিনের কাজের ঠেলায় আমারও মন নরম হয়ে এসেছে। মালু মিয়ার কাকুতি-মিনতি এবং বারেকের মাফ চাওয়ার পর ওকে আবার ফিরিয়ে নিলাম। কাসেমের অন্য বাসায় চাকরি হয়ে গেছে, বারেকের হয় নি। জামী বলল, 'ভালোই হল। এই দুর্দিনে গ্রামে গিয়ে না খেয়ে মরত।' আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ বারেক না এলে তুমিও মরতে দাদার ডিউটি করতে করতে।'

পারভেজ এসেছে সন্ধ্যার পর। ও আগামীকাল রওনা দেবে। আমি আগেই বেলেডোনা-৬ কিনে রেখেছি অনেক কয়টা শিশি, আরো কিনেছি কয়েকটা নেইল কাটার, গোটা তিনেক সানগ্লাস। 'একটা সান গ্লাস, একটা নেইল কাটার রুমীর জন্য। বাকিগুলো তোমরা ব্যবহার করো। বেলেডোনা যখন যার লাগবে।' পারভেজকে দুশো টাকা দিলাম, 'একশো তুমি নিয়ো, একশো রুমীকে দিয়ো।'

এসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ গুলিগোলার শব্দে চমকে উঠলাম। পারভেজ বলে উঠল, 'কাছাকাছি কোথাও মনে হচ্ছে?' বলতে না বলতেই বাতি চলে গেল। আমি হেসে বললাম, 'ওই বুঝি শুরু হল। মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে চিন্তা করতে লাগলাম, গুলির শব্দটা ঠিক কোন জায়গা থেকে এলো? উত্তর-পূর্বদিক থেকেই তো মনে হচ্ছে। ওদিকে কোথায়? শরীফ বলল, 'কেন পি.জি. হাসপাতালে যাবার রাস্তাটায় পুকুরটার এপাশে যে পাওয়ার সাবস্টেশনটা আছে, ওখানে হতে পারে।'

জামী লাফ দিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ রেললাইন পার হয়েই ঐ যে মেইন রোডের বাঁ হাতে উঁচু দেয়াল আর কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা সাব-স্টেশনটা'—কথার মাঝখানেই জামী হঠাৎ 'ইয়া হু—' বলে এক চিৎকার এবং আরেক লাফ—'ঐটাকে ধানমণ্ডি সাব-স্টেশন বলে না? মার দিয়া কেল্লা! জয় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা।'

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে ধমকে উঠলাম, 'থাম্ থাম। অত চেঁচাস্ নে। কে কোথায় শুনে ফেলবে।'

পারভেজ উসখুস করে বলল, 'আমাকে এবার যেতে হয়।'

'আরেকটু পরে যাও। রাস্তায় অন্ধকারে কোথায় বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কে জানে?'

'না, অন্ধকারেই বরং সুবিধে। গুলির শব্দ তো শাহবাগের দিক থেকে এসেছে, আমি নিউ মার্কেটের দিক দিয়ে চলে যাই। কিচ্ছু হবে না খালাম্মা। এর চেয়ে ঢের বেশি ঝুঁকি নিয়ে আমরা চলাফেরা করি।'

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ বাতি জ্বলে উঠল। মনটা দমে গেল, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলল? তবে ভোল্টেজ খুবই কম, এত কম যে মোমবাতির মতো আলো।

রাতে ভাত খেতে খেতে আবার কারেন্ট চলে গেল। আমরা মোমবাতি জ্বেলে বাকি কাজ সেরে শোবার ঘরে গিয়ে রেডিও নিয়ে বসলাম। একটু পরেই ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠান শুরু হবে। আজকাল রেডিওতে ব্যাটারিই ব্যবহার করি সব সময়। কারণ কখন কোন জায়গায় বসে রেডিও শুনব, তার ঠিক নেই। বাড়ির সর্বত্র ইলেকট্রিক তার বয়ে বেড়ানো সম্ভব না। আর এখন তো কারেন্টই নেই।

আজ ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ঢাকার রাস্তায় পাকসেনা ও মুক্তিবাহিনী মধ্যে গান-ফাইট। বলে কি? একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ? গুলি বিনিময়? কই, আমরা তো ওরকম কিছু টের পেলাম না? গুলি গোলার শব্দ শুনেছি বটে তবে দু'দলে একেবারে গান-ফাইট হবার মত অত সাংঘাতিক বলে মনে হয়েছে কি?

জামী বলল, 'কি জানি হয়তো এখানে সামান্য হয়েছে, ঢাকার অন্য এলাকায় বেশি হয়েছে। আমরা বাড়ি বসে সেটা টের পাচ্ছি না।'

শরীফ বলল, 'আপাতত চারদিক বেশ সুমসামই মনে হচ্ছে। এটুকু ঠিক যে এখন অন্তত কোন গান-ফাইট হচ্ছে না। এখন শোয়া যাক। কাল খবর নেব কোথায় কি হলো।'

আমি বললাম, 'ভোয়া বি. বি. সি.র বরাত দিয়ে বলল। বি.বি.সি.তে আগেই বলেছে নাকি? আজ আমাদের বি.বি.সি. শোনা হয় নি। কিন্তু বি.বি.সি. বাংলা অনুষ্ঠান তো পৌনে আটটা থেকে সোয়া আটটা। ঘটনাটা তো ঔরকম সময়েই ঘটেছে। তাহলে?'

শরীফ বলল, 'কেন বি.বি.সি. ইংরেজি খবরেও তো দিতে পারে। বি.বি.সি. ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইংরেজি খবর বলে না? দেখি কাল খোঁজ নেব. আর কেউ শুনেছে কি না।'

রাতে ভালো ঘুম হলো না। উত্তেজনায় সারা শরীর মন চন্‌মন করছে। গুজব সত্যি হতে চলেছে নাকি? রাজধানী ঢাকা শহরে ইলেকট্রিসিটি থাকবে না। কিন্তু কাল দিনের আগে জানবার কোনো উপায় নেই।

১৩ জুলাই
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ সকাল থেকে পানি নেই। গত রাতে কারেন্ট না থাকার দরুন মিউনিসিপ্যালিটির পাম্প চালানো সম্ভব হয় নি—সেটা বোঝাই যাচ্ছে। বারেককে একটা ছোট বালতি হাতে ডাক্তারের বাসায় টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে পাঠালাম। নিচের বাথরুমে দুটো বড় বালতি, রান্নাঘরে কয়েকটা ডেকচি ভর্তি করে নিলাম। ট্যাপে পানি না আসা পর্যন্ত কোনোমতে রাঁধাবাড়া আর হাত-মুখ ধোয়ার কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

শরীফ অফিসে গিয়েই ফোন করেছে, 'শোনো, জামীকে পি.জি'র দিকে রাস্তায় যেতে বারণ করো। ধানমণ্ডি পাওয়ার সাব-স্টেশনের সামনে আর চারপাশে মেলাই মিলিটারি। পুরো জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে। রেললাইনের কাছ থেকে সব ট্রাফিক ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আমি তো গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়ে বলাকা-নীলক্ষেত হয়ে অফিসে এসেছি।'

'আর কোন খবর।'

'এখনো জানি না। জানলেই ফোন করব।'

ধলু আর চিশতী এসেছে সাড়ে ন'টার দিকে। রাজশাহীতে ট্রাঙ্কল করবে। লাইন পেতে পেতে এগারোটা বাজল। অনেকক্ষণ গল্প করা গেল ওদের সঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকেরা নাকি জানে না যে পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারিরা এত খুন-খারাবি করেছে। সরকারি প্রচার মাধ্যমের চমৎকার ব্যবস্থাপনার ফলে তারা জানে যে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয়রা হামলা করছে, দেশের ভেতরের কিছু 'গাদ্দার বাঙালি' তাদেরকে সাহায্য করছে, সেই জন্য পাকিস্তান আর্মি ভারতীয় দমন আর হিন্দু মারা কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

'বুবু, জানেন তো পশ্চিম পাকিস্তানিরা কি ভয়ানক রকম অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান। এটা আরো বেড়েছে '৬৫ সালের ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের যুদ্ধের পর থেকে। ইয়াহিয়া সরকার এই সেন্টিমেন্টটার সুযোগ নিয়ে এমন নির্লজ্জের মতো মিথ্যে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে কি বলব! তাছাড়া ওদিককার জনসাধারণও এমন কট্টর পাকিস্তান প্রেমিক যে, সরকার যা বোঝাচ্ছে, নির্বিচারে তাই বুঝে নিশ্চিন্তে দিন-গুজরান করছে।'

'ও দিকের লোকেরা কি বি.বি.সি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও অস্ট্রেলিয়া এসব শোনে না?'

"শোনে, কিন্তু বিশ্বাস করে না। ওরা সরকারের ছেলে ভুলানো ছড়া শুনেই সন্তুষ্ট।'

শরীফ আবার ফোন করল এগারোটার দিকে, 'কাল রাতে উলান আর গুলবাগ পাওয়ার স্টেশনে 'শর্ট সার্কিট' হয়েছে।

'আর শাহবাগে?'

'না, ওখানে ঠিকমত হয় নি।'

'উলান কোথায়? গুলবাগ?'

'উলান রামপুরার দিকে। গুলবাগ-খিলগাঁওয়ে। আরেকটা খবর : পরশু বিকেলে শুধু গ্যানিজে নয়। ভোগ-এও।'

'তাই নাকি? বাঃ বেশ তো। একই দল নাকি?'

'ঠিক জানি না। কেউ বলতে পারল না।'

'শোনো, বাসায় ফেরার পথে আজই লো-ডাউন কিনে নিয়ে এসো। কমোড ব্যবহার করা যাচ্ছে না তো। বালতি দিয়ে পানি ঢাললে ঠিকমত ফ্লাশ হয় না।'

'আনব। তুমি আহাদ মিস্ত্রিকে বিকেলে আসতে বলে দাও।'

চিশতীকে বললাম, 'তোমরা বাড়ি ফেরার পথে দুটো হারিকেন আর কিছু মোমবাতি কিনে নিয়ে যাও।'

লুলু এল একটার দিকে। বলল, 'কি কাণ্ড জানেন মামী? ধানমণ্ডি পনের নম্বর রোডে কাল রাতে কারা যেন একটা মোটরগাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ ভোরে ওখানে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মজা কি জানেন? যেই সূর্য উঠলো, অমনি লোকজন সব ফরসা!'

'কেন?'

'সূর্য ওঠার পর মিলিটারি আসবে। মিলিটারিরা তো বিচ্ছুদের ভয়ে নিজেই নিজেদের কারফিউ দিয়ে রাখে সারারাত!'

'তুই না আজিমপুর রোডে থাকিস। তুই ধানমণ্ডি পনের নম্বর রোডে খবর জানলি কি করে?'

'বারে, আমি রোজ ভোরে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই না?'

'লুলু, তুই কি উলান গুলবাগের কথা শুনেছিস আজ কারো মুখে? আর আমাদের পাড়ার ঘটনা?'

লুলু, অবাক হয়ে বলল, 'না তো। কেন কি হয়েছে?'

লুলুকে সংক্ষেপে বললাম, গতকাল রাতের ঘটনা আর সকালে শরীফের ফোনের কথা। 'তোর মামা এলে সব বিস্তারিত শোনা যাবে। বস্। খেয়ে যাবি।'

আড়াইটে বেজে গেছে। শরীফ এখনো আসছে না। ছটফট করছি। ও এলে তবেই শোনা যাবে উলান-গুলবাগের ঘটনার পুরো বিবরণ। ফোনে খোলাখুলি কথা বলা বিপজ্জনক। তাই 'শর্ট সার্কিট' শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

শরীফ এসে বলল, গেরিলারা ঐ দুটো পাওয়ার স্টেশনের ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়ে ঠিকমতো ভেগে গেছে। খানসেনারা একটাকেও ধরতে পারে নি। তবে বিস্ফোরণের পর থেকে ঐ দুই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে। ধরপাকড়, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, রামপুরা আর খিলগাঁও এলাকা নাকি খানসেনা দিয়ে গিজ্‌গিজ্ করছে। ওদিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটাও নাকি বিপজ্জনক।

আমার ভয় হলো, ধানমণ্ডি সাব-স্টেশনের দরুন মিলিটারি হামলা আমাদের বাড়ি পর্যন্ত গড়াবে না তো আবার? শরীফ বলল, 'মনে হয় না। আমাদের বাড়ি ও জায়গা থেকে বেশ দূরে—গলির ভেতরে। ওরা সাব-স্টেশনের চারপাশটা ঘিরে তল্লাশি করছে। ওখানে বিচ্ছুরা ভেতরে যন্ত্রপাতি বিশেষ নষ্ট করতে না পারলেও পুলিশ বেশ কয়টা মেরে দিয়ে গেছে।'

শরীফ তিনটে লো-ডাউন কিনে এনেছে। আহাদ মিস্ত্রি কাজে লেগে গেছে। অন্তত একটা লো-ডাউন আজকের মধ্যে লাগাতেই হবে। প্রথমে দোতলায় বাবার বাথরুমটায় কাজ শুরু হয়েছে। আহাদ এ পাড়ারই লোক, দরকার হলে ও রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতে পারবে।

ডাক্তারের টিউবওয়েলটা খুব মোক্ষম সময়ে বসানো হয়েছিল। আজ বড্ডো কাজে লাগলো। আমি তো সকালেই পানি আনিয়ে সেরেছি। বিকেলে দেখি, সব বাড়ি থেকে কলসি, বালতি, জগ সারে সারে চলছে ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

দিনের বেলা ডোমেস্টিক অর্থাৎ লাইট ফ্যানের লাইনে দু'একবার কারেন্ট এসেছিল অল্পক্ষণের জন্য। পাওয়ার লাইন একেবারেই ছিল না। সন্ধ্যার পর সব লাইন চলে গেল। সারা ঢাকা শহর নিকষ কালো।

বিকেলেই তাড়াহুড়ো করে চারটে হারিকেন কিনে আনা হয়েছে। দোকানে শরীফ আর জামী গিয়েছিল। এসে বলল, 'হারিকেন আর মোমবাতি কেনার জন্য দোকানে যা ভিড়! সবাই কিনছে। দোকানীরা এই সুযোগে দামও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

২২ জুলাই
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

দুপুরে খেয়ে একটু শুয়েছিলাম। কলিং বেলের শব্দে উঠে দরজা খুলে দেখি, মনু।

'উঃ খালাম্মা, গোটা শহর পানির তলায় ডুবে গেছে। এমন বৃষ্টি দেখি নি।'

'আমাদের ঘরের ভেতরেও তো পানি ঢুকেছিল। মেঝের ওপর এক ফুট। রাস্তায় ছিল কোমর সমান। এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগে রাস্তার পানি নেমেছে।'

মনু ঘরের চারদিকে এলোমেলো জিনিসপত্রের দিকে তাকাল, 'তাই? ভালোই হয়েছে খালাম্মা। এই রকম বৃষ্টিতে খানসেনারা খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে। একেতো ওরা এই রকম বড় বড় নদী, বিল, হাওড়, দেখেই নি, তার ওপর এই রকম একনাগাড়ে তোড়ে বৃষ্টি। ঢাকা শহরে রাস্তায় এক-কোমর পানি। ওদের দেশে তো ড্রেনের মতো খালে একহাঁটু পানি জমলে ওরা ডুবে মরে!'

সবাই মিলে খুব হাসলাম। তারপর আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এখন থেকে একটু বেশি সাবধানে থেক মনু। গভর্নমেন্ট তো রাজাকারদের অনেক ক্ষমতা দিয়ে দিল। সামরিক আইন আদেশ-১৫৯ জারি করে ওদেরকে ইচ্ছে মতো গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদেরকে পাইকারি হারে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহ হলেই যে-কোনো লোককে ওরা গ্রেপ্তার করতে পারবে। গুলি করতে পারবে।'

শরীফ একটু হেসে বলল, 'এসব ক্ষমতা রাজাকারদের প্রথম থেকেই দেওয়া ছিল। এখন একটা সামরিক আইন আদেশের ঘোষণা দিয়ে হালাল করে নিল বলতে পার।'

মনু বলল, 'পাকিস্তান সরকার এখন বেশ ঘাবড়ে গেছে। ঢাকা শহরে রোজই দিনে-রাতে বিচ্ছুরা একটা-না-একটা কিছু করেই যাচ্ছে। তাছাড়া সারাদেশের বর্ডার জুড়ে যুদ্ধও তো বেশ জোরেশোরে চলছে। কিছু কিছু বর্ডার এলাকা মুক্তও হয়ে গেছে। কাজেই সরকার এখন শুধু রাজাকার কেন, আরো যদি কিছু বাহিনী বানাতে পারে, তাও বানাবে।'

'কেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর পরিমাণে মিলিশিয়া আনছে না? ঐ যে কালচে ছাই রঙের সালোয়ার কামিজ পরা সৈন্যগুলো?'

'হ্যাঁ, ওগুলোয় তো সারাদেশ ছেয়ে গেছে।'

মনু আসাতে একটু ভালো লাগল। কিছুদিন থেকে মনটা কোনমতেই বাগে থাকছে না। সবসময় মন খারাপ, একটু কিছু হলেই লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে কান্না, যখন-তখন পাঁজরে ব্যথা। কিছুদিন থেকে আরেকটা কথা সবসময় মনে জাগছে : 'অন্য ছেলেরা প্রায় প্রায়ই ঢাকা আসছে কত রকমের ডিউটি নিয়ে। রুমী কি একবার আসতে পারে না?'

মনু বলল, 'আসবে, খালাম্মা আসবে। ওর ট্রেনিং হয়ত এখনো শেষ হয় নি। ওতো অনেক দেরিতে গেছে।'

তা বটে। রুমীর যাওয়াতে আমিও তো বাদ সেধেছি প্রথমে দিকে।

মনু আগামীকাল ফিরে যাবে। ওর হাতে দুশো টাকা দিলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের এখন টাকার খুব দরকার। যখন যার হাতে পারছি পাঠাচ্ছি। পারভেজ নিয়ে গেছে। টাট্টুর সঙ্গে দু'বারে দুশো পাঠিয়েছি। টাট্টুর মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে রাজু বলে এক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। তার হাতেও কয়েকবার দুশো পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েছি। আমাদের নিজেদের টাকা বেশি নেই। কিন্তু আল্লাই টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শরীফের অনেক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু, পাকিস্তান কনসালট্যান্টস-এর ডিরেক্টর মজিদ সাহেব শরীফকে বলেছেন : তাঁর দুটি মাত্র মেয়ে, বিয়ে-শাদি হয়ে তারা বিদেশে আছে। তাদের জন্য তিনি যথেষ্ট দিয়ে দিয়েছেন। এখন কিছু টাকা তিনি দেশের জন্য খরচ করতে চান। মজিদ সাহেব স্থির করেছেন, দশ হাজার টাকা তিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্য খরচ করবেন। কিন্তু তাঁর কোন সোর্স নেই পাঠাবার। তাই শরীফকেই অনুরোধ করেছেন। তিনি সেভিংস সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে দু'বারে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা শরীফের হাতে তুলে দিয়েছেন। শরীফ এ টাকা ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু করে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধার হাত দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা নিয়েছে। ছেলেরাও এক সঙ্গে বেশি টাকা সঙ্গে নেবার ঝুঁকি নিতে চায় না। তার চেয়ে যখনই আসবে, অল্প অল্প করে নিয়ে যাবে।

মজিদ সাহেব শরীফকে একটি শর্ত দিয়েছেন : তাঁর এ টাকা দেওয়ার কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলা যাবে না। শুধু তিনি আর শরীফ জানবেন। শরীফ রাজি হয়েছে। শরীফ অবশ্য আমাকে বলেছে। তবে নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে বলাটা বোধ হয় শর্তভঙ্গের মধ্যে পড়ে না।

তিনটে বাথরুমে লো-ডাউন লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। আহাদ মিস্ত্রি আজ থেকে ভেতরের উঠানে টিউবওয়েল বসাচ্ছে।

২৪ জুলাই
শনিবার ১৯৭১

আজ আহাদ মিস্ত্রি টিউবওয়েল বসানো শেষ করল, আর আজই দুপুর থেকে ডাইরেক্ট ট্যাপটাতে চিরচির করে একটু একটু পানি আসা শুরু হলো। বিকেলের মধ্যে পাওয়ার লাইন ঠিক হয়ে গেল।

লাইট পানি আসাতে খুব আরাম লাগছে বটে কিন্তু মনে মনে কোথায় যেন একটা আশাভঙ্গের খচ্‌খচানি। ঢাকার মতো জায়গায় কারেন্ট থাকবে না, বিজলিবাতি জ্বলবে না, ট্যাপের পানি পাওয়া যাবে না, হারিকেন জ্বালিয়ে রাতে কাজ চালাতে হবে, টিউবওয়েল টিপে পানি নিতে হবে—এই রকম একটা পরিস্থিতির সম্ভাবনায় মনটা কি ২৫/৩০ বছর আগের শৈশবকালে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল ?

ক'দিনের এলোপাতাড়ি খাটুনিতে শরীরটা বড্ডো কাহিল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে-মাঝে শুয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। ড্রয়িংরুমের ডিভানটায় শোয়া যায় বটে কিন্তু মেহমান থাকলে তা আর সম্ভব হয় না। তাই আজ ডাইনিং টেবিল আর সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট চৌকি পেতে ফেললাম। তোষক বিছিয়ে সুন্দর একটি ফুলতোলা বেড কভার দিয়ে ঢেকে দিলাম। এইবার ঠিক হয়েছে। বাইরের ঘরে মেহমান থাকলেও আমি রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে এখানে শুয়ে বিশ্রাম করতে পারব। এটার পায়ের দিকে সিঁড়ির পাশে পুব ঘেঁষে দুটো সোফাও রাখলাম। মনু, দুলু, পারভেজ, রাজু, টাট্টু, এরা আজকাল প্রায় প্রায় আসে। আজকাল এ পাশেই বসাই যাতে বাইরের ঘরে হঠাৎ কেউ এসে এদের না দেখে। কিছুদিন আগে একদিন পারভেজ জিগ্যেস করছিল : 'খালাম্মা, দুটো বাড়ির পরের বাড়িটার একটা ছেলে দেখি যখনি যাই বা আসি, আমাকে নানা কথা জিগ্যেস করে। আমি রুমীর কে হই, রুমী কোথায় গেছে—এই সব কথা।'

ঐ শোনার পর থেকে পারভেজ, মনু, জিয়া, রাজু সবাইকে বলে দিয়েছি—কেউ জিগ্যেস করলে যেন বলে ওরা রুমীর চাচাত ভাই।

মাসুম সেই মার্চে দেশে গিয়েছিল। আজ সন্ধ্যার পর হঠাৎ দেখি সে এসে হাজির বাড়ি থেকে। ওকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলাম। বাড়িটা বড্ডো খালি হয়ে গিয়েছিল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার বিশ্রামের চৌকিটাতে আরাম করে শুয়ে বললাম, 'এবার বল দেশের খবর। ২৫ মার্চের পর খাটুরিয়া, ডোমার—ওদিকে কি হয়েছিল ?'

খাটুরিয়া আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম, ডোমার—থানা।

মাসুম বলল, '২৫/২৬ মার্চ চিলাহাটি থেকে এক দল ই.পি.আর. খাটুরিয়ার ওপর দিয়ে সৈয়দপুরের দিকে মার্চ করে যায়।'

'কেন ?'

'সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবে বলে। খাটুরিয়ায় কয়েকটা বাঙ্কারও তৈরি করেছিল ওরা।'

'বাঙ্কার কেন ?'

'ওদের কাছে যা শুনেছিলাম—চিলাহাটি থেকে শুরু করে মাঝে-মাঝে ওরা বাঙ্কার বানাতে বানাতে আসছিল। যদি পরে সে রকম যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য।'

'যুদ্ধ হয়েছিল ?'

'ওই দলটা সৈয়দপুর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে নি। মাঝপথে দারোয়ানীতে পাক আর্মি যুদ্ধ করে হটিয়ে দেয় ওদের। দু'দিন পরে ওরা খাটুরিয়ার ওপর দিয়েই আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।'

'নীলফামারীর খবর জানিস কিছু?'

নীলফামারী মহকুমার দূরত্ব খাটুরিয়া থেকে বেশি নয়। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন নীলফামারীতে থাকেন। মাসুম বলল, 'ছয় এপ্রিল পর্যন্ত নীলফামারী মুক্ত ছিল। সাত তারিখে সকালে পাক আর্মি যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দেয়।'

জামী বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ মা? ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের আর সব জায়গাতেই কিন্তু প্রথম কিছুদিন মুক্তিযোদ্ধারাই দখল নিয়েছিল। বাংলাদেশের সবগুলো জেলা সদরে প্রথম দিকে পাক আর্মি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ছিল। তারপর তারা বেরিয়ে যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীকে হটিয়েছে। তারপর তারা জ্বালাও-পোড়াও করতে পেরেছে। তার আগে নয়।'

মাসুম বলল, 'আমরা তো ২৬ মার্চই আকাশবাণী, বি.বি.সি, ভয়েস অব আমেরিকা শুনে ভেবেছিলাম ঢাকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'আসলেও প্রায় তাই হয়েছিল। ঢাকায় যত বস্তি, যত বাজার, যত কাঁচা বাড়িঘর, সব পুড়িয়ে দিয়েছিল। নেহা বিল্ডিং পুড়িয়ে ছাই করা যায় না, তাই গোলা মেরে মেরে যতটা পেরেছিল ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার চুরমার করে দিয়েছিল। শহীদ মিনার এখনো ওইভাবে আছে। ওখানে 'মসজিদ' লেখা একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে। ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামিয়েছিল।' জামী বলল, 'মাসুম ভাই, রমনা রেসকোর্সের কালীমন্দিরটা কিন্তু নেই—ওটা গোলা দিয়ে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে ওখানকার মাটিটা পর্যন্ত সমান করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তুই আরো আগে ঢাকা এলে পারতিস।'

'কি করব। বাবা কিছুতেই আসতে দেবেন না। ওদিকে তখন গুজব—ঢাকার মিরপুর-মোহাম্মদপুরে বাস-কোচ থেকে বাঙালিদের নামিয়ে মেরে ফেলে। এখন আবার ওদিকে নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। সৈয়দপুরে এয়ারেপোর্ট তৈরি হচ্ছে। তাতে চারপাশের এলাকা থেকে লোক ধরে এনে এয়ারপোর্ট তৈরির কাজে লাগানো হচ্ছে। ওদিককার সব ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের ওপর হুকুম হয়েছে—নিজ নিজ এলাকার গ্রামগুলো থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্টসংখ্যক লোক পাঠাতে হবে। মাটিকাটা থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং বানানো, রানওয়ে তৈরি সমস্ত কাজই ওইসব লোকদের দিয়ে বিনা মজুরিতে করানো শুরু হয়েছে। পুরো অঞ্চলে একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রত্যেক চেয়ারম্যান গ্রামভিত্তিক নির্দিষ্টসংখ্যক লোক পাঠাতে বাধ্য। কোনো গ্রামে কামলা-মজুর সব পাওয়া না গেলে শিক্ষিত, সচ্ছল লোকদের মধ্য থেকে নিয়ে হিসেবে পুরো করে দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে কোন ছাড়াছাড়ি নেই। যে এলাকা থেকে যতগুলো মজুর পাঠাবার কথা, ঠিক ততগুলো পাঠাতেই হবে। তাতে যদি গ্রামে মোড়লকে বা তার ছেলেকে বা অন্য কোন শিক্ষিত লোককে নিতে হয়, তাহলে তাই নিতে হবে। এইবার বাবা একটু ভয় পেয়েছেন বলে ঢাকা আসতে দিলেন।'

'রাস্তায় কি রকম ভোগান্তি হলো? পৌঁছাতে এত দেরি হল যে?'

'দেরি হবার কারণ অনেক জায়গায় ব্রিজ নষ্ট। মুক্তিবাহিনী উড়িয়ে দিয়েছে। এক বাস ছেড়ে নৌকায় নদী পেরিয়ে অন্য বাস ধরা, বাসে ওঠার সময় আবার চেকিং। ঢাকা ঢোকার আগে থেকে আরো কড়া চেকিং—বাস থেকে নামিয়ে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে

বডি চেক করা—জিনিসপত্র সব নামিয়ে তন্নতন্ন করে চেক করা—প্রতিটি চেকপোস্টে একই ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত যে এসে পৌঁছেছি এতেই আল্লার কাছে হাজার শুকুর।'

জামী বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল, 'মনে হল যেন বেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে ঢাকার দ্বারে।' (জামী শৈশবকালে কিছুদিন বাফায় গান শিখেছিল!)

২৫ জুলাই
রবিবার ১৯৭১

সকালে নাশতা খাবার সময় বললাম, 'অনেক দিন আতাভাইয়ের বাড়ি যাওয়া হয় নি। মাসুম এসেছে, চল ওকে নিয়ে যাই।'

শরীফ বলল, 'ঐ সঙ্গে ফকিরের বাসাও ঘুরে আসব। ওকে ফোন করে দাওতো, যেন বেরিয়ে না যায়'

আতাভাই নারিন্দায় থাকেন, ফকির লারমিনি স্ট্রিটে।

ফোন করতেই ফকির বললেন, 'আজকে এদিকে না আসা ভালো। কাল সারারাত ধরে যাত্রাবাড়ির ওদিকটায় গোলাগুলি চলেছে। সকাল হতে হাটখোলার মোড় থেকে যাত্রাবাড়ী-ডেমরা ঐ এলাকায় কারফিউ দিয়ে রেখেছে।'

'তাই নাকি? কি বৃত্তান্ত—কিছু জানতে পেরেছেন?

'না, এখন বৃত্তান্ত জানতে বেরোনো খুব নিরাপদ হবে না। যাত্রাবাড়ী-ডেমরা এলাকায় বহুত ধরপাকড়, মারধর হচ্ছে। আমরা তো পাশেই—আমি অবশ্য ইচ্ছে করলে নবাবপুর রোডের দিক দিয়ে বেরোতে পারি কিন্তু আমার বউ বলছে, কি দরকার! অন্তত একটা ছুটির দিন বউ-বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে আরাম করলে হয় না?'

'করুন। আমরাও তাহলে তাই করি।'

আতাভাইকেও ফোন করে জিগ্যেস করলাম, 'রাতে গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন?'

উনি বললেন, 'শুনেছি প্রচুর। আমরা তো ভয় পেয়ে গেছিলাম—শেষ পর্যন্ত আমাদের পাড়াতেও শুরু হলো কিনা। কিন্তু এদিকে আর আসে নি।'

'গোলাগুলি কোনদিকে হয়েছে বলে মনে হয়?'

'শব্দটা তো যাত্রাবাড়ির দিক থেকেই এসেছে, মনে হয়। হাটখোলার মোড় থেকে ঐদিকে তো কারফিউ আজ।'

মনটা খুব চনমন্ করতে লাগল।

যাত্রাবাড়ির দিকে সারারাত গোলাগুলি। না জানি কি যুদ্ধ হয়েছে। কার কাছে, কেমন করে ঘটনার বিবরণ পাই?

২৬ জুলাই
সোমবার ১৯৭১

যাত্রাবাড়ির ঘটনা নিয়ে সারা শহরে তুমুল হৈচৈ। কাল থেকে কতোজনের মুখে যে কতোবার একই বৃত্তান্ত শুনলাম, তার হিসাব নেই। আমাদের সকলের আনন্দ আর উত্তেজনার আরো একটা বড় কারণ—সারারাত ধরে গুলিগোলাটা দুই দল খানসেনার মধ্যেই হয়েছে।

আসল ব্যাপারটা হল এই : যাত্রাবাড়ির রাস্তা দিয়ে সারারাত ধরে মিলিটারি ভর্তি বড় বড় লরি যাত্রায়াত করে। ওদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য রাত দশটার পর এই রাস্তা দিয়ে অন্য সব গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে। পরশু মাঝরাতে কয়েকজন বিচ্ছু পথের ওপর কয়েকটা ছোট সাইজের মাইন বসিয়ে দেয় কোন এক ফাঁকে। তাতে দুটো খানসেনা ভর্তি লরি উল্টে রাস্তার পাশের ঢালু জমিতে প'ড়ে যায়। রাতের অন্ধকারে শব্দ ও চিল্লাচিল্লি শুনে যাত্রাবাড়ি চেকপোস্ট থেকে পাক আর্মি ভাবে, ওখানে নিশ্চয় গেরিলারা কিছু করছে। অমনি তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তা শুনে খাদে-পড়া পাকসেনারা মনে করে ওগুলো 'মুক্তিদের' গুলি। তারাও তখন গুলি করা শুরু করে। এমনিভাবে খানসেনারা অমাবস্যার ঘোর কালো রাতের অন্ধকারে 'মুক্তি' ভেবে নিজেদের মধ্যেই—

আমরা যত শুনি, তত হাসি। কাগজে ভিয়েতনাম যুদ্ধের খবর প্রসঙ্গে মাঝে-মাঝেই 'সেমসাইড' কথাটা পড়েছি। এবার ঢাকাতেই সেমসাইড হলো।

২৭ জুলাই
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ ইমনের জন্মদিন। বেচারা এখনো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় নি। কি যে দুর্দিন যাচ্ছে আনোয়ারের পরিবারের ওপর দিয়ে।

সকালে ডলি আপাকে সঙ্গে নিয়ে ইমনের জন্য পুতুল কিনলাম। আরো দু'চারটে টুকিটাকি উপহারও কেনা হলো।

সাড়ে তিনটেয় ডলি আপা এসে আমায় তুলে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এককাপ চা নিয়ে জুত করে বসতেই দাদাভাই আর মোর্তুজা ভাই এলেন। এম. জি. মোর্তুজা এস্‌সো তেল কোম্পানির সিনিয়র এক্সেকিউটিভ্—শরীফের বন্ধু। তাঁর বড় ভাই এম.জি. মোস্তফা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার—মোর্তুজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দাদাভাই হয়ে গেছেন। সপ্তাহে কমপক্ষে চারদিন আমরা একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসা করি।

ঢুকেই দাদাভাই বলে উঠলেন, 'সাতটা তো বেজে গেছে। শুধু চা নিয়ে বসেছেন?'

আমি হকচকিয়ে তাকাতেই দাদাভাই হেসে ফেললেন, 'রেডিও কই? স্বাধীন বাংলা শুরু হয়ে গেছে না?'

স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান আমরা সবাই বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনি বটে, তবে অন্য কাজের ধকলে মাঝে-মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বাদ পড়ে যায়। দাদাভাই আর শরীফের বেলায় তা হবার যো নেই। জামীকে রেডিও আনতে বলে বললাম, 'এত তাড়া কিসের? এইটাই তো আবার সকালে রিপিট হবে।'

'সকালে ম্যাডাম, আমরা চাকরি করি। আপনাদের মতো ঘরে বসে আরাম করার কপাল নিয়ে জন্মেছি নাকি?'

মোর্তুজা জিগ্যেস করলেন, 'ভাবী ইমাম ভাই কই?'

'উনি একটা কাজে মা'র বাসায় গেছেন। এক্ষুণি এসে—'

কথা শেষ হবার আগেই বেল বাজল। শরীফ এসে গেছে।

রেডিওটা ডাইনিং টেবিলে রেখে আমরা চারধারে ঘিরে বসলাম।

আগস্ট

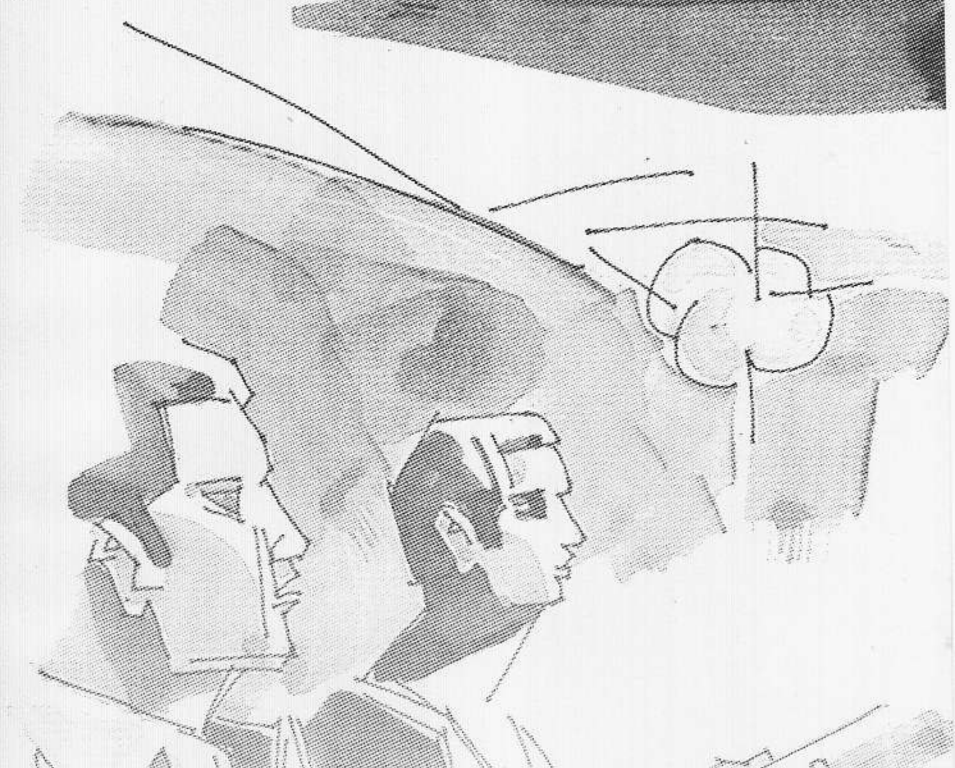

হাসপাতালে ওষুধপত্র নেই, আখতার ভাই একটা জীপে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে এক জায়গায় বর্ডার ক্রস করে ইস্ট পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে এক হাসপাতাল লুট করলো। ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, গজ-ব্যান্ডেজ সব একেবারে সা-ফ তুলে নিয়ে এলো। আবার, মজা করে রশিদ লিখে এলো—বাংলাদেশের সৈন্যদের জন্য এসব নেয়া হলো।

১ আগস্ট
রবিবার ১৯৭১

তিনজন মার্কিন নভোচারী, অ্যাপোলো-১৯ নভোযানে চড়ে কোটি কোটি মাইল মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে চাঁদের পিঠে নেমে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা, আমি যদি কোন রকম একটা টুটাফুটা আকাশযান পেতাম, যেটায় চ'ড়ে, মাত্র কয়েকশো মাইল দূরে মেলাঘর বলে একটা জায়গায় নেমে, মাত্র একপলকের জন্য আমার রুমীকে চোখের দেখা দেখে আসতে পারতাম!

রুমী গেছে আজ আটচল্লিশ দিন হলো। মনে হচ্ছে আটচল্লিশ মাস দেখি নি। একেক সময় মনে হয় রুমী বলে কেউ কি আছে? রুমী নামের কেউ কি ছিল কোনকালে? নাকি রুমী একটা অলীক মায়া?

আজ থেকে ডাঃ নূরুল ইসলামের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধ খেতে শুরু করেছি। উনি প্রথমে দেখে, রক্ত থেকে শুরু করে এক্স্-রে পর্যন্ত যত ধরনের পরীক্ষা আছে, সব করাতে বলেন। সে সবের রিপোর্ট দেখে তারপর ওষুধ দিয়েছেন। দিয়েছেন তো বটে কিন্তু আমি জানি ওসব ওষুধে কোন কাজ হবে না। আমার আসল ওষুধ আছে মেলাঘরে। সেই ওষুধ কে এনে দেয়!

বিকেলে কলিম এসেছে। তারও খুব মন খারাপ। নীলফামারী থেকে তার ছোট শালা পাওয়ার (লতিফুর রহমান প্রধান) ঢাকায় এসেছে সপ্তাহখানেক হল। সে খবর এনেছে পাক আর্মি তার বড় দুলাভাইকে মে মাসের শেষ সপ্তাহে মেরে ফেলেছে। এই খবর শুনে কলিমের বউ সেলিনা খুব কান্নাকাটি করছে। সেলিনার বড় দুলাভাই মকবুল হোসেন চিলাহাটিতে থাকতেন। খুব সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেলিনার বাবা-মা, পাওয়ারসহ অন্য দুই ছেলে নিয়ে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নীলফামারীতে নিজেদের বাড়িতেই ছিলেন। সে সময় নীলফামারীতে ই.পি.আর., ই.বি.আর, আনসার, মুজাহিদ ও স্থানীয় যুব সম্প্রদায় মিলে যে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তাতে সেলিনার বড় ভাই আবু (রাশিদুর রহমান প্রধান) একজন থানা কমান্ডার হিসেবে কাজ করছিল। এপ্রিলের সাত তারিখে পাক আর্মি নীলফামারী দখল করে নিলে এই প্রতিরোধ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আরো অনেকের সঙ্গে আবু ইন্ডিয়ায় চলে যায়। পাওয়ার তার মাকে নিয়ে কাছাকাছি একগ্রামে চলে যায়। বাবাও আলাদাভাবে ইন্ডিয়া চলে গিয়ে তিন মাস পরে নীলফামারীতে ফিরে আসেন। মাকে নিয়ে পাওয়ারও নীলফামারীতে চলে আসে। নীলফামারী থেকে ইন্ডিয়াতে প্রায় লোক যাতায়াত করে। লোকমুখে পাওয়ার খবর পেয়েছে যে আবু এখন স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করছে।

ডাক্তার এ. কে. খান এক মাসের ছুটি নিয়ে রাজশাহী থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন আজ সন্ধ্যায়।

৪ আগস্ট
বুধবার ১৯৭১

আজকাল দিনরাতগুলো একেবারে ঠাসা—ঘটনা দিয়ে, মেহমান দিয়ে, নানারকম পিলে-চমকানো শব্দ দিয়ে। ঐ পিলে-চমকানো শব্দগুলো কানে না এলে আমাদের

ভালোই লাগে না। রাতে ঐ শব্দ শুনলে তবে আমাদের আরামে ঘুম আসে। এটা শুধু আমার কথা নয়। দাদাভাই বলেন একথা, মোর্তুজা বলেন একথা, বাঁকা বলেন, ফকির বলেন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকেই হাসতে হাসতে বলেন, 'ভ্যালিয়ামের বিক্রি কমে গেছে। ঐ শব্দই আজকাল চমৎকার ঘুম আনে।'

কোন রাতে ঐ শব্দ না শুনতে পেলেই বরং আতঙ্ক জাগে—তবে কি ওরা—

না, ওরা ধরা পড়ে নি। সন্ধ্যারাতে যদিবা কোন কারণে মিস যায়, তো মাঝরাতে হঠাৎ বু-ম্‌ম্‌ করে বিরাট এক শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন স্নায়ুতে আরামের স্নিগ্ধ প্রবাহ বইয়ে দেয়।

ঢাকায় বিচ্ছুদের কাজ-কারবার ক্রমেই দুঃসাহসিক হয়ে উঠছে। এই তো গতকাল সন্ধ্যার আগে দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের গেটে, মিলিটারি পুলিশের নাকের ডগায়, পথচারীদের চোখের সামনে, কয়েকজন বিচ্ছু বোমা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। একটাকেও ধরতে পারে নি মিলিটারিরা। ছেলেগুলোর জানের ভয় বলতে কিছু নেই। গ্রেনেডের মতই জানটাকেও হাতের মুঠোয় নিয়ে চলে ওরা। স্বাধীন বাংলা বেতারে শুনি যুদ্ধক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করছে, তারাও এমনি অসম সাহসী। 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী'—জানের কোন পরওয়া নেই, 'জীবন-মৃত্যু, সত্যি সত্যিই ওদের পায়ের ভৃত্য।'

স্বাধীন বাংলা বেতারে গান বাজছে :

তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে।
আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে।

জীবন কাটে যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই ॥
ঘরবাড়ির ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই ॥
জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে।
আমি যে সাগর মাঝি রে ॥

ঘরবাড়ির ঠিকানাবিহীন, দিন রাত্রির বোধবিহীন, অথই সাগরে দিক্‌চিহ্নহীন জানবাজ ঐ নবীন মাঝিদের কথা মনে করে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

৬ আগস্ট
শুক্রবার ১৯৭১

আজ আমার জ্বর এসেছে। পরশু থেকেই একটু একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, ঠিক কেয়ার করি নি, রোজকার মতই ঘরের কাজ, বাইরের ছুটোছুটি—সব করে গেছি, শরীর তা সইবে কেন? দুপুরে খুকু এসে গোশত আর একটা নিরামিষ রেঁধে দিয়ে গেছে, বারেক কোনমতে ভাতের ফ্যান গালতে পেরেছে। আমি সারাদিন ডাইনিং রুমে আমার চৌকিটাতে। বিকেলে মা এসেছিলেন। 'এত ঘনঘন অসুখ হচ্ছে—তার আর দোষ

কি—' এই ধরনের কিছু একটা বিড়বিড় করে বলে কথা শেষ না করে চুপ করে গেলেন। মা সহজে মনের ভাব চাপতে পারেন না, মুখে খৈ ফোটে! কিন্তু আজ তিনি যেন নিজেই জোর করে নিজের মুখ বন্ধ করে রাখলেন। তবে কুঁচকানো ভুরু, টেপা ঠোঁট আর সর্ব অবয়বের কাঠিন্য থেকে আমার প্রতি তাঁর অসহনীয় অথচ নীরব অভিযোগ ও অভিমান ফুটে বেরুতে লাগল। তাঁর পেটের মেয়ে হয়ে তাঁর কাছে রুমীর কথা গোপন রেখে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মনের ভাব হালকা করছি না,—এটা তিনি চোখের সামনে দেখে যেন আর সইতে পারছেন না। আবার কিছু বলতেও পারছেন না আমার কঠিন নীরবতার কারণে।

৮ আগস্ট
রবিবার ১৯৭১

আজ জ্বর নেই কিন্তু শরীর এখনো বেশ দুর্বল। সকাল থেকে মেহমানের ভিড় বাড়িতে। একে একে এসেছেন দাদাভাই, মোর্তুজা, ফকির, নূরজাহান, মান্নান, শরীফের আরো দুই ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ওয়াহিদ ও মিকি, লালু, ডাক্তার, সানু, খুকু, অ্যাডভোকেট মোল্লা, চিশতী। এতগুলো মেহমান, সকাল ন'টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত—কিন্তু আলোচ্য বিষয় একটাই। গতকাল সন্ধ্যার পর ফার্মগেটের মিলিটারি চেকপোস্টে গেরিলা অপারেশন।

ফার্মগেটের মিলিটারি চেকপোস্টটা বেশ বড়সড়। ওখানকার ট্রাফিক আয়ল্যান্ডের মধ্যখানে দুটো তাঁবুতে অনেকগুলো মিলিটারি পুলিশ। কাছাকাছি ফুটপাতে লাইট মেশিনগান হাতে মিলিটারি। একটু দূরে গ্রীন রোডে ঢোকার মুখে মোড়ে একটা সিনেমা হল তৈরি হচ্ছে, সেটার মাথাতেও লাইট মেশিনগান হাতে এক মিলিটারি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার-স্যাপার। এই রকম মারাত্মক বিপজ্জনক জায়গায় বিচ্ছুরা যে কাণ্ডটি করল, সেটাও এলাহি কাণ্ড-কারখানাই বটে।

মোর্তুজা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'কি কাণ্ড দেখুন তো, কি বুকের পাটা! ওই রকম কড়া সিকিউরিটির মধ্যে দশ-বারোটা খানসেনা মেরে দিয়ে চলে গেল!'

দাদাভাই খুশির হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'তাও চোখের পলকে! এক মিনিটও লেগেছে কি না সন্দেহ।'

ফকির বললেন, 'ওদের কাছে নিশ্চয় মেশিনগান ছিল।'

মিকি—'অবশ্যই। ব্রাশ ফায়ার ছাড়া অত অল্প সময়ে অতগুলো শেষ করে পালানো যায়?'

শরীফ মুচকি হাসল, 'তা নইলে আর বিচ্ছু বলেছে কেন ওদের!'

নূরজাহান—'ধরা পড়েনি তো কেউ?'

মান্নান প্রায় ধমকে উঠলেন, 'কি যে বল তুমি? ওদের ধরা যায়?'

আমি বললাম, 'ওদের চোখেও দেখা যায় না। ক'দিন আগে চরমপত্রে এই নিয়ে বলেছে—জামী বল না।'

জামী বেশ ভালো ক্যারিকেচার করতে পারে, ওর স্মরণশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। মাঝে-মাঝেই ও চরমপত্র দু'চার লাইন আওড়ায়। এখন এতগুলো চাচা-চাচীর সামনে প্রথমে একটু লজ্জা পেল, তারপর চরমপত্রের গলা নকল করে বলতে লাগল : 'চাইর মাস ধইরা পাইট করনের পর হানাদার সোলজাররা তাগো কমান্ডার গো জিগাইছে মুক্তিবাহনীর

বিচ্ছুগুলো দ্যাখ্‌তে কি রকম? এই বিচ্ছুগুলা কি রকমের কাপড় পেন্‌দে? এই সব না জানলে কাগো লগে পাইট করমু? আর দুশমনগো খালি চোখে দ্যাখতে পাই না ক্যান?'

মনটা বেশ ফুরফুর করছে। সন্ধ্যায় মুখে বাগানে বসে শরীফ, ফকির, আমি গল্প করছিলাম। ফকির দুপুরে আর বাড়ি যান নি। আমাদের সঙ্গেই খেয়েছেন। গেটের সামনে রিকশা থেকে নামল লালু। একটু অবাক হলাম, সকালেই বেরিয়ে গেল, আবার এসেছে—কি ব্যাপার? কোন খারাপ খবর নয়তো? মনে হয় না, কারণ মুখ তার চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত। রিকশা থেকে নেমে দাঁড়াল না। 'বুবু একটু ভেতরে এসো' বলে সোজা ঘরে চলে গেল। আমি পিছু-পিছু উঠে এলাম। লালু খুব আস্তে বলল, 'রুমী এসেছে আমাদের বাড়িতে। শরীফ ভাইকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছে।'

হঠাৎ যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। চেয়ারে বসে পড়লাম। বাইরে ফকির রয়েছে শরীফের সাথে। মিনিট খানিক ঝিম মেরে বসে রইলাম, তারপর বাইরে বেরিয়ে বললাম, 'মার হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়েছে, তাই লালুকে পাঠিয়েছেন। ওকে টাকা দিলাম। তুমি একটু গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে এসো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

জামী হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'সারাদিন বাড়ি বসে আছি, আব্বু, আমিও একটু ঘুরে আসি তোমার সঙ্গে।'

ওরা দু'জনে লালুকে নিয়ে চলে গেল। আমি স্থির হয়ে বসতে পারছি না, মনে হচ্ছে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর গায়ে। কান, গলা, চোখ সব যেন গন্‌গন্‌ করছে। ফকির বোধ হয় কিছু আঁচ করে বললেন, 'সারাদিন বাড়ি ছাড়া আমিও যাই এবার।' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেলিয়ে হাত কপালে তুলে বললাম, 'আচ্ছা, খোদা হাফেজ।'

সদর দরজা বন্ধ করে একবার রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখলাম বাকের কি করছে। সে নিবিষ্ট মনে চুলোর সামনে কিছু একটা করছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে একটা দরজা আছে, এটা দিয়েও বাইরে বেরোনো যায়। এই দরজার কাছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, 'হে ঈশ্বর। এখন যেন কেউ বেড়াতে বা ফোন করতে না আসে।' বুক দুরদুর করছে। রুমী সোজা বাড়ি চলে এলেই তো পারত। এই প্রতীক্ষার উদ্বেগ আর তো সহ্য হয় না।

গাড়ির শব্দ পেলাম। গাড়ি এসে পোর্চে থামল। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিয়েই দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় বেড রুমে চলে গেলাম।

রুমী এসে ঢুকল ঘরে। রুমীর মুখভর্তি দাড়ি, চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, তামাটে গায়ের রঙ রোদে পুড়ে কালচে, দুই চোখে উজ্জ্বল ঝকঝকে দৃষ্টি, গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ফুটে রয়েছে সেই ভুবন ভোলানো হাসি। রুমী দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো, ওকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। রুমী ফিসফিস করে বলল, 'আম্মা, আম্মা, থামো। দাদা শুনতে পাবে। তোমার কান্না শুনলে ঠিক সন্দেহ করবে।' দরজার পর্দা পেরিয়েই সিঁড়ির সামনের চারকোণা মাঝারি 'হল'—সেখানে ইজিচেয়ারে বাবা শুয়ে থাকেন। শরীফ আর জামী একদৃষ্টিতে রুমীর দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। রুমীর একবার আমার, আরেকবার শরীফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে? কেমন তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর আগের দিনটাতে এসে গেলাম!'

একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'সোজা বাড়িতে এলি না কেন?' আবেগের উচ্ছ্বাস কমতেই কল্পনার চোখে ভেসে উঠল মায়ের মুখের বিজয়িনীর হাসি, সেই সঙ্গে না-বলা উচ্চকিত বাণী—'কেমন, এবার হল ত? আমাকে বলা হয় নি। এখন তো সব ফাঁস হয়ে গেল।'

রুমী বলল, 'কি জানি, ভয় পেলাম রিস্ক নিতে। যদি গলির মোড়ে কোন মিলিটারির সামনে পড়ে যাই, যদি সন্দেহ করে?'

মাসুম বাসায় ছিল না, সে যখন ফিরল, তখন আমাদের আবেগ প্রশমিত, রুমী দাদার সাতকাহন প্রশ্নের অলীক সব জবাব দিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে গোসল করতে।

আমরা স্থির করলাম মাসুমের কাছে সত্য গোপন করব না। করা সম্ভবও নয় এক বাড়িতে থেকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বিছানায় সবাই গোল হয়ে বসলাম। বললাম, 'এবার বল্ তোর কাহিনী।'

রুমী একটু হাসল 'কাহিনী যা, তা প্রায় রূপকথার মতই। মেলাঘরে গিয়ে দেখি— ঢাকার যত কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমণ্ডি-গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি হাঁকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরে বাপের ছেলেরা, সব্বাই ওখানে জড়ো হয়েছে। সবাই যুদ্ধ করবার জন্য গেছে। ওখানে গিয়ে আমার আগের চেনা কতো ছেলেকে যে দেখলাম! ঢাকা থেকে আগরতলার দিকেই এই বর্ডারটা সবচেয়ে কাছে বলে ঢাকার প্রায় সব ছেলেই এই রাস্তা দিয়ে বর্ডার ক্রস করে। তারপর সেক্টর টু'র ওপর দিয়েই অনেকে অন্য সেক্টরে চলে যায়। ঢাকা জেলা কিন্তু সেক্টর টু'র আন্ডারে, তাই আমরা বেশির ভাগ ঢাকার ছেলেরা সেক্টর টুতেই আছি। দেশের চারদিকের বর্ডার ঘিরে যুদ্ধ চলছে, বর্ডারের ঠিক ওপাশেই ভারতের মাটিতে আমাদের সেক্টরগুলোর হেড কোয়ার্টার্স। রেগুলার বাংলাদেশ আর্মির পাশাপাশি আমরা আছি গেরিলা বাহিনী।'

স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বি.বি.সি. থেকে এ সবই শুনে আসছি, কিন্তু সে যেন নেহাৎ শোনা কথা ছিল। বিশ্বাস করতাম, সত্য বলে জানতাম কিন্তু তবু যেন মন ভরত না। এখন রুমীর মুখে শুনে সমস্তটাই যেন একেবারে বুকের ভেতরে গেঁথে গেল।

খানিক পরে একটু উস্‌খুস্ করে রুমী বলল, 'আম্মা, আমি কিন্তু সিগারেট ধ'রে ফেলেছি। তোমাকে প্রমিস্ করেছিলাম না, যে ধরবার আগে জানাব? তা আর হলো না।'

মনে পড়ল, রুমীর যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখনই বলেছিলাম, 'দ্যাখ, সিগারেট যদি ধরিস তো বলে-কয়ে ধরবি। নইলে লুকিয়ে সিগারেট খাবি, আমি জানব না, তারপর আমার বান্ধবী এসে বলবে, রুমীকে সিগারেট খেতে দেখলাম— সে আমার সইবে না।'

রুমী বলেছিল, 'আম্মা, আব্বু যখন খায় না, খুব সম্ভব আমিও ধরব না। তবে যদি ধরিই, অবশ্য তোমাকে আগে জানাব।'

এখন রুমী হাসতে হাসতে বলল, 'ওখানে সিগারেট না ধরে উপায় নেই আম্মা। খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না অ্যাক্‌শানে গেলে, অনেক সময় না খেয়েও থাকতে হয়, কাছে-ভিতে কোন খাবারই জোটে না। এই সিগারেটটাই একমাত্র জিনিস, যা সঙ্গে রাখা যায়। আম্মা, তোমাদের সামনে খাব, না আড়ালে যাব।'

আমার চোখ পানিতে ভ'রে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসে— মাত্র ছ'মাস আগে আমাদের এই বাড়িতেই আমার সামনে সিগারেট ধরাবার অপরাধে ইশরাককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম। বন্ধুর অপরাধে রুমীকেও কম বকুনি খেতে হয় নি। এখন ধরা গলায় বললাম, 'না, সামনেই খা। অল্প ক'দিনের জন্য এসেছিস। সিগারেট খাবার সময়টুকুও তোকে চোখের আড়াল করতে চাই নে।'

রুমী একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আম্মা, ডক্‌কে তোমার মনে আছে? সেই যে গত বছর ডিসেম্বরে আমরা বরিশালের চরে রিলিফ ওয়ার্ক করতে গিয়েছিলাম—'

'মনে আছে। সেই যে নতুন পাস করা, নতুন বিয়ে করা ডাক্তারটা, আসল নাম আখতার আহমদ। তার কি হয়েছে?'

'সেই ডক্ সেক্টর টুতে আছে। তার বউ-ও।'

'বলিস কি? অদ্ভুত যোগাযোগ তো!'

'শুধু কি এইটুকু? আরো আছ। লুলু আপা, টুলু আপাও ওখানে।'

'ওরাও? ওরা ওখানে কি করছে?'

'সেক্টর টুতে একটা হাসপাতাল করা হয়েছে। ডক্ ওখানে ডাক্তার, খুকু ভাবী, লুলু-টুলু আপারা ওখানে নার্স।'

শুনে আমি চমৎকৃত। রুমীর কপালটা নেহাৎ ভালো বলতে হবে। অচেনা জায়গায় গিয়ে ওর কয়েকজন প্রিয় পরিচিত মানুষকে পেয়েছে। গত বছর নভেম্বরের গর্কির পর বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে একটি রিলিফের দল বরিশালের কয়েকটি বিধ্বস্ত চরে রিলিফ ওয়ার্ক করতে যায়। সে দলে ছিল সদ্য পাস করা ডাক্তার আখতার আহমদ (ডক্), রুমী, সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে লুলু ও টুলু, কাজী নূরুজ্জামানের স্ত্রী সুলতানা জামান ও দুই মেয়ে নায়লা এহমার ও লুবনা মরিয়ম, রেবা-মিনি ভাইয়ের বড় ছেলে জাহির এবং আরো অনেকে। এই রিলিফ ওয়ার্কের সময় থেকেই রুমী ওদের সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে ডক্, তার বউ খুকু, লুলু ও টুলুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

রুমী বলল, 'আরো কি মজা জানো আম্মা? আমি ঢাকা থেকে যাই ১৪ জুন, লুলু-টুলু আপারা অনেকে মিলে একটা বিরাট দল যায় ১৫ জুন। ১৩ জুন আমি ওদের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কাউকে যাওয়ার কথা বলি নি। আমরা যাই মনু ভাইদের সঙ্গে, ওদের দলকে নিয়ে যায় শাহাদত ভাই। ওরা সোনামুড়ার হাসপাতালে যায়। তিন-চারদিন পরে আখতার ভাই ওদেরকে নিয়ে মেলাঘরে বেড়াতে আসে, তখন নাটকীয়ভাবে ওদের সঙ্গে আমার দেখা?'

'আখতার কোন সময় ওদিকে যায়?'

'ক্র্যাকডাউনের পরপরই। আখতার ভাইয়ের কাহিনী তো আরো রোমাঞ্চকর। আখতার ভাই এ বছর জানুয়ারি মাসে আর্মিতে ডাক্তারের চাকরি পেয়েছিল। কুমিল্লায় ফোর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ওর পোস্টিং হয়েছিল। মার্চের মাঝামাঝি ঐ ফোর্থ ইস্ট বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি করা হয়। মেজর শাফায়াত জামিল, আখতার ভাই এঁরাও ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। আসলে এই বদলি করাটা পাকিস্তানিদের একটা ষড়যন্ত্র ছিল। খালেদ মোশাররফকেও মার্চের শেষে কুমিল্লায় ঐ ফোর্থ ইস্টবেঙ্গলে বদলি করা হয়। তার আগে খালেদ ভাই ঢাকায় কোন এক ব্রিগেডে, ব্রিগেড-মেজর ছিলেন। ক্র্যাকডাউনের ঠিক আগে আগে খালেদ ভাইকে তার কম্যান্ডিং অফিসার একটা ছুতো করে সিলেটের শামসেরনগরে পাঠিয়ে দিল। ওখানে নাকি নকশালা ভারত থেকে ঢুকে উৎপাত করছে। তাদের দমন করার জন্য এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে তাকে যেতে বলা হয়। খালেদ ভাই ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন পাকিস্তানিরা কিছু একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আঁটছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই কোম্পানি সৈন্য পাঠানো হয়েছে। আবার তাকে এখন আরেক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে শামসেরনগর যেতে বলা হয়। খালেদ ভাই বুঝতে পারছিলেন এভাবে ইস্টবেঙ্গল

রেজিমন্ট থেকে কোম্পানি এদিক-ওদিক সরিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। খালেদ ভাই একটুখানি সাবধান হয়েছিলেন। যার জন্য তাঁর জীবন বেঁচে যায়। তিনি মেইন রোড দিয়ে না গিয়ে অন্য একটা কাঁচা রাস্তা ধরে শামসেরনগর যান। গিয়ে দেখে কোথায় কি। নকশালদের চিহ্নমাত্র নেই। পরে জানতে পারেন মৌলভীবাজারের কাছে মেইন রোডের পাশে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সৈন্য লুকিয়ে ছিল খালেদ ভাইদের অ্যামবুশ করার জন্য।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হয়েছে কি—মেজর শাফায়াত জামিল, আখতার ভাই আর অন্য যাঁরা ছিলেন, সবাই জেনে গেছেন ঢাকায় কি হয়েছে, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কি হয়েছে। রাগে, উত্তেজনায় তাঁদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কাজেই ২৭ মার্চ সকালেই শাফায়াত জামিলের সঙ্গে আখতার ভাই আর অন্য সবাই রিভোল্ট করে ওখানকার পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করে ফেলেন। শাফায়াত জামিল আগেই আখতার ভাইকে একটা স্টেনগান ইস্যু করে দিয়েছিলেন লুকিয়ে—কারণ ডাক্তারদের অস্ত্র দেবার কোনো নিয়ম ছিল না। ওদিকে মেজর খালেদ মোশাররফও শামসেরনগর থেকে ফেরত এসে শাফায়াত জামিলদের সঙ্গে যোগ দেন।

'জানো আম্মা, আখতার যখন ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে, তখন কিন্তু সে খুকু ভাবীর কোনা খবরই জানত না। খুকু ভাবী কুমিল্লায় ছিল।' খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আখতার ভাই সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় চলে যায়। সেখানকার চা-বাগানে খালেদ ভাই ঘাঁটি করে। সেখানে নিত্যনতুন ছেলেরা জড়ো হতে থাকে ট্রেনিং নেবার জন্যে। খালেদ মোশাররফ আখতার ভাইকে বলে, 'তোমার তো এখন কোন কাজ নেই, তুমি আপাতত এই ছেলেদেরকে ট্রেনিং দিতে শুরু কর। ট্রেনিং কোম্পানি করা হল, আখতার ভাই তার কমান্ডার।' ক্যাপ্টেন হায়দারও কিন্তু ওইরকম সময়েই কুমিল্লা থেকে পালিয়ে তেলিয়াপাড়ায় চলে যায় পায়ে হেঁটে। তেলিয়াপাড়ায় সেকেন্ড বেঙ্গল আর ফোর্থ বেঙ্গলের বহু বাঙালি মিলিটারি অফিসার পালিয়ে গিয়ে জড়ো হয়। নাদিমের আব্বাও প্রথমে পালিয়ে এই তেলিয়াপাড়াতেই যান। মেজর জিয়াও তেলিয়াপাড়ায় গিয়েছিলেন খালেদ ভাইদের সঙ্গে মিটিং করার জন্য।

কিছুদিন পর খালেদ মোশাররফ যখন ভারতের ভেতরে সোনামুড়ায় তাঁর ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যায়, তখন আখতার ভাইও সেখানে যায়। খালেদ ভাই এবার তার ক্যাম্প হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নিতে বলে। ততদিনে বর্ডারে যুদ্ধটুদ্ধ বেশ হচ্ছে। দু'একজন করে মুক্তিযোদ্ধা জখমও হচ্ছে।

সোনামুড়ায় একেবারে বর্ডার ঘেঁষে শ্রীমন্তপুর বলে একটা বর্ডার আউট-পোস্ট আছে। সেইটার কাছে একটা স্কুলঘরে খালেদ মোশাররফ তার ক্যাম্প করেছে। পাশেই একটা গোয়ালঘর আখতার ভাইকে দেওয়া হল রুগী দেখার ব্যবস্থা করা জন্য। আখতার ভাই দুটো লম্বা তক্তা যোগাড় করে ঘরের দু'পাশে খুঁটির ওপর পাতল, একটা হল রুগীর বেড, অন্যটায় ওষুধপাতি, গজ ব্যান্ডেজ সাজিয়ে রাখাল। সেইটাই হলো সেক্টর টু'র সর্বপ্রথম এক বেডের ক্যাম্প হাসপাতাল।

পরে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা বড় ডাকবাংলোয় হাসপাতাল সরিয়ে নেয়া হয়। এখন হাসপাতাল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আরো অনেক ডাক্তার-নার্স এসে যোগ দিচ্ছে।

'খুকু কবে গেল?'

'আখতার ভাই শ্রীমন্তপুরে থাকার সময়ই কুমিল্লায় মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে খুকু ভাবীর

খবর বের করে। তারপর তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। সেটা এপ্রিলের মাঝামাঝি কি তার একটু পরে হবে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'সত্যি। রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর এসব কাহিনী। শুনে বড় ভালো লাগছে। তুই যে ওখানে গিয়ে আপনজন পেয়েছিস, তাতেই আমার শান্তি। তা সোনামুড়া মেলাঘর থেকে কতদূর? প্রায়ই যাস্ নাকি?'

'হাসপাতাল এখন আর সোনামুড়ায় নেই তো। জায়গাটা বর্ডারের খুব কাছে ছিল, ওখান থেকে দারোগা বাগিচা বলে একটা জায়গায় সরানো হয়। এখন বিশ্রামগঞ্জ বলে আরেকটা জায়গায় সরানো হয়েছে। এখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে বলে ঠিক হয়েছে। মেলাঘর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। আমি মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়ে যাই ওখানে।'

'কি রকম হাসপাতাল?'

'বেড়ার ঘরে বাঁশের মাচার বেড, তাতে খড়ের গদি। ডাক্তার, নার্সদের থাকার জায়গায়ও ওইরকম বেড়ার ঘরের মাচায় বেড। আখতার ভাই শুধু ডাক্তারিই করেন না, ফাঁক পেলেই স্টেনগান হাতে অ্যাকশনে বেরিয়ে যায়। একবার হলো কি, হাসপাতালে ওষুধপত্র নেই, আখতার ভাই একটা জীপে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে এক জায়গায় বর্ডার ক্রস করে ইস্ট পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে এক হাসপাতাল লুট করলো। ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, গজ-ব্যান্ডেজ সব একেবারে সা-ফ তুলে নিয়ে এলো। আবার, মজা করে একটা রসিদ লিখে রেখে এলো— বাংলাদেশের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য এসব জিনিস নেয়া হলো।'

'মেলাঘরে তোরা কিভাবে থাকিস? কি খাস? জায়গাটা কি রকম? গ্রাম? না আধাশহর?'

'গ্রামও না, আধাশহরও না, একেবারে পাহাড়ী জঙ্গলে জায়গা। টিলার ওপরে বেড়ার ঘরে, তাঁবুতে আমরা সবাই থাকি। খাওয়া-দাওয়ার কথা আর জিগ্যেস করো না। ওইটার কষ্টই সবচেয়ে বেশি।'

জামী ফোড়ন কাটল, 'হ্যাঁ, তুমি তো আবার একটু খেতে ভালোবাস!'

'কি খাবার দেয় সাধারণত?'

'ভাত আর ডাল। কখনো লাবড়া, কখনো মাছ। সকালের নাশতা রুটি আর ঘোড়ার ডাল।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'ঘোড়ার ডাল? সে আবার কি?'

'চোকলা-মোকলাসুদ্ধ এক ধরনের গোটা গোটা ডাল, নর্মাল টাইমে বোধ হয় ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়। আর রুটি? জানো আম্মা, কতোদিন সে রুটির মধ্যে সেঁকা পোকা পেয়েছি।'

'পেয়ে কি করতিস? রুটি ফেলে দিতিস?'

'ফেলে দেব? তুমি কি পাগল হয়েছো আম্মা? সেঁকা পোকাটা নখে খুঁটে ফেলে দিয়ে রুটি খেয়ে নিতাম।'

আমি একটা নিশ্বাস চাপলাম। এই রুমী! যে প্লেট বা গ্লাস আমার চোখে ঝকঝকে পরিষ্কার মনে হত, তার মধ্যেও সে এককণা ময়লা আবিষ্কার করতে ফেলত। আবার ধোয়াত। তার জন্য গমের আটা দু'বার করে চেলে নিতে হত। ডাল ধুতে হত যে কতবার, তার হিসাব নেই, কারণ রান্না ডালে একটা খোসা দেখলে সেই ডাল আর খাবে না।

'কিন্তু যাই বলো আম্মা, ঐ খাবার যে কি অমৃতের মতো লাগত। ওই খাবারও তো সব দিন জুটত না। কতদিন গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে খেয়ে থেকেছি। মাঠ থেকে তরমুজ, বাঙ্গী, আনারস এসব তুলে খেয়ে থেকেছি।'

'যুদ্ধ মানুষকে কি রকম বদলে দেয়। নইলে তোর মতো খুঁতখুঁতে পিত্‌পিতে ছেলে—'

রুমী হেসে ফেললাম, 'থাম! হয়েছে। এখন বল্ মেলাঘরে কি কি ট্রেনিং নিয়েছিস?'

'উঁহু, ওইটি বলা যাবে না। শুধু এটুকু জেনে রাখ ক্যাপ্টেন হায়দার আমাদের কম্যান্ডো-টাইপ গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছে। এবং আমরা কিছু নির্দিষ্ট কাজের ভার নিয়ে ঢাকা এসেছি। এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না।'

জামী আর মাসুম ঢুলছে। শরীফ হাই তুলে বলল, 'রাত তিনটে। এখন শোয়া যাক। বাদবাকি আগামীকাল শোনা যাবে।'

১ আগস্ট
সোমবার ১৯৭১

আজ আমাদের বিয়ের তারিখ। ২৪ বছর হলো। প্রতি বছর আমরা বিবাহবার্ষিকীটা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে উদ্‌যাপন করি। আমি তাকিয়ে আছি সামনের বছরের দিকে, আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পুরবে। রজতজয়ন্তী উৎসবটা খুব ধুমধাম করে পালন করব।

সকাল থেকে বেশ বৃষ্টি, দুপুরে খিচুড়ি বাধলাম। সঙ্গে গোশতের কাঁড়ি আর শেষে ফজলী আম। এবার আর কাউকে দাওয়াত নয়—নিজেদের মধ্যেই। উদ্‌যাপনের মতো মন নেই। উচিতও নয়। তবে রুমী এসেই যেভাবে বলেছে দেখলে, তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর আগেই দিনটাতে কেমন এসে গেলাম—তাইতেই একটু কিছু করা।

রুমী দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে গোসল সেরে খাবার টেবিলে এসে খুশি হয়ে গেল।

খেয়ে উঠেই রুমী বেরিয়ে যাচ্ছিল, আগের অভ্যাসবশে ডেকে ফেললাম, 'কোথায় যাচ্ছিস?' রুমী ফিরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ভ্রূকুটি করে তাকাল, 'আম্মা নো কোয়েশ্চেন এনিমোর। তবে এবারের মত বলছি—সেলুনে যাচ্ছি দাড়ি কাটতে। তারপর অন্য কাজ আছে।'

আমি বলে উঠলাম, 'দাঁড়া, দাঁড়া, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। একটা ছবি তুলে রাখি।'

রুমী হাসিমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে 'নো ওয়ে' বলে বেরিয়ে গেল।

রুমীর এই এক দোষ। কিছুতেই ছবি তুলতে চায় না। গেরিলা হবার অনেক আগে থেকেই ওর শখ—গেরিলা হবে। একবার তো প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন আর্মিতে যাবার জন্য খুব ঝোঁক ধরেছিল। ওর মত হল, গেরিলাদের কোন ছবি থাকা উচিত নয়। তাহলে ওদের ধরা সহজ হয় না।

রুমী ফিরল সন্ধ্যার পরে। ডাইনিং টেবিল ঘিরে আমি, শরীফ, দাদাভাই, মোর্তুজা, ডাক্তার, ফকির—সবাই বসে খুব লো-ভল্যুমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছিলাম। বেল বাজতেই শরীফ দ্রুত হাতে স্টেশনের কাঁটা ঘুরিয়ে দিল। দরজা খুলতে রুমীকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার কাঁটা যথাস্থানে নিয়ে গেল। রুমীকে দেখে মোর্তুজা বলে উঠলেন, 'কি রুমী, তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না? যখনি আসি, শুনি তুমি ছাদরে ঘরে জুডো প্রাকটিস করছ, না হয় বন্ধুর বাসায় গিয়েছো। এত ঘোরাঘুরি করা কি ভালো?'

রুমী সবাইকে সালাম দিয়ে চৌকিটাতে বসল, হেসে মৃদুস্বরে বলল, 'বেশি তো ঘুরি না চাচা। ছাদের ঘরেই বেশি সময় কাটাই। জুড়ো কারাত প্র্যাকটিস করি, বইপড়ি, ড্রয়িং করি।'

মোর্তুজা হেসে বললেন, 'তোমার ছাদের ঘর একদিন দেখায়ো।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দেখা উচিত আপনার। ওর খেয়াল মেটাতে কত খরচ করতে হয়েছে আমাদের, দেখবেন। পুরো ঘরের মেঝে জুড়ে তিন ইঞ্চি পুরু ছোবড়ার গদি বসাতে হয়েছে—ওনারা ধড়াম ধড়াম আছাড় খাবেন, তার জন্য। এককোণে ছাদে আংটা লাগিয়ে আর মেঝেতে তিনমণি কংক্রিট স্ল্যাব বসিয়ে পাঞ্চিং ব্যাগ ঝোলানো হয়েছে—ওনারা ঘুষি মেরে বক্সিং প্র্যাকটিস করবেন বলে।'

দাদাভাই বললেন, 'খুব ভালো কথা তো। কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ, বাইরে বিপদ, বাড়িতেই যদি ব্যস্ত থাকার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তার চেয়ে আর কি ভালো হতে পারে? আমাদের ছেলেগুলো তো ঘরে বসে বসে বোরড্ হয়ে গেল। বাইরে বেরোতে দিতেও ভয় লাগে।'

১২ আগস্ট
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গত তিনদিন থেকে রুমীর দেখা পাওয়াই দুষ্কর। কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, তার ঠিক নেই। পরশুদিন দুপুরে বাসায় খেল দু'জন গেরিলা নিয়ে—বদি আর জুয়েল। বদি ইকনমিকসে এম. এ. পড়ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র। জুয়েলও নামকরা, তবে ক্রিকেটের মাঠে। খাওয়ার পরপরই ওদের নিয়ে রুমী বেরিয়ে গেল, বলে গেল রাতে ফিরবে না।

গতকাল ধলুরা দুপুরে খেল আমাদের বাড়িতে। চিশতীর ছুটি প্রায় শেষ, ওরা ১৫ তারিখে ইসলামাবাদ ফিরে যাবে। খেতে বসে ধলু জিগ্যেস করেছিল, রুমী কই? খাবে না? বলেছিলাম 'এসে যাবে এক্ষুণি। আমরা শুরু করে দিই।'

কিন্তু রুমীর আসতে আসতে বিকেল হয়ে গেল। ততক্ষণে ধলুরা চলে গেছে। বললাম, 'রুমী, একবার সময় করে খালা-খালুর সঙ্গে দেখা করে আসিস।' কালকেও ঘণ্টাখানেক বাড়িতে থেকেই আবার বেরিয়ে গেল। বলল, রাতে ফিরবে না।

কিছুই বলছি না, বলবার উপায় তো নেই। কিন্তু রাতে ঘুম হচ্ছে না। জামীর আবার জ্বর দু'দিন থেকে। ডাক্তার দেখে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে।

আমারও শরীরটা খুব দুর্বল লাগে। সব সময় বুক ধড়ফড় করে। রুমী সব কথা খুলে বললে মনে হয় এতটা অসুস্থ লাগত না।

আজ দুপুরে খাওয়ার পর টেবিলে রুমীর খাবার ঢাকা দিয়ে চৌকিটাতে শুয়েছিলাম। রুমী এল বিকেলে। এসেই বলল, 'আম্মা, খেতে দাও। বড্ডো খিদে পেয়েছে'—টেবিলের দিকে তাকিয়ে—'বাঃ আগে থেকেই খাবার রেডি! গুড ওল্ড মাম্।'

আমি উঠে ঢাকনা খুলে রুমীর প্লেটে খাবার বেড়ে দিতে দিতে বললাম, 'কাল বিকেলে ইন্টারকনে ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। একেবারে ভেতরে একটা ঘরে বিচ্ছুরা বোমা মেরেছে। জানিস?'

'জানি। ঘরে নয়, একতলার লাউঞ্জের পাশের একটা বাথরুমে।'

'তুই ছিলি নাকি?'

'না।'

'যারা ছিল, তাদের চিনিস?'

'আম্মা।' রুমীর গলায় অসহিষ্ণু রাগ।

আমিও হঠাৎ রেগে গেলাম। 'ঠিক আছে, তোকে আর কিছুই জিগ্যেস করব না। তবে জেনে রাখ, আমাদের ম্যালাই সোর্স আছে। এই ঢাকাতে খবর জেট প্লেনের স্পীডে যাতায়াত করে বুঝলি?'

রুমী হেসে ফেলল, কিন্তু আমি দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গেলাম।

খানিক পরে রুমী এসে ঢুকলো বেডরুমে, পাশে বসে বলল, 'ইন্টারকনের ভেতরে বোমা মারে নি' ওটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সংক্ষেপে বলে পি.কে.।'

আমি কথা বললাম না। রুমী বলল, 'যাঁরা করেছে, তাদের তুমি আগে দেখ নি। আমিও আগে চিনতাম না। মেলাঘরে গিয়ে আলাপ হয়েছে।'

আমি চুপ। রুমী ও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'ঐ যে পি.কে., ওটা না, দেখতে একদম পুটির মতো। হলদে রঙের। বড়ই নিরীহ চেহারার। দেখে মনে হবে ফার্নিচারের দোকানের পুটি-ই।'

তবুও কথা বললাম না। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। রুমী যতটুকু বলার ঠিক ততটুকুই বলবে। তার বেশি একটুও না। আমার জিগ্যেস করা বৃথা।

রুমী খানিকক্ষণ আপন মনে শিস দিল, তারপর মৃদুস্বরে আবৃত্তি করতে লাগল:

> দেখতে কেমন তুমি? কি রকম পোশাক আশাক
> প'রে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
> পেছনে দেখাতে পারো জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
> টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবর জং, ঢোলা
> পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
> পাখির মতই কিংবা চা-খানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন?
> দেখতে কেমন তুমি? অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
> কুলুজি তোমার আতিপাতি! তোমার সন্ধানে ঘোরে
> ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
> করে খোঁজে প্রতি ঘর।

আমি উঠে বসে জিগ্যেস করলাম, 'কার কবিতা এটা?'

'ঢাকার এক বিখ্যাত কবির। নামটা ভুলে গেছি। শাহাদত ভাই আর আলম মাঝে-মাঝে ওঁর কাছ থেকে নিয়ে যায় ওপারে। মেলাঘরে আমরা কবিতাগুলো পড়ি। ভালো লাগলে দু'একটা কপি করে রাখি, তারপর ওগুলো কলকাতায় কার কাছে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'এটা তো তোদের নিয়েই লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এটার নাম 'গেরিলা'—বাকিটা শোন:

> পারলে নীলিমা চিরে বের
> করতো তোমাকে ওরা, দিতো ডুব গহন পাতালে।
> তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছো হাত ধরে পরস্পর।
> সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া
> তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন সন্তান আমার।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বললাম, 'ঐ শাহাদত আর আলম আর আসে না ঢাকায়?'

'আসে, আবার চলে যায়।'

'এবার আসে নি?' বলেই সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে আবার বললাম, 'মানে এরপর এলে কবির নামটা জিগ্যেস করে নিস।'

রুমী হেসে ফেলল, 'আম্মা ইউ আর সিম্পলি ইনকরিজিবল। ঐ কবি ঢাকাতেই বাস করছেন। আমি যে নামটা ভুলে গেছি সেটা ওঁর জন্য মঙ্গল। তুমি আবার জানতে চাও কেন? এতে তোমারও বিপদ, কবিরও বিপদ।'

এই এক লুকোচুরি খেলা চলছে। রুমী বলছে, সব কথা জানতে চেয়ো না, ধরা পড়লে টর্চারে বলে ফেলতে পার। আমি কখনো লক্ষ্মী মেয়ের মতো, কখনো অভিমানে, রুমীর কথা মেনে নিয়েও খানিক পরে আবার ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করে ফেলছি।

এবার আর রাগ করলাম না। হেসে বললাম, 'সত্যি, কি জ্বালা। খালি ভুলে যাই। বুড়ো বয়সে সব উলটপুরাণ হয়ে গেছে। এখন তুই বাবা হয়েছিস, আমি তোর ছোট মেয়ে। তাই খুব মনের সুখে বকে নিচ্ছিস।'

১৫ আগস্ট
রবিবার ১৯৭১

আমাদের সবার মন খুব খারাপ। গতকাল ভোর ছ'টায় জুবলী ফোন করে জানাল যে, রাত দেড়টার সময় মিলিটারি এসে রফিককে ধ'রে নিয়ে গেছে। কোনমতে মুখ-হাত ধুয়ে এককাপ চাপ খেয়ে জুবলীদের বাসায় গেলাম। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকলাম। বসে ছিলো আরো অনেকে—আতিক, বুলু, রেণু, চাম্মু, প্রতিবেশী কয়েকজন। জুবলী মেঘলা, বর্ষণকে কোলের কাছে নিয়ে শূন্য চোখে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। কারো মুখে কথা ছিল না।

আজ ধলুরা ইসলামাবাদ ফিরে গেল। মা ও লালুকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। একটি বোনের সঙ্গে তবু দেখা হলো, আরেকটি বোন বেলু, তার স্বামী আজিজ, তিনটি ছেলেমেয়ে ইসলামাবাদে রয়েছে। তাদের এখন ছুটিতে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে, কে জানে, আদৌ হবে কি না তাই বা কে জানে?

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে জুবলীদের বাসায় গেলাম। রফিকের সাথে একই রাতে আরো তিনজন অধ্যাপককে ধরেছে, তাঁরা হলেন—গণিত বিভাগের শহীদুল্লাহ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাদউদ্দিন, আর ইতিহাসের আবুল খায়ের।

মা আর লালুকে জুবলীদের বাসায় রেখে আমি আর শরীফ নিউ মার্কেটে গেলাম।

ক'দিন থেকে সময় পেলেই বিভিন্ন দোকানে একটা জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছি—ওয়াটার প্রুফ সিগারেট কেস। ওয়াটার প্রুফ ঘড়ি বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু ওয়াটার প্রুফ সিগারেট কেস আজ পর্যন্ত কোন কোম্পানি বানিয়েছে বলে শুনি নি। ক'দিন আগে রুমী বলেছিল, 'আম্মা দেখো তো এমন একটা সিগারেট কেস পাও কি না, যেটার ডালা খুব চেপে লেগে থাকে। মানে পানিতে পড়লে যাতে পানি না ঢোকে।' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কেন, এরকম সিগারেট কেস কেন?'

'আমাদের না, অ্যাকশানে গেলে পাক আর্মি বা রাজাকারদের তাড়া খেয়ে অনেক সময় দৌড়ে পালাতে হয়। কখনো পুকুরে বা নদীতে ঝাঁপ দিতে হয়, কখনো পানির মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শত্রুর দিকে এগোতে হয়, তখন সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই ভিজে গেলে বড্ডো কষ্ট হয়—তাই। কয়েকটা লাইটারও কিনো। তবে দেখো, কোনটাই যেন বেশি চক্চকে বা ফ্যান্সি চেহারার না হয়। তাহলে লোভে পড়ে কোন ছেলে নিয়ে নিতে পারে।'

অতএব, আমরা ক'দিন থেকে ওয়াটার প্রুফ আর পুরনো ঘষ্টা চেহারার সিগারেট কেস আর লাইটার খুঁজে বেড়াচ্ছি। জিন্না এভিনিউতে এক দোকানে একটা পেয়েছিলাম, ডালাটা বেশ শক্ত হয়ে লেগে থাকে কিন্তু চেহারা বড় চক্চকে। তাই নিই নি। নিউ মার্কেটে পেলাম না। বললাম, 'জিন্না এভিনিউরটাই নিয়ে নেব কালকে। ঝামা দিয়ে ঘষে বাইরেটা ম্যাটমেটে করে নেব। আজ আর ভাল্লাগছে না। বাড়ি চল।'

ফেরার পথে এক কার্টন ৫৫৫ সিগারেট কিনে নিলাম পাড়ার রশীদের দোকান থেকে।

বিকেলে রুমী বলল, 'আম্মা, চল তোমাকে এক বাসায় নিয়ে যাই। তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে।'

'কোথায় ?'

'আগে থেকে বলব না। সারপ্রাইজ।'

মগবাজার চৌমাথা থেকে তেজগাঁও ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে একটু এগিয়েই রেললাইন পার হয়ে গাড়ি খানিক সামনে গিয়ে ডাইনে একটা গলিতে ঢুকল। আরো একটুখানি গিয়ে আবার ডাইনে ঢুকে থামল একটা একতলা বাড়ির সামনে—২৮ বড় মগবাজার। দু'ধাপ সিঁড়ি উঠেই ছোট্ট একটা বারান্দা-রেলিংঘেরা। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে স্বাস্থ্যবান একটি যুবক। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে আদাব দিল। রুমী বলল, 'মা, এ হলো আজাদ। একে তুমি ছোটবেলায় দেখেছ। অনেক বছর আগে এদের বাসায় আমরা অনেক দাওয়াত খেয়েছি।'

মনে করতে পারলাম না কিন্তু ঘরে ঢুকে তার মাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলাম। অনেক বছর আগে—তা দশ-বারো বছর তো হবেই—এঁদের বাড়িতে কতো গিয়েছি, কতো খেয়েছি। আজাদের বাবা মিঃ ইউনুস আহমদ চৌধুরী ব্যবসায়ী ছিলেন।, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল আমাদের এক ভাগনে মেছেরের মাধ্যমে। আজাদের মা খুব ভালো রাঁধতেন। আমরা প্রায় প্রায়ই ছুটির দিনে ওঁদের বাড়িতে দাওয়াতে যেতাম আর আজাদের মা'র হাতের অপূর্ব রান্না খেয়ে খুব উপভোগ করতাম। ওঁরা প্রথমদিকে পুরনো ঢাকায় থাকতেন। তারপর মিঃ চৌধুরী নিউ ইস্কাটন রোডে বাড়ি বানালেন। বিরাট বাড়ি—আগাপাস্তলা মোজাইক, ঝক্ঝকে দামী সব ফিটিংস, আজাদের মায়ের ড্রেসিং রুমটাই একটা বেডরুমের সমান বড়। সামনে অনেকখানি খোলা জমি—বাগানের জন্য। একপাশে হরিণের ঘর, সেখানে চমৎকার এক হরিণ। আজাদ তখন দশ-বারো বছরের ছেলে। তারপর মাঝখানে বেশ কয়েক বছর কেমন করে জানি যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলে। লোকমুখে শুনেছিলাম মিঃ চৌধুরী আরেকটা বিয়ে করেছিলেন।

এখন আজাদের মা নিজেই পুরো ব্যাপারটা বললেন, 'স্বামী আবার বিয়ে করাতে উনি একমাত্র সন্তান আজাদকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে আসেন, বেশ ক'বছর আগে। আজাদ গত বছর এম. এ পাস করেছে। অনেক দুঃখধান্দা করে ছেলেকে মানুষ করেছেন। এখন আজাদ চাকরি করবে, এখন আর কোন দুঃখকষ্ট থাকবে না।

আজাদের মা'র দিকে চেয়ে রইলাম। বরাবরই দেখেছি বাইরে নম্র মৃদুভাষিণী এবং ভেতরে ভেতরে খুব দৃঢ়চেতা কিন্তু এতটা একরোখা তা জানতাম না। এখন অনেক শুকিয়ে গেছেন, পরনে সরু পাড়ের সাদাসিদে শাড়ি, গায়ে কোন গহনা নেই। আগে দেখেছি—ভরাস্বাস্থ্যে গায়ের রং ফেটে পড়ছে, হাতে-কানে-গলায় সোনার গহনা ঝকঝক করছে, চওড়া পাড়ের দামী শাড়ির আঁচলে চাবি বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে, মুখে সবসময় মৃদু হাসি, সনাতন বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। সেই মিসেস চৌধুরী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রতিবাদে তীব্র আত্মসম্মানবোধে এককথায় প্রাচুর্য ও নিরাপত্তার ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন।

একটা নিশ্বাস চাপলাম। ইস্কাটনের বাড়িটা আজাদের মায়ের নামে। সেই বাড়ি তিনি ফেলে এসেছেন ছেলের হাত ধরে। থাকছেন ভাড়াবাড়িতে।

ছেলেটিকে দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক মায়ের মতই সবসময় হাসিমুখ।

আমরা থাকতে থাকতেই একটি ছেলে এল সেখানে, রুমী মৃদুস্বরে পরিচয় করিয়ে দিল, 'কাজী কামাল উদ্দিন, প্রভিন্সিয়াল বাস্কেটবল টিমের নামকরা খেলোয়াড়। মেলাঘরে পরিচয় হয়েছে। জানো আম্মা, কাজী ভাইকে এবার ন্যাশনাল বাস্কেটবল টিম ক্যাম্পে ডেকেছিল, কিন্তু কাজী ভাই যায় নি।'

১৮ আগস্ট
বুধবার ১৯৭১

সকাল থেকে অঝোরে পানি ঝরছে। ক'দিন থেকেই বেশ ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। তবে মাঝে-মাঝে থামে। আজ আর থামাথামির লক্ষণ নেই। এরই মধ্যে শরীফ ড্রাইভার আমিরুদ্দিকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করে এনে দিয়েছে। রুমীর কয়েকজন বন্ধু দুপুরে খাবে।

২৮ নম্বর রোডের যে বাড়িটাতে ওদের প্রধান আস্তানা, সেখানে ক'দিনে অনেক গেরিলা ছেলে এসে গেছে। বড্ডো গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। রুমীদের কয়েকজনের আলাদা নিরিবিলি বসে কিছু প্ল্যান করা দরকার। আমাদের ছাদের ঘরটা এ কাজের জন্য একেবারে আইডিয়াল। সারা মেঝে জুড়ে জাজিম পাতা, রুমী জামীর জুড়ো কারাতে প্র্যাকটিসের জায়গা। সকালে তার ওপর কয়েকটা চাদর বিছিয়ে ঢেকে দিয়েছি, দোতলা থেকে কতকগুলো বালিশ আর অ্যাশট্রে নিয়ে রেখে দিয়েছি। আর কয়েক প্যাকেট ৫৫৫ সিগারেট।

ছেলেগুলো দশটার মধ্যে এসে ছাদের ঘরে দরজা এঁটে মিটিংয়ে বসে গেছে। মাঝখানে একবার রুমী এসে নিজের হাতে চা-নাশতার ট্রে নিয়ে গেছে।

দেড়টা বেজে গেছে। ওদের নামবার নাম নেই। টেবিলে খাবার দিয়ে নিজেই ছাদের ঘরের সামনে গিয়ে বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম। ঘরের মধ্যে কথা শোনা যাচ্ছিল, টোকার শব্দে হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। আমি একটু চেঁচিয়ে বললাম, 'খাবার রেডি।' একটু পরে দরজাটা একটু ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে রুমী বলল, 'তুমি যাও, আমরা দু'মিনিটের মধ্যে আসছি।' ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মনে মনে একটু হেসে নেমে গেলাম। ছাদের ঘরের দরজা-জানালা সব সেঁটে সব পর্দা টেনে ওরা কথা বলছিল।

একটু পরে নিচে খেতে এল ওরা। ওদের মধ্যে কাজী, আর, বদিকে আগেই দেখেছি। এখন রুমী পরিচয় করিয়ে দিল স্বপন আর চুল্লুর সঙ্গে। এর মধ্যে আলম ছাড়া বাকি সবাই রুমীর চেয়ে কয়েক বছরের বড়। আগে থেকেই রুমীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠত তার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে। আর এখন তো যুদ্ধে তের থেকে তিরিশ—সবাই এক বয়সী।

ছেলেগুলো একেবারে মুখ বুজে খাচ্ছে। আমি বললাম, 'একটু মেলাঘরের কথা বল না শুনি।'

১০ আগস্ট
শুক্রবার ১৯৭১

রাত প্রায় দুটো। ঘুম আসছে না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এবারের বর্ষাটা একেবারে পচিয়ে দিল। ঢাকার কতকগুলো নিচু এলাকা আবার পানিতে ডুবে গেছে। বুড়িগঙ্গার পানি বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় খুব বন্যা হচ্ছে। বিশেষ করে পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর আর রাজশাহী জেলার অবস্থা খুব খারাপ। রোজই কাগজে বেরোচ্ছে কোন্ কোন্ নদীর পানি বাড়ছে, কোন্ কোন্ জেলার কতগুলো থানা বন্যায় ডুবে গেছে।

অতিরিক্ত বর্ষা আর বন্যা নিয়ে সামরিকজান্তা খুব উদ্বিগ্ন, বিব্রত আর আতঙ্কিত। শুকনো এলাকার পাকিস্তানি সৈন্যরা এই রকম বৃষ্টি, বন্যা, কাদার মধ্যে একেবারে লেজেগোবরে হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর জন্য সুবিধে। নদী-হাওড়-বিলের সাঁতার জানা দামাল ছেলেরা পাকসেনাদের খুব জব্দ করেছে। সবাই বলছে আল্লার রহমত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। তাই এ বছর এই রকম অতিরিক্ত বর্ষা আর বন্যা।

রুমী গতকাল দুপুরেই চলে গেছে বাড়ি থেকে, বলেছে দু'দিন পরে আসবে। ঢাকা আসার পর থেকেই দেখছিলাম কি অস্থিরতায় ভুগছে রুমী। এতদিনে কারণটা একটুখানি বলেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার দায়িত্ব নিয়ে ওদের দলটা ঢাকা এসেছে। কিন্তু এসে দেখে সে পাওয়ার স্টেশন একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গ। আগে যেখানে স্টেশনের ভেতরে এক প্লাটুনের মতো সৈন্য পাহারা দিত, এখন সেখানে এক কোম্পানির মতো সৈন্য। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডে মিলিটারি সৈন্য রিকয়েল্‌লেস রাইফেল নিয়ে এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। টহল দিচ্ছে নদীর বুকেও। নৌকায় চেপে। উলান, গুলবাগ, ধানমণ্ডির অ্যাকশানের পর থেকে পাকিস্তান আর্মি ইনটেলিজেন্স দারুণ সতর্ক হয়ে গেছে। ফার্মগেট, ইন্টারকন অ্যাকশানের পর সামরিকজান্তা একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে রয়েছে। বস্তুত সারা ঢাকা শহরেই এখন সিকিউরিটির ভয়ানক রকম কড়াকড়ি। সুতরাং সিদ্ধিরগঞ্জের ব্যাপারে ওদের সময় নিতে হচ্ছে, নতুন করে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সিদ্ধিরগঞ্জ ছাড়াও অন্য যেসব অ্যাকশানের নির্দেশ এদের ওপর আছে, সেইগুলোর দিকে ওরা এখন মনোযোগ দিচ্ছে।

গেরিলাদের অনেক ক'টা দল এখন ঢাকায়। তারা প্রতিদিনই সর্বত্র কিছু-না-কিছু অ্যাকশান করেই চলেছে। ওদের ওপর নির্দেশই আছে : প্রতিনিয়ত ছোটবড় নানা ধরনের অ্যাকশান করে সামরিকজান্তা এবং পাক আর্মিকে সদাসর্বদা ব্যতিব্যস্ত, বিব্রত ও আতঙ্কিত রাখতে হবে। শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত এমনভাবে অ্যাকশান করবে, যাতে পাক আর্মি মনে করে সারা শহরে জুড়ে হাজার হাজার বিচ্ছু কিলবিল করছে।

এবং ওরা করছেও তাই।

এখন রুমীরা কোথায় কি করছে, কে জানে। কোনো বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে? নাকি এই বৃষ্টিতেই কোথাও বেরিয়েছে কারফিউর মধ্যে? রাস্তায় গাড়িতে? না, নদীতে নৌকায়? কে জানে।

সাত সতেরো ভেবে ভেবে বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যাচ্ছে। শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে রুমীদের ঘরে গেলাম। বাবার ঘরে বাবা আর মাসুম দুটো খাটে। রুমীর ঘরে জামীর খাটে জামী ঘুমে অচেতন। রুমীর খাটের ওপর নিঃশব্দে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

মেলাঘরেও কি এখন বৃষ্টি হচ্ছে? বেড়ার ঘরের ফোকর দিয়ে, তাঁবুর নিচ দিয়ে পানি ঢুকে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে? পরশুদিন কাজী আর আলমের মুখে মেলাঘরের অনেক গল্প শুনেছি। ওরা প্রথম বর্ডার ক্রস করে এপ্রিলের মাঝামাঝি। মেলাঘরে সেক্টর টু'র হেডকোয়ার্টার হয়েছে জুনের প্রথম দিকে। তার আগে ওরা ছিল মতিনগরে। প্রথমদিকে ওদের অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়েছে। প্রায় কিছুই ছিল না। একেবারে শুরুতে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘাসের ওপর শুয়েছে কতোদিন। গায়ের ওপর দিয়ে কেঁচো, বিছে, কত কি চলে গেছে। তারপর তাঁবু যোগাড় হয়েছে, তার মধ্যে স্রেফ চাটাই পেতে। ভাত খেয়েছে মাটির সানকিতে, গ্রেনেডের খালি বাক্স আড়াআড়ি কেটে তার মধ্যে। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পান্ডে যখন ওদের ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন, তখন সানকি আর গ্রেনেডের বাক্স দেখে, ওদেরকে বাসন-প্লেট দেবার হুকুম দেন। ছেলেরা বলে 'আমরা বাসন প্লেট চাই না, তার বদলে আমাদের বুলেট দিতে বলুন।' কি ধাতুতে গড়া এই ছেলেগুলো বাসনের বদলে বুলেট চায়। আর খাওয়া? কতোদিন শুধু ডাল আর ভাত, মাঝে মাঝে তরকারির ঘ্যাঁট, কখনো-সখনো মাছ। তাও নুন ছিল না বহুদিন, প্রথম যেদিন ডাল, তরকারিতে নুন দেওয়া হয়েছিল সেদিন খাবার কম পড়ে গিয়েছিল। আলম বলছিল হেসে হেসে, আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। খাওয়ার পানির অভাব ছিল, ছোট একটা খালমতো ছিল, সেই খালের পানি দিয়েই সব কাজ হত, খাওয়া পর্যন্ত।

মতিনগর থেকে মেলাঘর যাত্রা—ক্যাপ্টেন হায়দারের হুকুমে ক্যাম্প ভেঙে সব গুছিয়ে ঘাড়ে তুলে একরাতে রওনা—সারারাত হেঁটে ভোরবেলা যেখানে থামল, সেটাই মেলাঘর। মতিনগর থেকে ১০/১২ মাইল দূরে। আগের রাতে কোন খাবার জোটে নি, ঘাড়ে মাথায় বিরাট বোঝা নিয়ে রাতভর হাঁটা, সকালে গাছের কাঁঠাল পেড়ে তাই দিয়ে নাস্তা! তারপর টিলার ওপর ক্যাম্প তৈরি, স-ব কাজ নিজের হাতে। দোতলা-সমান টিলা নিচে থেকে মাটি কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো, সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল কেটে পুঁতে দেওয়া, যাতে মাটিটা ভেঙে প'ড়ে না যায়।

রাতের বেলা ঘুম না এলে ভাবনাচিন্তাগুলো খুব তীক্ষ্ণরূপ নেয়। মনে হচ্ছে, মেলাঘর এখন আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। তিন-চারদিন আগে এক দুপুরে খাওয়ার পর রুমী বলছিল মেলাঘরের জীবনের কথা। রুমী যখন যায়, তখন ক্যাম্পের জীবনযাপনের মান অনেকখানি উন্নত হয়েছে। অনেক তাঁবু, বেড়ার তৈরি লম্বা ব্যারাক, বাঁশের মাচায় খড়ের গদিতে চাদর, বালিশ। ট্রেনিং ও অ্যাকশানের জন্য অনেক অস্ত্র, গুলি, গ্রেনেড, বিস্ফোরক।

একরাতে রুমীর সেন্ট্রি ডিউটি পড়েছিল কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে। অনেক রাতে টিলার মাথায় রুমী দাঁড়িয়েছিল। চারধারে ছোটবড় আরো কয়েকটা টিলা, এদিক-ওদিক বড় বড় গাছ।

রুমী বলছিল, 'জানো আম্মা, ওখানে তো সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়। সারা দিনের প্রচণ্ড খাটনিতে সবাই এ্যাতো টায়ার্ড থাকে যে আটটা ন'টার মধ্যে বেশির ভাগ ছেলে ঘুমিয়ে যায়। দু'একটা তাঁবুতে হয়ত কেউ কেউ আরো খানিকক্ষণ জেগে গানটান গায় কিংবা আড্ডা দেয়। সে রাতে টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি কি, একটা তাঁবুতে আলো জ্বলছে, আর সেখান থেকে ভেসে আসছে গানের সুর :

হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ।

বুঝলাম আজম খান গাইছে। আজম খানের সুন্দর গানের গলা। আবার অন্যদিকে ভীষণ সাহসী গেরিলা, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সেদিন সেই রাতে চারদিক ভীষণ অন্ধকার, অন্যসব ব্যারাক আর তাঁবুর সবাই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। ন'টা-দশটাতেই মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। ঐ একটা তাঁবুর ভেতর হারিকেনের আলো ছড়িয়ে সাদা রঙের পুরো তাঁবুটা যেন ফসফরাসের মতো জ্বলছে। উঁচু থেকে দেখে মনে হচ্ছিল বিশাল অন্ধকার সমুদ্রে যেন একটা আলোকিত জাহাজ। আর আজম খানের গানের সুর, মনে হচ্ছিল যেন চারদিকেই ইথারে ভেসে ভেসে হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ছে। তখন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

এখন এই বৃষ্টি ঝরা গভীর রাতের অন্ধকারে আমিও যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম নির্জন টিলার মাথায় কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা ৩০৩ রাইফেল হাতে সেন্ট্রি ডিউটিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় টান করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের চারপাশ দিয়ে বায়ুমণ্ডলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে আজম খানের উদাত্ত গলার গান :

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
যে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

... ...

শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়!
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

২১ আগস্ট
শনিবার ১৯৭১

সকালে রুমীর ফোন পেলাম রেবাদের বাসা থাকে। রুমী ওখানে রয়েছে, ওকে নিয়ে আসতে হবে।

গেলাম। রুমী ঢাকা আসার পর থেকে গাড়িটা বাড়িতেই থাকে, কখন লাগে—তার

জন্য। শরীফ, বাঁকা কিংবা মঞ্জুরের গাড়িতে অফিসে যাওয়া-আসা করে।

গিয়ে দেখি, রুমীর চেহারার অবস্থা করুণ। দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উষ্কখুষ্ক চুল, রাতজাগা লাল চোখ, কুঁচকানো কাপড়-চোপড়, রুমী বলল, 'এই চেহারা-সুরত নিয়ে বেরিয়ে যেতে সাহস পেলাম না। গুলশান লেকের ঘাট থেকে মিনিমামার বাসাটা একদম কাছে, তাই এদিক দিয়ে এলাম।'

বুঝলাম নদীর ওপারে যে গ্রামে ওদের ক্যাম্প আছে, সেইখান থেকে এসেছে।

বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। অসুবিধে তো কিছু নেই আমার। কিন্তু চেহারা-সুরত এরকম হলো কি করে, বলা যাবে?'

'যাবে' বলে রুমী বিষণ্ন হাসি হাসল, পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে আস্তে আস্তে বলল, 'পরশু রাতে দুটো নৌকায় করে আমরা কয়েকজন সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের আশপাশটা একটু দেখতে বেরিয়েছিলাম। সামনের নৌকায় কাজী ভাই, বদি আর জুয়েল ছিল। অন্ধকার রাত, কিছু দেখা যায় না। আমরা পেছনের নৌকায় একটু দূরে। আসলে কাজী ভাইরা কি যেন একটা চেক করে দেখার জন্য এগিয়ে গেছে, আমাদের একটু পেছনে থাকতে বলেছে। হঠাৎ শুনি ভয়ানক গুলির শব্দ। কিছুই বুঝতে পারি না। অন্ধকারে শুনলাম চিৎকার, পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। একটু পরে কাজী ভাইদের নৌকা কাছে এলে সব জানতে পারলাম। কাজী ভাইরা একটা মিলিটারি ভর্তি নৌকার সামনে পড়েছিল। মাঝিটা ছিল রাজাকার। সে বাংলায় শুধিয়েছিল 'কে যায়', মিলিটারিগুলো একদম চুপ করে ছিল। কাজী ভাই একটু ঘুরিয়ে জবার দেয় 'সামনে'। নৌকাটা একদম কাছে আসতেই ওরা দেখে নৌকাভর্তি মিলিটারি। কাজী আর জুয়েল তাদের স্টেনগান নৌকার পাটাতনে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বদি তা রাখে নি। সে কোলের মধ্যে রেখেছিল। ভাগ্যিস রেখেছিল। তাই আমরা সবাই বেঁচে গেছি। বদি সঙ্গে সঙ্গে স্টেন তুলে ওদের নৌকার ওপর ব্রাশফায়ার করে। পুরো ম্যাগজিন একেবারে খালি করে দেয়। মিলিটারিরাও গুলি চালিয়েছিল, তবে বদির ব্রাশের মুখে একদম সুবিধে করতে পারে নি। কেবল জুয়েলের আঙুল গুলি লেগেছিল। মিলিটারিদের কয়েকটা মরে, বাকিরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের নৌকাটা উল্টে যায়। বদিও পানিতে পড়ে গিয়েছিল। ওদের পরে তুলে আমরা সবাই পিরুলিয়া গ্রামে ফিরে যাই। জুয়েলকে নিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম। সে রাতে কোনমতে ফাস্ট এইড দিয়ে রাখা হলো। গতকাল কাজী, বদি, জুয়েলকে ঢাকা নিয়ে এসেছে ওর আঙুলে অপারেশন করতে হবে।'

আমার গা শিরশির কতে লাগল। একটু হলেই সবাই গুলি খেয়ে মরতে পারত, জখম হয়ে নদীর পানিতে তলিয়ে যেতে পারত। কোনোদিন জানতেও পারতাম না ছেলেগুলোর কি হল!

রুমীকে সে কথা বলতে সে হাসল, 'আমাদের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ কি বলেন, জান? তিনি বলেন, 'কোন স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না; চায় রক্ত-স্নাত শহীদ।' অতএব মা মণি, আমরা সবাই শহীদ হয়ে যাব—এই কথা ভেবে মনকে তৈরি করেই এসেছি।'

আমার হঠাৎ দু'চোখে পানি এসে গেল। গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে, তাই আর কথা না বলে মাথা উঁচু করে চোখের পানি আবার ভেতরে পাঠাবার প্রয়াসে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগলাম। রুমী বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে দিল, 'জান আম্মা, জুয়েল জখম হওয়াতে আমাদের তৎপরতা একটু ঢিলে পড়ে যাবে। জুয়েলকে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হবে। আমাদেরও একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। আসলে সিদ্ধিরগঞ্জ

পাওয়ার স্টেশনটা এখনো ওড়াতে পারা গেল না, তাই মনে একদম শান্তি নেই। অথচ এই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার জন্য মেলাঘরে হায়দার ভাই আমাদের দলকে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়েছে। কাজী ভাই এই দলের লিডার। এই কাজের জন্য আমরা সঙ্গে এনেছি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। একটা ৩.৫˝ রকেট লঞ্চার, সেটা চালাবার জন্য আর্টিলারি থেকে একজন গানারকেও আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আটটা রকেট শেল, কি যে ভারি, বয়ে আনতে আমাদের জান বেরিয়ে গেছে। এ ছাড়া দুটো এস.এল.আর উইথ অ্যানার্গালঞ্চার। প্রত্যেকের জন্য একটা করে স্টেনগান, চারটে করে ম্যাগজিন, অসংখ্য বুলেট, দুটো করে হ্যান্ড গ্রেনেড। এখানে এসে দেখা গেল, যা হেভি সিকিউরিটি, তাতে শুধু বাইরে থেকে রকেটশেল মেরে কিছু করা যাবে না, মেরে দিয়ে পালানোও যাবে না। তখন ভেতর থেকেও স্যাবোটাজ করার কথা চিন্তা করা হল। কাজী ভাই, আলম, শাহাদত ভাই, আরো কয়েকজন একত্রে বসে প্ল্যান অব অ্যাকশান ঠিক করা হল। সেইমত আলম আর শাহাদত ভাই এখন কাজ করছে। পাওয়ার স্টেশনের ভেতরের দু'জন কর্মচারীকে, বিস্ফোরক কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়, সে বিষয়ে কিছু ট্রেনিং দিয়ে তাদের সাহায্যে একটু একটু করে পি. কে. স্টেশনের ভেতরে পাচার করা হচ্ছে। সবসুদ্ধ ৮০-৯০ পাউন্ড পি. কে. লাগবে। এককেবারে ৮/১০ পাউন্ড পি. কে. রুটির মতো বেলে গাড়ির দরজার ভেতর দিকের হার্ডবোর্ড কভার খুলে তার মধ্যে সেঁটে, আবার কভার এঁটে পাওয়ার স্টেশনের ভেতরে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। এই কাজে সময় বেশি লাগছে। তাছাড়া এত পি. কে ঢাকাতে মজুত নেই। এগুলোও আনাতে হচ্ছে। সব পি. কে. স্টেশনের ভেতরে নিয়ে যাওয়া শেষ হলে, তখন একটা তারিখ ঠিক করা হবে ভেতর থেকে ব্লাস্ট করানোর। এবং ঐ একই দিনে একই সময়ে আমরা বাইরে থেকে রকেটশেল মেরে খানসেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখব। এই প্ল্যান যদ্দিন কার্যকর না হয়, তদ্দিন আমরা অন্যসব অ্যাকশান চালিয়ে যাব।'

রকেট লঞ্চার, এস.এল.আর. উইথ অ্যানার্গালঞ্চার কি জিনিস বুঝলাম না। কিন্তু জিগ্যেস করতেও সাহস হল না। আমার চোখের পানি থামানোর জন্য রুমী গড়গড় করে এত কথা বলে গেল, যা সে কখনো করে না, তার ওপর আবার প্রশ্ন করে তার মুড নষ্ট করতে চাই না। পরে এক সময় জেনে নেব।

বাড়ি পৌঁছেই রুমী বলল, 'আম্মা, নাশতা রেডি কর। আমি শেভ, গোসল সেরে আসছি।'

ধোপদুরস্ত কাপড় পরে নাশতা খেয়ে বলল, 'যাই, জুয়েলের খবর নিয়ে আসি।'

'তাড়াতাড়ি ফিরিস। আমিও জুয়েলের খবর জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকব।'

কোথায় তাড়াতাড়ি ফেরা! ফিরল একেবারে সন্ধ্যা পার করে। সঙ্গে বদি। রুমী ঢুকেই বলল, 'আম্মা, এই দুর্দান্ত সাহসী ছেলেটাকে ভালো করে খাইয়ে দাও তো। ওর জন্যই আমরা সেদিন সবাই প্রাণে বেঁচে গেছি।'

বদি বিব্রত মুখে রুমীকে মৃদু ধমক দিল, 'খালি বেশি বকে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'জুয়েলের খবর কি?'

'জুয়েল ভালো আছে। কাল সন্ধ্যায় কাজী আর বদি জুয়েলকে ডাঃ রশীদউদ্দিন আহমদের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিল। কাজীর এক বন্ধু আছে, কুটু, ওর বাবা শামসুল আলম ডাঃ রশীদের বন্ধু। ঐ আলম সাহেবের গাড়িতে করে ওরা যায়। তবে ডাঃ রশীদের চেম্বারে অপারেশনের ব্যবস্থা নেই। তাই ডাঃ রশীদ জুয়েলকে ডাঃ মতিনের

ক্লিনিকে নিয়ে যান। ওখানে অপারেশন থিয়েটার আছে। সেখানে গিয়ে ডাঃ রশীদ জুয়েলের আঙ্গুলে অপারেশন করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। কয়েকদিন পরে আবার দেখাতে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

বদি বলল, 'ডাঃ মতিনের ক্লিনিক কোথায় জানেন? রাজারবাগ পুলিশ স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে। তাই ডাঃ রশীদ তার 'ডক্টর' লেখা ভোকসওয়াগনে জুয়েলকে বসিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার সাহস আছে বলতে হবে। কিন্তু জুয়েলকে দেখবার জন্য আমরা আর যাচ্ছি না ওইখানে।'

রুমী বলল, 'এই এলিফ্যান্ট রোডেই আজিজ মামার পলি ক্লিনিক আছে, সেখানে নিয়ে গেলেই হবে।'

১৪ আগস্ট
মঙ্গলবার ১৯৭১

দিনগুলো যে কি একরকম নেশার ঘোরে কেটে যাচ্ছে। রুটিনটা অনেকটা এরকম : আমি সকালে উঠেই একগাদা রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিই, রুমী প্রায় প্রায়ই দু'একজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনো খায়, কখনো খায় না; তবু খাবার সব সময় মজুত রাখি— যদি এসেই বলে 'খিদে লেগেছে, খেতে দাও।' মাঝে মাঝে দু'একটা রাত বাসায় থাকে, তখন আমাদের মধ্যে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বেডরুমে বড় বিছানায় সবাই গোল হয়ে বসে আড্ডা দিই, বেশির ভাগ সময় রুমীই বক্তা, আমরা প্রশ্নকর্তা।

আলম, বদি, স্বপন, কাজী, চুল্লু আরো দু'একবার বাসায় এসেছে, কখনো খেয়েছে, কখনো খায় নি। ওরা খেলে আমি খুশি হই, কারণ শুধু ঐ সময়টাতে খাবার টেবিলে ওদের পাই, মুক্তিযুদ্ধ, মেলাঘর, খালেদ মোশাররফ, হায়দার—বিভিন্ন বিষয়ে দু'চারটে কথা শুনতে পাই। খালেদ মোশাররফকে এতদিন বাঁকার ভাগনে 'মণি' হিসেবেই চিনতাম, এখন মেলাঘরের এই গেরিলাদের মুখে শুনে শুনে তার একটা অন্য ভাবমূর্তি মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। যে হায়দারকে কোন দিন চোখে দেখি নি, সেও যেন একটা চেহারা নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এস.এস.জি, অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'স্পেশাল-সার্ভিস গ্রুপের' অর্থাৎ কম্যান্ডো গ্রুপের ক্যাপ্টেন এ.টি.এম. হায়দার—যে কি না পাকিস্তানের আটাক্‌ফোর্টে স্পেশাল কম্যান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত, যাকে বলা হত জেনারেল মিঠ্‌ঠা খানের হাতে গড়া কম্যান্ডো—সেই দুর্ধর্ষ হায়দার এই ছেলেগুলোকে কম্যান্ডো ট্রেনিং দিয়ে থাকে। এদের মুখে শুনে শুনে সেই হায়দারও যেন আমার অতি চেনা, অতি আপন হয়ে উঠেছে।

চেনা হয়ে উঠেছে ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডাঃ এম এ মোবিন। এরা দু'জনে ইংল্যান্ডে এফ.আর.সি.এস. পড়ছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাস করে বিলেতে চার বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন এফ.আর.সি.এস. পরীক্ষা মাত্র এক সপ্তাহ পরে, তখনই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু। ছেলে দু'টি পরীক্ষা বাদ দিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনের অংশ নিল, পাকিস্তানি নাগরিকত্ব বর্জন করল, ভারতীয় ট্রাভেল পারমিট যোগাড় করে দিল্লিগামী প্লেনে চ'ড়ে বসল। উদ্দেশ্য ওখান থেকে কলকাতা হয়ে রণাঙ্গনে যাওয়া। প্লেনটা ছিল সিরিয়ান এয়ারলাইনস্-এর। দামাস্কাসে পাঁচ ঘণ্টা প্লেন

লেট, সব যাত্রী নেমেছে। ওরা দু'জন আর প্লেন থেকে নামে না। ভাগ্যিস নামে নি। এয়ারপোর্টে এক পাকিস্তানি কর্নেল উপস্থিত ছিল ঐ দুজন 'পলাতক পাকিস্তানি নাগরিক'কে গ্রেপ্তার করা জন্য। প্লেনের মধ্যে থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না, কারণ প্লেন হল ইন্টারন্যাশনাল জোন। দামাস্কাসে সিরিয়ান এয়ারপোর্ট কর্মকর্তা ওদের দু'জনকে জানিয়েছিল—ওদের জন্যই প্লেন পাঁচ ঘণ্টা লেট। এমনিভাবে ওরা বিপদের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত মে মাসের শেষাশেষি সেক্টর টু রণাঙ্গনে গিয়ে হাজির হয়েছে।

চেনা হয়ে উঠেছে ডাঃ নাজিমও। সে সদ্য এম.বি.বি.এস পাস করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ে ছিল। ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ময়মনসিংহ মুক্ত ছিল। তারপর পাকিস্তানিরা শহর দখল করলে, নাজিম কোনমতে পালিয়ে পায়ে হেঁটে, নৌকায়, ট্রাকে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পেরিয়ে, মে মাসের প্রথমদিকে বর্ডারের ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়। খোঁজখবর করে আগরতলা হয়ে মতিনগরে যায়। সেখানে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লোকেরা তাকে গেপ্তার করে। সে সময় কেউ ঠিকমত রেফারেন্স দিতে না পারলে বি.এস.এফ-এর লোকেরা তাকে ধরত পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে। শাহাদতের ছোট ভাই ফতেহ চৌধুরীও প্রথম মতিনগরে গিয়ে বি.এস.এফ-এর লোকের হাতে পড়েছিল। সে তার আগের চেনা পাড়ার ছেলে ডাঃ আখতার আহমদের নাম বলেছিল। তারপর আর কোন অসুবিধে হয় নি। ডাঃ নাজিমও আগরতলার এক পরিচিত লোকের নাম বলে পার পেয়েছিল। তারপর সোনামুড়ার হাসপাতালে কাজে লেগে যায় সে। সবচেয়ে নাটকীয় ব্যাপার ছিল—পাঁচ মে নাজিমও মতিনগরে গেল, আর তার পরপরই এগারো মে পাকিস্তানি সৈন্যরা বিবিরবাজার আক্রমণ করে দখল করে নিল। পূর্ব বাংলার বর্ডারের ঠিক ভেতরেই এই বি.ও.পি-টা এতদিন মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল। বিবিরবাজার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বেশ ক'জন জখম হয়। শ্রীমন্তপুর, বি.ও.পি. ভারতীয় বর্ডারের ঠিক ভেতরেই, প্রায় বিবিরবাজারের মুখোমুখি। পাকিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত শেল শ্রীমন্তপুরেও এসে পড়ছিল। ডাঃ আখতার আহমদ তার 'এক বেডের ক্যাম্প হাসপাতালটি' সরাতে ব্যস্ত ছিল। ওখানে রুগী রাখা মোটেও নিরাপদ ছিল না। তাই যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সোনামুড়ার ভারতীয় হাসপাতালে পাঠানো হতে থাকে। ঐ একই সময়ে খালেদ মোশাররফ ডাঃ নাজিমকে সোনামুড়ায় পাঠায়। সেখানে ফরেস্ট ডাকবাংলোটা দেওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য। ডাঃ নাজিম ওইখানেই আহতদের চিকিৎসায় লেগে যায়। ইতোমধ্যে আখতারও এসে পড়ে শ্রীমন্তপুর থেকে।

ডালিয়া সালাহউদ্দিন ঢাকায় ডাক্তারি পড়ত, বাফার নাচের স্কুলের ছাত্রী ছিল। ভালো নাচে বলে বেশ নামও ছিল। সেই ডালিয়া আর তার হবু স্বামী শামসুদ্দিন এখন সেক্টর টু'র হাসপাতালে। শামসুদ্দিনও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে শেষ বর্ষের ছাত্র ছিল।

চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে তৈয়ব আলীর চেহারা। তাকে কখনো দেখি নি, কিন্তু রুমীর মুখে শুনে শুনে মনে হয় তৈয়ব আলী এসে দাঁড়ালেই আমি তাকে চিনতে পারব। ঢাকার উপকণ্ঠে মাদারটেকে বাড়ি তৈয়ব আলীর। লেখাপড়া করেছে ক্লাস সিক্স সেভেন পর্যন্ত। আম কলা লিচু ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করত ক্র্যাকডাউনের আগে। কিন্তু বুকের ভেতরে ছিল দেশপ্রেম। মার্চের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্র্যাকডাউনের পর চলে যায় দু'নম্বর সেক্টরে। তৈয়ব আলীর সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি আশ্চর্য রকম। তার স্পষ্টবাদিতার কারণে মেলাঘরে সে খুব জনপ্রিয় ছিল না; কিন্তু এই গুণের জন্যই

রুমী তাকে বিশেষ চোখে দেখত। ক্রমে সেও রুমীর খুব ভক্ত হয়ে ওঠে। ক্যাম্পের অন্য ছেলেদের কথা তৈয়ব আলী তেমন শুনত না। তাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে হলে ছেলেরা রুমীকে গিয়ে ধরত। রুমী বললে তৈয়ব আলী বিনা প্রতিবাদে সব কাজ করে দিত। তৈয়ব আলী তার সাহস আর নিষ্ঠার জন্য খুব তাড়াতাড়িই সেক্টর টুতে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

তৈয়ব আলী এখন পিরুলিয়া ক্যাম্পে রুমীদের দলের সঙ্গেই রয়েছে। সেখানে সে সকালে নাশতা বানিয়ে রুমীদের খাওয়ায়। দুপুরে, রাতে রান্না করে রাখে, সারা দিনের পর রুমীরা ক্লান্ত হয়ে ফিরলে তাদের যত্ন করে খাইয়ে শুইয়ে দেয়।

রুমীর বন্ধুরা খেতে এলে সাধারণত মেলাঘরের কথাই জিগ্যেস করি। আজ সাহস করে ঢাকার কথা জিগ্যেস করে ফেললাম। অবশ্য ঘুরিয়ে। ক'দিন আগে গ্রীন রোডে এক দুঃসাহসিক অ্যাকশান হয়ে গেছে। কয়েকজন বিচ্ছু মিলিটারি ট্রাকে বোমা ছুঁড়েছে, গুলি করেছে। নানা লোকের মুখে যে আশ্চর্যজনক ঘটনাটা শুনতে পেয়েছি, তাহল—ট্রাকের পাকিস্তানি সৈন্যগুলো বিচ্ছুদের প্রতিআক্রমণ করার কোন চেষ্টা না করে পালিয়ে যায়। সেই কথার সূত্র ধরে বললাম, 'সত্যি সাহস বটে বিচ্ছুগুলোর আর আওয়াজ যা হয়েছিল না, সারা পাড়া কেঁপে উঠেছিল। আমার মা ধানমণ্ডি ছয় নম্বর রোডে থাকেন। তিনিও আওয়াজ পেয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, আমরা আজকাল দিনরাতের প্রায় সব সময়ই এত ধরনের আওয়াজ শুনি যে, ভেবেই পাই না তোমরা কি করে এত আওয়াজ কর। তবে মজা কি জানো, আজকাল ঐসব আওয়াজ না শুনলে আমাদের ঘুমই হয় না।'

আলম ছেলেটি কথা কম বলে (হয়তোবা আমার সামনে!), সে বেশ ধীরে-সুস্থে গম্ভীর গলায় আস্তে করে বলল, 'আপনাদের ঘুমানোর জন্য আওয়াজটা খুবই দরকার বলে মনে করছেন। কিন্তু ঢাকার মানুষের ঘুম পাড়ানোর ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য আমাদের মোটেও নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হল, খানসেনাদের দিনের আরাম, রাতের ঘুম হারাম করা, ওদেরকে সব সময় 'মুকুতের ভূত' দেখানো। খালেদ মোশাররফ এগুলোকেই সাইকোলজিক্যাল ওয়াফেয়ার বলেন।'

আমি আড়চোখে রুমীর দিকে তাকালাম। সে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে চুল্লুর সঙ্গে কি যেন বলছে। আমি গলা নামিয়ে আলমকে প্রশ্ন করে ফেললাম, 'বল না, তোমরা কিভাবে এগুলো কর।'

আলম বলল, 'এগুলো ছোট ছোট অ্যাকশান। এর কোনো ধারাবাহিকতা বা পূর্ব নির্ধারিত প্ল্যান থাকে না। এটা যে যার সুবিধেমত চলতে ফিরতে করে যাচ্ছে। নানা রকম জিনিস দিয়ে এগুলো করা হয়ে থাকে, তবে এর জন্যে সবচেয়ে উপযোগী যে জিনিসটা, তা হচ্ছে 'এ্যান্টি পার্সোনাল মাইন।' এগুলো খুব ছোট্ট সাইজের বিস্ফোরক, প্যান্টের পকেটে বা গাড়ির গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়।'

কথা বলতে বলতে আলম দেয়ালের পাশে কাপ-ডিস রাখার ছোট আলমারির দিকে আঙ্গুল তুলে বলল, 'ওটা কিসের কৌটো?'

তাকিয়ে দেখলাম, খাটো আলমারিটার মাথায় গ্লাস, ওষুধের শিশি-বোতলের সঙ্গে একটা ছোট কৌটো। বললাম, 'ওটা ওরিয়েন্টাল বাম' বলে একটা মলমের কৌটো। কপালে লাগালে মাথা ধরা ছেড়ে যায়।'

আলম হেসে বলল, 'ঐরকম ছোট টিনের কৌটোর চেয়ে একটু বড় দেখতে এই মিনি

মাইনগুলো। বলতে পারেন ডবল ওরিয়েন্টাল বাম। এগুলো বিচ্ছুরা সুযোগ-সুবিধেমত গাড়ির চাকার নিচে বসিয়ে দেয়। যে রাস্তা দিয়ে মিলিটারির কনভয় যাবে, আগে থেকে জানতে পারলে সেই রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে আসে। জীপ বা ট্রাকের চাকা মাইনের ওপর পড়লেই বিকট আওয়াজে চাকা ফাটে। বেশির ভাগ সময়ই গাড়ী উল্টে যায়।'

জামী হেসে বলল, 'ঐ ওরিয়েন্টার বামে খানসেনাদের মাথাধরা ছাড়ে না, আরো বেড়ে যায়।'

২৫ আগস্ট
বুধবার ১৯৭১

রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে একটু ২৮ নম্বর রোডে নামিয়ে দেবে?'

সাড়ে ছ'টা প্রায় বাজে। পশ্চিম আকাশে সূর্য লালচে হয়ে এসেছে। যেতে যেতে জিগ্যেস করলাম, 'কখন ফিরবি? নিতে আসব?' রুমী অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কখন ফিরব? কি জানি। ঠিক বলতে পারছি না। তা, আধঘণ্টা পরে এসো না হয় একবার।'

রুমীকে একটু যেন কেমন লাগছে। গতকাল দুপুরে খাওয়ার পর চলে গিয়ে আজই বিকেল পাঁচটার দিকে বাড়ি ফিরেছে। কি এক চাপা উত্তেজনায় ও চনমন করছে। মুখচোখ লালচে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে, সেটা চাপতে ওর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

ধানমণ্ডির ২৮ নম্বর রোডের যে বাড়িটায় ওদের আস্তানা, সেটার মালিক দিলারা হাশেম। সে তার স্বামী-সন্তান নিয়ে করাচিতে থাকে। বাড়িটা ভাড়া দিয়েছে রাইকার ল্যাবরেটরিজকে। চুল্লু অর্থাৎ মাসুদ সাদেক ঐ কোম্পানির ফিল্ড ম্যানেজার। বাড়িটা রাইকার ল্যাবরেটরিজ-এর অফিস, তাই অফিস বন্ধের পর দারোয়ান আর নাইটগার্ড ছাড়া আর কেউ ও বাড়িতে থাকে না।

রুমীকে নামিয়ে দিয়ে তক্ষুণি বাড়ি ফিরলাম না। আধঘণ্টা পরে তাকে নিয়ে আসতে বলেছে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় সে রাতে বাড়িতেই থাকবে। সুতরাং কিছু স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা যায় আজ। রুমী খেতে ভালোবাসে। ঢাকা ক্লাবে চলে গেলাম। স্মোক্‌ড্ হিলশা আর টিকেন ক্র্যাম্ব চপ কয়েক প্লেট নিলাম। নিতে নিতে আধঘণ্টা কেটে গেল। সুতরাং আবার চলে গেলাম ২৮ নম্বর রোডের বাড়িটায়। গেটের কাছে পৌঁছতেই দেখি একটা ফিয়াট ৬০০ বেরোচ্ছে। আমাকে দেখে গাড়িটা আমার ডানপাশে থামল। চালক হ্যারিস, রুমীর বন্ধু। ওকে দেখে আমিও থামলাম; কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ না করেই জিগ্যেস করলাম, 'রুমি আছে ভেতরে?' হ্যারিসও গাড়ির ভেতর থেকেই বলল, 'না চাচী, রুমী তো এই পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়ে গেল।' আমি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, 'ও, আচ্ছা, বেস্ট অব্ লাক।'

বাড়ি ফিরে এলাম। এখন সমস্ত ব্যাপারটাই অনিশ্চিত হয়ে গেল। রুমী বাড়ি ফিরবে কি ফিরবে না, খাবে কি খাবে না, কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবু খাবারগুলো গুছিয়ে রেখে ভাবলাম, ফ্রিজে কিমা রান্না করা আছে, কয়েকটা মোগলাই পরটা বানাই। রুমীর ভীষণ প্রিয়। আজ না আসে, কাল খাবে।

আধঘণ্টাও কাটে নি, দরজায় ঘন ঘন। বেল টিপে আর যেন ছাড়েই না; শরীফ, জামী ওপরে বাবার কাছে। আমিই রান্নাঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই

হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল রুমী, কাজী আর অচেনা একটি অল্প বয়সী ছেলে। আমি অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। তিনজনেরই মুখ লাল। ঠোঁট টিপে শান্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হল ওদের ভেতর চাপা উল্লাস আর হাসি ফুলে ফুলে উঠছে। রুমী ঢুকেই দরজা বন্ধ করে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলল, 'আম্মা, ওপরে চল, কথা আছে।'

দোতলায় রুমীর ঘরে এসে সবাই ঢুকলাম। হলে বসা শরীফ আর জামী আমার হাতের ইশারায় পিছু পিছু এল। রুমী চাপা আনন্দ আর উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, 'আম্মা, আব্বু, আমরা একটা অ্যাকশান করে এলাম এই মাত্র। সাত-আটটা খানসেনা মেরে এসেছি।'

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল, 'বলিস কিরে?'

আনন্দ-ডগমগ গলায় কাজী বলল, 'হ্যাঁ চাচী, ১৮ নম্বর রোডে। ওখানে একটা বাড়ির সামনে আমরা সবাই গাড়ি থেকে গুলি করে খানসেনা মেরে পাঁচ নম্বর রোড দিয়ে আসছিলাম। মিলিটারি জীপ পিছু নিয়েছিল। রুমী তাই দেখে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে গুলি চালায়। ওর দুই পাশ থেকে স্বপন, বদিও গুলি করে। জীপ উল্টে সবগুলো মরেছে।'

রুমী বলল, 'আম্মা দেখ, আমার ঘাড়ে, কাঁধে স্টেন থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে কি রকম ফোসকা পড়ে গেছে। রাস্তায় মিলিটারি ধরলে এইটার জন্যই ফেঁসে যাব।'

রুমীর সার্টের কলার সরিয়ে দেখলাম ঘাড়ে-গলায়-কাঁধে অনেকগুলো কালো কালো ছোট ছোট ফোসকা। সার্টও ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। জিগ্যেস করলাম 'কি করে হল?'

রুমী বলল, 'স্টেনগান ফায়ার করার সময় তার গা দিয়ে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোয়। আমার ঘাড়ের দু'পাশ থেকে বদি ভাই, স্বপন ভাই ফায়ার করেছে তো, তাই আগুনের ফুলকিগুলো আমার গায়েই পড়েছে।' তারপর হাসতে বলল, 'উঃ। কানে এমন তালা লেগে গেছে, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।'

ডেটল-তুলো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে করতে বললাম, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে কি কাণ্ড? কি করে করলি?'

'বলব পরে। পাশের গলিতে এক বাড়িতে অস্ত্র রেখে এসেছি। এক্ষুণি নিয়ে আসতে হবে। তোমাকে যেতে হবে গাড়ি নিয়ে। মহিলা ড্রাইভার দেখলে ওরা গাড়ি থামাবে না—আশা করা যায়। আমি যাব তোমার সঙ্গে। কাজী ভাই, সেলিম, তোমরা ছাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমরা অস্ত্র নিয়ে আসছি। আম্মা, দুটো ছালা নিয়ে নাও। আব্বু, আমরা যাবার পর পোর্চের বাতি নিভিয়ে রেখ। যদি মেহমান আসে, তাহলে জ্বালিয়ে রেখ। পোর্চে বাতি দেখলে আমরা ঢুকব না।'

নিচে নেমে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বারেককে বললাম, 'ভাত আর ডাল চড়াও।' স্টোর থেকে দুটো বস্তা বের করে নিলাম।

গাড়ি ব্যাক করে রাস্তায় নামলাম। রুমী পেছনে বসল। পাশের গলিটা একেবারে পাশেই। মেইন রোডে উঠে দুটো বাড়ির পরেই। গলিতে ঢোকার মুখে রুমী চাপা স্বরে বলল, 'একদম গলির শেষ মাথায় চলে যাও।' বলাবাহুল্য, এ গলিটাও কানা, আমাদের গলির মতই।

আমিও ফিসফিসিয়ে বললাম, 'শেষ মাথায় বাড়িটা হাই সাহেবের যে! ওই বাড়িতে?'

'না। ঢুকে দুটো বাড়ির পরে, ডান-হাতি। কিন্তু গাড়িটা শেষ মাথায় নিয়ে আগে দেখব কেউ ফলো করছে কি না।'

গলির শেষ বাড়িটা ইঞ্জিনিয়ার হাই সাহেবের। ডান-হাতি। গেট খোলা ছিল। গাড়ি ভেতরে ঢোকালাম। হাই সাহেব দোতলায় থাকেন। একতলাটা ভাড়া। পোর্চ বেশি বড় নয়। গাড়ি ঢুকিয়ে বের করতে হলে ব্যাক করে রাস্তায় নামতে হয়। আমরা গাড়ি থেকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামলাম। একতলার সামনের দিকের ঘরের জানালার পর্দা বাতাসে উড়ছে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। খাটে বসে চারজন লোক তাস খেলছে। পাশে চেয়ারে তিন-চারজন মহিলা, পুরুষ কথা বলছে। সবাই খেলা আর আড্ডা নিয়ে এমনিই মগ্ন যে মাত্র চার ফুট দূরে বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল, কেউ একবার চোখ তুলেও তাকাল না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেটের মুখে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রুমী বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি হেঁটে গিয়ে দেখে আসি ও বাসায় বাইরের লোক কেউ আছে কি না।'

আমি বৃষ্টির ফোঁটা এড়াবার জন্য একতলার ঐ জানালাটার পাশেই দেয়াল ঘেঁষে একবার দাঁড়াই, আবার অস্থির হয়ে গেটের কাছে যাই। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে, ভেতরে উজ্জ্বল আলোয় বসে সাত-আটটি নরনারী তাস খেলছে, কলকণ্ঠে কথা বলছে, তুমুল হাসিতে ভেঙে পড়ছে, ভয় হচ্ছে এই বুঝি কেউ জানালার বাইরে তাকিয়ে 'কে, কে?' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ একবারও ভুলেও জানালার দিকে তাকাচ্ছে না। আমার খুব স্বস্তি লাগছে, আবার আশ্চর্যও লাগছে। এমন দিনকাল, একতলার জানালার বাইরেই গাড়ি থামছে, লোক নামছে, কেউ কেউ আবার সন্দেহজনভাবে ঘোরাফেরাও করছে, তারা একবার খেয়ালও করবে না? মনে হচ্ছে আমি অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, লোকগুলোও অনন্তকাল ধরে ঐ রকম হাসি-গল্প-আড্ডা-খেলায় মেতে রয়েছে। যেন কার অভিশাপে ওরা বিশ্বসংসার ভুলে ওইরকম কল্‌বল্‌ করছে।

রুমি ফিরে এসে চুপি চুপি বলল, 'চল। আস্তে চালাবে।'

গাড়ি ব্যাক করে আবার গলিতে। নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে রুমী থামতে বলল। এবার বাঁয়ে গাড়িটা। আমি গেট ঘেঁষে গলিতেই গাড়ি পার্ক করে গাড়িতে বসে রইলাম। রুমী বস্তা দুটো নিয়ে ভেতরে চলে গেল। তার ফিরে আসার সাড়া পেতেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পেছনের বুটি খুলে দিলাম।

এ গলি থেকে পাশের গলি—কতটা পথ? পোয়া মাইল? তাও হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু বুকে এমন ধুকপুকুনি, হাতে-পায়ে এমন গিঁট-ছাড়া ভাব, মনে হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল চালিয়ে এসেছি।

পোর্চের বাতি নেভানো। শরীফ, জামী বুঝিবা দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থামতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল। রুমী বুটি খুলল। সঙ্গে সঙ্গে গেট দিয়েও কে যেন ঢুকল। আমরা আঁতকে উঠলাম। কিন্তু না, বাইরের কেউ নয়, মাসুম। শরীফ, জামী টুক করে বস্তা দুটো তুলে ঘরে ঢুকে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ছাদের ঘরে। এতক্ষণে আমার হাতে-পায়ে জোর ফিরে এসেছে, ধুকপুকুনির বদলে বুকে এখন উত্তেজনার জোয়ার। বললাম, 'বের কর তো, দেখি তোদের কি রকম অস্ত্র।' 'রুমী, কাজী বস্তা খুলে সাবধানে অস্ত্র বের করে জাজিমের ওপর রাখল। পাঁচটা স্টেনগান, একটা পিস্তল, দুটো হ্যান্ড গ্রেনেড। জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমি, শরীফ, জামী, মাসুম—চারজনের হুমড়ি খেয়ে বসে অস্ত্রগুলো হাতে তুলে উল্টেপাল্টে দেখলাম, সেগুলোর গায়ে হাত বুলোলাম, হ্যান্ড গ্রেনেড দুটোও একটু ছুঁয়ে দেখলাম। রুমীরা এগুলোকে বলে 'পাইন অ্যাপ্‌ল-

আনারস।' যতই আনারস বলুক, এগুলো মোটেই আনারসের মতো নিরীহ নয়।

আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম, 'বল দেখি কি করে কি করলি—' কিন্তু শরীফ থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওসব পরে শুনব। এগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখব, তাই ঠিক করে আগে।'

অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক হল, নিচের উঠোনে পানির যে বিরাট হাউজটা আছে, সেটার ভেতরে একটা টুল বসিয়ে তার ওপর অস্ত্র রাখা হবে। হাউজটা চওড়ায় আট ফুট, লম্বায় দশ ফুট, উঁচুতে তিন ফুট। তার এ মাথার এক কোণে লোহার তৈরি গোল একটা ম্যানহোল, এইটে দিয়ে হাউজটার ভেতরে নামা যায়। হাউজটা এখন কানায় কানায় ভর্তি। আমাদের প্যান্ট্রিতে কয়েকটা ঠুল আছে, সেগুলো সোয়া দু'ফুট উঁচু। হাউজের নিচের ট্যাপটা খুলে দেওয়া হল খানিকটা পানি বেরিয়ে যাবার জন্য। একটা টুল ভেতরে বসাল যেন তার বসার জায়গাটা পানির ওপর জেগে থাকে। বারেককে কিছু একটা কিনতে রশীদের দোকানে পাঠানো হল। জামী হাউজের ভেতরে নেমে টুলটা দূরতম কোণে নিয়ে বসাল। অস্ত্রগুলো ছালা দুটোতে ভরে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঐ টুলের ওপর রাখা হল। যদি রাতে মিলিটারি আসেও, ওই পানিভর্তি হাউজের ঢাকনা খুলে তাকায়ও, তাহলে টলটলে পানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। কারণ এখান থেকে উঁকি দিয়েও ওই কোণার টুল দেখা যায় না। টুল আবিষ্কার করতে হলে কাউকে হাউজের ভেতর নামতে হবে।

একটু পরে কাজী আর সেলিম চলে গেল। সেলিম ছেলেটিকে এই প্রথম দেখলাম। শুনলাম, ও শাহীন স্কুলের ছাত্র, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। এপ্রিলেই মেলাঘরে চলে গিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর রুমীকে ঘিরে আমরা চারজনে বসলাম। ওদের এই চমকপ্রদ অ্যাকশানের কথা শুনবার জন্য আর তর সইছিল না। রুমি যা বলল, তা হলো এই :

ধানমণ্ডির বিশ নম্বর রাস্তার একটা বাড়িতে চাইনিজ এমব্যাসির কোন বড় কর্তা বাস করে। সে বাড়ির সামনে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি মিলিটারি পুলিশ পাহারা দেয়। আঠার নম্বর রোডের একটা বাড়ির সামনেও বেশ সাত-আটজন মিলিটারি পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনুমান হয়, ও বাড়িতে কোন ব্রিগেডিয়ার থাকে। কয়েকদিন থেকেই বদি, আলমের মাথায় চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। গতকাল হঠাৎ বদি, আলম, শাহাদত এরা মিলে প্ল্যান অব অ্যাকশান ঠিক করে ফেলে। ২৫ আগস্ট সন্ধ্যা রাতে কয়েকটা অ্যাকশান হবে—বদি, আলম, কাজী, রুমীরা একটা গাড়িতে, হ্যারিস, মুক্তার, জিয়ারা আরেকটা গাড়িতে। পাঁচ মাস আগে এই ২৫ তারিখের রাতেই বিবেকহীন বর্বর হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিচ্চুরা উপলব্ধি করে এই তারিখে এমন কিছু করা দরকার, যাতে সামরিক জান্তা ভালো মত নাড়া খায়।

রুমীরা পিরুলিয়া গ্রামে ওদের ক্যাম্প থেকে দরকারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে আজকেই দুপুরে। হ্যারিস আর জাহির গুলশান লেকের ঘাট থেকে রুমীদেরকে দুটো গাড়িতে তুলে ২৮ নম্বর রোডের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর বদি, আলম একদিকে, হ্যারিস, মুক্তার অন্যদিকে—এই দু'দল দু'দিকে বেরিয়ে যায় দুটো গাড়ি হাইজ্যাক করতে। বদি, আলম, ধানমণ্ডি চার নম্বর রোড থেকে একটা মাজদা গাড়ি হাইজ্যাক করে। গাড়িটা ছিল আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের বড় ছেলে মাহবুব আনামের। হ্যারিসরা একটা ফিয়াট ৬০০ হাইজ্যাক করে ধানমণ্ডি ২২ নম্বর রোডের মোড় থেকে।

ঠিক হয় : আলম, বদি, কাজী, রুমী, স্বপন ও সেলিম প্রথমে ধানমণ্ডিতে অ্যাকশান করবে। হ্যারিস, জিয়া, মুক্তার, আনু ও আরো দুটো ছেলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে। আলমরা গিয়ে ওদের সঙ্গে জয়েন করবে। তারপর দু'গাড়ি মিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের গেটে এবং তারপর শহরের অন্যান্য দিকে সুযোগ-সুবিধেমত আরো কিছু অ্যাকশান করবে।

রুমীটা যখন বেরোয়, শাহাদত জিগ্যেস করে, 'হোয়াট আর ইয়োর টার্গেস? কোন দিকে যাচ্ছ?' আলম জবাব দেয়, 'ডেস্টিনেশান-আননোন। টার্গেট-মোবাইল।'

রুমীরা সন্ধ্যা ৭.২৫ মিনিটে ২৮ নম্বর রোড থেকে বেরিয়ে ৩২ নম্বর দিয়ে পুল পেরিয়ে ডাইনে ও বাঁয়ে ঘুরে ২০ নম্বর রোডে পড়ে। গাড়ি চালাচ্ছিল আলম, তার বাঁ পাশে প্রথমে সেলিম ও তারপরে কাজী। পেছনের সিটে মাঝখানে রুমী, তার ডান পাশে (অর্থাৎ আলমের ঠিক পেছনে) স্বপন, বাঁ পাশে বদি। চাইনিজ ডিপ্লোম্যাটের বাসার সামনে গিয়ে দেখে পুলিশগুলো নেই। ওরা হতাশ হয়। আলম বলে তাহলে ১৮ নম্বরে যাই। ১৮ নম্বর রোডে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে সাত-আটজন মিলিটারি পুলিশ বেশ মৌজ করে গল্প করছে, সিগারেট খাচ্ছে।

আলম বলল, 'ব্রিগেডিয়ার সাহেব বাড়ি নেই নিশ্চয়, তাই খুব হেলে-বেঁকে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে। অলরাইট বয়েজ, ইউ হ্যাভ থ্রি মিনিট্স। আমি সামনের সাত মসজিদের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।'

এখন বাড়িটা ডান হাতে রয়েছে। গাড়ি ঘুরিয়ে আনলে বাড়িটা বাঁয়ে পড়বে। তাহলে গাড়ির বাঁদিকে বসা কাজী ও বদি সামনের পেছনের দুই জানালা দিয়ে ফায়ার করতে পারবে। গাড়ি ঘুরিয়ে আনতে আনতে আলম নির্দেশ দিল কাজী, সেলিম আর বদি গুলি করবে, রুমী ও স্বপন নজর রাখবে, ও তরফ থেকে কেউ অস্ত্র তোলে কি না, তুললে তাদের শেষ করার ভার রুমী আর স্বপনের।

গাড়ি ধীরগতিতে বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবার সময় আলমের চাপা গলার কম্যান্ড শোনা গেল : 'ফায়ার।' অমনি গাড়ির দুই জানালা দিয়ে ঝলকে ঝলকে ছুটে গেল স্টেনগানের গুলি। দুটো স্টেন থেকে দুই লেভেলে গুলি গেল—বদির স্টেন থেকে ওদের পেটের লেভেলে, কাজীর স্টেন থেকে ওদের বুকের লেভেলে। সেলিমও কাজীর সামনে দিয়ে বাঁয়ে ঝুঁকে গুলি করল। পুলিশগুলো গল্পের মৌজে ছিল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধপাধপ পড়ে গেল সাত-আটটা তাগড়া শরীর। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তার পরই গাড়িটা হঠাৎ যেন জেটের গতিতে গিয়ে ঢুকল ২০ নম্বরে, তাদের আগের টার্গেটে। কিন্তু ওদের কপাল মন্দ। চীনা ডিপ্লোম্যাটের বাসা সামনে এখনো কোন প্রহরী নেই। কি হতে পারে? কিন্তু আলমদের দেরি করার উপায় নেই। অ্যাকশানটা মনোমত হল না। কিন্তু কি করা?

এরপর আলম ধানমণ্ডির ভেতরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে সাত নম্বর রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে মিরপুর রোডে পড়ে। ডাইনে মোড় নেয় নিউ মার্কেটের দিকে মুখ করে। পাঁচ নম্বর রোডের মুখ বরাবর আসতেই ওরা দেখে কি—সামনে লাইন ধরে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। তার মানে ওখানে মিলিটারি চেকপোস্ট বসে গেছে, গাড়ি চেক হচ্ছে। তার মানে, ১৮ নম্বর রোডের বাড়ির সামনে এম. পি. মারার খবর এর মধ্যেই ওরা জেনে গেছে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আলম। সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড। দুটো ট্রাক মিরপুর রোড জুড়ে এদিক পানে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জীপ রাস্তার ডানদিকে, সেটার মুখও এদিকেই ফেরানো। আরেকটা জীপ, রাস্তার বাঁপাশে পেট্রল পাম্পটার সামনে নিউ মার্কেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। এবং মাটিতে, রাস্তার ওপর দু'জন শুয়ে—এল.এম.জি. নিয়ে।

আলম যেমন ভেবে রেখেছিল, দু'জন এম.পি. হাত উঠিয়ে চেঁচিয়ে গাড়ি থামাতে বলতেই সে হেডলাইট অফ্ করে ডানদিকে টার্ন নেবার ইনডিকেটার দিয়ে সামান্য ডানদিকে ঘুরবার ভাব দেখাল। এম.পি. দুটো চেঁচিয়ে একটা গাল দিয়ে বলে উঠল, 'কিধার যাতা হ্যায়?' সঙ্গে সঙ্গে আলম তীব্রগতিতে বাঁয়ে টার্ন নিল। বদি আর রুমী এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও-ই এলেমজি নিয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। ফায়ার!' আলমও চেঁচিয়ে উঠল, 'ফায়ার!' ঠাঠা ঠাঠা করে স্বপন ও বদির স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি ছুটে গেল। রুমী স্টেন হাতে সিটের ওপর হাঁটু চেপে উল্টো হয়ে বসে পেছনের কাচের ভেতর দিয়ে এদিক-ওদিক দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকল—ওদিক থেকে কারো হাতের অস্ত্র উদ্যত হচ্ছে কিনা। আশ্চর্যের ব্যাপার ওদিক থেকে একটাও গুলি ছুটে এল না। তার মানে মাটিতে শোয়া আর্মি দু'জন খতম, অন্যরা ঘটনার দ্রুততা ও আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে। এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আলম গাড়ি পাঁচ নম্বর রোডে ঢুকিয়ে ফেলেছে। রোডটা অল্প একটুখানি গিয়েই গ্রীন রোডে পড়েছে। প্রায় গ্রীন রোডে গাড়ি পৌঁছে গেছে, এমনি সময় হঠাৎ রুমীর চোখে পড়ে একটা মিলিটারি জীপ তাদের পিছু নিয়েছে। সে সেই তখন থেকেই পেছনের সিটে উল্টো বসে কাচের ভেতর দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'লুক, লুক, আ জীপ ইজ ফলোয়িং আস।' এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্টেনের বাঁট দিয়ে আঘাত করে পেছনের কাচ ভেঙে ফায়ার শুরু করে জীপটার ওপর। একই সঙ্গে রুমীর দুই পাশ থেকে বদি এবং স্বপনও ফায়ার শুরু করে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে। ক'জন মরল তার হিসেব না পেলেও জীপের ড্রাইভার যে প্রথম চোটেই মরেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ব্রাশ ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গেই জীপটা হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোড়ের ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে ধাক্কা খেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল। সেই মুহূর্তে আলম আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বাঁদিকে টার্ন নেবার ইনডিকেটার লাইট জ্বালিয়ে বাঁয়ে গ্রীন রোডের দিকে একটু ঘুরেই শাঁ করে তীব্রগতিতে ডাইনে ঘুরে আবার নিউ মার্কেট মুখো হলো। এবং ঝড়ের গতিতে সেই পেট্রল পাম্পটার অন্য পাশ দিয়ে নিউ এলিফ্যান্ট রোডের দিকে গাড়ি ছোটাল। আলম ছাড়া বাদ বাকি সবাই পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, যেমনটি আলম ভেবেছিল—ট্রাক দুটো, বাকি জীপটা গ্রীন রোডের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে বিচ্ছু গাড়িটাকে ধরবার জন্য!

এতক্ষণে গাড়ির ভেতরের সবাই স্বস্তির প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। নিউ এলিফ্যান্ট রোডে ঢুকে তবে আলম আবার হেড লাইট জ্বালল।

এবার ওরা চিন্তা করতে লাগল অস্ত্রগুলো কোথায় রাখা যায়। গাড়িটা তাড়াতাড়ি ডাম্প করা দরকার। ঝির-ঝির করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। আমাদের গলির পরের গলিতে আলমদের পরিচিতি ঐ ভদ্রলোকের বাড়িতে অস্ত্র রেখে রুমী, কাজী, সেলিমকে মেইন রোডে নামিয়ে আলম, বদি আর স্বপন গাড়ি নিয়ে চলে গেছে সুযোগমতো কোথাও গাড়িটা ফেলে রেখে বাড়ি চলে যাবে।

২৭ আগস্ট
শুক্রবার ১৯৭১

খাওয়ার টেবিল ঘিরে সবাই বসেছে—বদি, আলম, কাজী, স্বপন, চুল্লু, রুমী, জামী, মাসুম। শুধু শরীফ নেই, তার আজ ডি.সি.জি, আর-এ লাঞ্চের দাওয়াত। টেবিলের ওপর সাজানো পোলাও, কাবাব, চপ, রোস্ট, কোর্মা, পটল-ভাজি, সালাদ। রুমীর আবদারে আজ এই ভোজের আয়োজন। সবাই খেতে খেতে গত পরশুর কথাই আলোচনা করছে। গাড়িটা আলমরা ভূতের গলিতে একটা বাড়ির সামনের খোলা লনে পার্ক করে রেখে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছিল বলে রাস্তায় লোক ছিল না, ফলে ওদের কেউ দেখে নি। রিকশাও ছিল না, বৃষ্টির মধ্যেই বেশ খানিকটা হেঁটে হাতিরপুল বাজার পর্যন্ত এসে তারপর রিকশা পায়।

কানে এল আলম রুমীকে বলছে, 'উঃ! খুব সময়ে তুই কাচ ভেঙে গুলি করেছিলি, নইলে কেউই বাঁচতাম না আমরা।'

রুমীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আর তুইও অমন চালাকি করে গ্রীন রোডের সিগনাল দিয়ে এলিফ্যান্ট রোডে না ছুটলে ওদের হাতে ঠিক ধরা পড়ে যেতাম। থ্যাংকস ফর টেকিং দ্যা রাইট ডিসিশান অ্যাট দা রাইট মোমেন্ট।'

বদি হাসতে হাসতে বলল, 'চাচী, এই দুর্দান্ত সাহসী ছেলে দুটোকে খুব ভালো করে খাইয়ে দ্যান তো। ওদের জন্যই আজ আমরা জানে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'সাহসী তোমরা সবাই। তোমাদের রিফ্লেক্স নিখুঁত। অপূর্ব তোমাদের টিমওয়ার্ক। তোমরা সবাই দুর্দান্ত।'

কাজী আফসোস করে বলল, 'জুয়েলটার বড় মন খারাপ। সে আমাদের আজকের অ্যাকশানে থাকতে পারল না। আগে কতগুলো অ্যাকশানে সে ছিল। চল আলম, আজ ওরে দেখতে যাই।'

জুয়েল আছে আলমদের বাড়িতে, ওর বোনেদের হেফাজতে।

খাওয়া শেষ হলেও গল্প শেষ হতে চায় না। দেয়ালে ঝোলানো কোকিল ঘড়ির কোকিলটা তার ছোট্ট ঘরের দরজা খুলে মুখ বের করে চারবার কুকু কুকু করে ডাকল।

বাইরে পোর্চে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ির দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে তিন-চারজনের গলার স্বর। ওরা সবাই চকিত হয়ে একই সঙ্গে কথা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল এবং পায়ের আগার ওপর ভর দিয়ে নিঃশব্দে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

জামী গিয়ে দরজা খুলল। আমিও পিছু পিছু গেলাম বসার ঘরে। শরীফের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন দাদাভাই, মোর্তুজা, ফকির। ঢুকেই মোর্তুজা চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন, 'শুনেছেন ভাবী কি কাণ্ড? পরশু সন্ধ্যা রাতে ১৮ নম্বর রোডে বিচ্ছুরা এক সাংঘাতিক অ্যাকশান করেছে। এক ব্রিগেডিয়ারের বাড়ির সামনে আট-দশটা এম.পি.কে মেরে দিয়ে চলে গেছে। তারপর পাঁচ নম্বর রোডের মোড়ে আরেক সাংঘাতিক কাণ্ড। ঐ রাতেই আরেক দল বিচ্ছু একটা জীপে গুলি মেরে একেবারে উল্টে দিয়েছে। জীপে যারা ছিল, সবাই মারা গেছে।'

আমাকেও চোখ বড় বড় করতে হল, 'বলেন কি? এই রকম বেপরোয়া কাণ্ডকারখানা? ওদের সাহস আছে বলতে হয়! কি করে যে করে। কারাই বা করে? কোথায় থাকে বিচ্ছুগুলো? ধরা পড়েছে নাকি কেউ?'

'না ভাবী, কাউকেই ধরতে পারা যায় নি। ওরা কি মানুষ, না জ্বীন? চোখের সামনে দিয়ে নাকি উধাও? সারা শহরে একেবারে হুলস্থূল পড়ে গেছে।'

ফকির খুব আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল, 'সারা শহরে কি যে হচ্ছে আজকাল। যখন-তখন আসাদগেটে, মোহাম্মদপুরে, গুলিস্তানে, নবাবপুরে সবখানে গাড়ি, বাস, চাকা ফেটে উল্টে যাচ্ছে। আজ সকালে দেখি কার্জন হলের কোণের চৌমাথায়—বাংলা একাডেমির দিকের যে চৌমাথাটা—ওইখানের আয়ল্যান্ডটার পাশে এক ডবল-ডেকার উল্টে পড়ে আছে। বারো চোদ্দজন বিহারি, রাজাকার, মিলিশিয়া ওটাকে তুলে সরাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

জামী আস্তে করে বলল, 'ডবল ওরিয়েন্টাল বাম।'

ফকির চমকে বলল, 'কি বললে বাবা?'

'কিছু না চাচা। মাথা ধরেছিল। ওরিয়েন্টাল বাম দিয়েছিলাম। ছাড়ে নি, উল্টো মাথাধরা বেড়ে গেছে।

২৮ আগস্ট
শনিবার ১৯৭১

২৫ আগস্ট রাতের অ্যাকশনের গল্প আর ফুরোচ্ছে না, মানে আমিই ফুরোতে দিচ্ছি না। এর আগে ঢাকায় যত অপারেশন, অ্যাকশান হয়েছে, সবগুলোর বিবরণ লোকমুখে শোনা। এই প্রথম আমি প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষকর্মীর মুখে জানতে পারছি অ্যাকশানের বিস্তারিত বিবরণ।

অন্যদিকে একটা অসুবিধাও হচ্ছে। আগের মত বন্ধুবান্ধব ও পড়শীদের সঙ্গে শোনা কথায় অংশ নিতে পারছি না, মানে শুধু শুনেই যাচ্ছি, নিজের অনুমান কিছু যোগ করতে পারছি না। কি জানি যদি কেউ সন্দেহ করে বসে! তাই মোর্তুজা ভাইরা, বাঁকারা, ফকিররা যখন ২৫ রাতের অ্যাকশান সম্বন্ধে ডাল-পালা বিস্তারিত নানা কথা বলতে থাকেন, তখন শরীফ, জামী, আমি শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে অবাক হই আর চুপ করে শুনি!

আজ হ্যারিস এসেছে দুপুরে খাওয়ার সময়। রুমীর অনেকদিনের বন্ধু। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় থেকেই বন্ধুত্ব। একটা শখে দু'জনের মিল আছে—তবলা বাজানোতে। হ্যারিসের বাবা হাসিব সাহেবও ইঞ্জিনিয়ার, শরীফের কয়েক বছরের সিনিয়র।

২৫ তারিখ সন্ধ্যায় হ্যারিসদের অ্যাকশানের কি হয়েছিল, আজ তা শুনলাম ওর মুখে।

সেই সন্ধ্যায় হ্যারিসরা তাদের হাইজ্যাক করা ফিয়াট ৬০০তে ছয়জন ছেলে গাদাগাদি করে বসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারপাশের রাস্তা দিয়ে কয়েকবার চক্কর দেয়। কিন্তু আলমদের গাড়ির কোনো পাত্তা দেখতে পায় না। তারা তো আর জানে না, আলমরা কি ঘাপলার মধ্যে পড়েছে। খানিক পরে গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে, পানি দিতে হবে, কোথায় পানি পাওয়া যায়—এই চিন্তাভাবনা করতে করতে ওরা শাজাহানপুর বাজারের কাছে মুক্তারের চেনা একটা পানের দোকানে গিয়ে পানি চাইল। ছেলেগুলো গাদাগাদি করে বসেছিল, নিজেরাও গাড়ি থেকে নামল একটু হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার জন্য। স্টেন হাতের ওদের নামতে দেখে মুহূর্তে বাজারের

লোকজন খালি। ওরা গাড়িতে পানি ভরে আবার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারপাশের রাস্তা ধরে কয়েকটা চক্কর দিল। শেষে আলমদের না পেয়ে হতাশ হয়ে নিজেরা কিছু একটা করবে বলে কাকরাইলের দিকে রওনা দেয়। কাকরাইলের মোড়ে কয়েকজন বাঙালি পুলিশ 'হল্ট' বলে ওদের থামায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হ্যারিসরা 'বাঙালি পুলিশ মারব না' বলে সিদ্ধান্ত নেয়, একই সঙ্গে বাঙালি পুলিশরাও 'ওরে বাবা! মুক্তিবাহিনী' বলে ওদের দিক থেকে চোখ উঠিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যারিস দ্রুত গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে দারুল কাবারের দিকে যায়। দারুল কাবাবে মাঝে-মাঝে পাঞ্জাবি আর্মি অফিসাররা টিক্কা তন্দুরী কাবাব এসব খেতে আসে। ওরা গিয়ে একটা আর্মি জীপ দাঁড়ানো দেখে। জিয়া বলে, গাড়িটা ইউটার্ন দিয়ে ঘুরিয়ে আন। তাহলে জীপটা মেরে মগবাজাবের দিকে পালিয়ে যেতে সুবিধে হবে। হ্যারিসদের লাক খারাপ, ওরা ইউটার্ন করে ঘুরে দারুল কাবাবের সামনে এসে দেখে জীপ উধাও!

কথার মাঝখানে রুমী হাসতে হাসতে বলল, 'শুধু স্কিল হলেই হয় না, লাকও লাগে। লাক ফেভার না করলে হাজার স্কিলও ভণ্ডুল।'

হ্যারিস বলল, 'তা ঠিক। কাউকে মারতে পারলাম না বটে কিন্তু লাক খুব খারাপ ছিল না। তাইতো দুই নম্বর রোডে ফেরার সময় মিলিটারি চেকপোস্টে ধরা পড়ি নি।'

হ্যারিসরা দারুল কাবাব থেকে পিজি হাসপাতালের মোড় হয়ে এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে দুই নম্বর রোডে ঢোকার আগের ট্রাফিক পোস্টটার কাছে আসে। বাঁদিকে দুই নম্বর রোডের মুখে একটা জীপ নজরে পড়ে। হ্যারিস বলে 'লেট্‌স অ্যাটাক দ্যাট জীপ।' সঙ্গে সঙ্গে জিয়া বলে ওঠে, 'থাম্‌ থাম্‌। জীপটার পেছনে লাইট নেভানো কয়েকটা ট্রাক দেখা যায় যেন।' তখন ওরা ঠাহর করে দেখে জীপটার পেছনে লাইট নেভানো বেশ কয়টা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। আরো খেয়াল হয় সোজা সামনে মিরপুর রোডেও যেন অনেক গাড়ি, লোকজন। ওরা তখনো বোঝে নি যে মাত্র বিশ পনের মিনিট আগেই ওইখানে আলমরা অ্যাকশন করে গেছে। ওরা বাঁয়ে ঘুরে দুই নম্বর রোড দিয়ে সাতমসজিদ রোড পেরিয়ে ২৮ নম্বরে যায়।

আলমরা কথামত রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যায় নি বলে হ্যারিসরা প্রথমে রাগ করেছিল, কিন্তু পরদিন দুপুরে যখন জানতে পারে যে, কি রকম সাক্ষাৎমৃত্যুর ছোবল থেকে ওরা বেঁচে বেরিয়ে এসেছে, তখন আর রাগ থাকে না। এরকম দুঃসাহসিক অ্যাকশানের জন্য সবাই আলমদের ধন্য ধন্য করতে থাকে।

হ্যারিস বলল, 'চাচী, রুমী তো হিরো হয়ে গেছে। ও যেভাবে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে গুলি করেছে, সে রকম কাহিনী আমরা এতদিন কমিক বইতে পড়েছি, বিদেশী সিনেমায় দেখেছি। আমারই বন্ধু এরকম একটা কাজ করেছে ভেবে আমারও খুব গর্ব হচ্ছে।'

চেয়ে দেখলাম, রুমীর মুখ গর্বে, লজ্জায়, খুশিতে লাল হয়ে উঠেছে। ক'দিন থেকে বন্ধুদের মুখে ও এইসব কথাই শুনছে। আমি বললাম, এরকম কোনো একটা অ্যাকশানে কোন একজনকে কিন্তু হিরো বলা যায় না। আসল হিরো হচ্ছে পুরো টিমটাই। প্রত্যেকটি সদস্যের নির্ভুল রিফ্লেক্স আর পারফেক্ট সেন্স অব টাইমিং থাকলে যে নিখুঁত টিমওয়ার্ক হয় তার ফলেই অ্যাকশানে সাফল্য আসে।

হ্যারিস বলল, 'চাচী গতকাল আমি তূর্যদের বাড়িতে গেছিলাম। রুমীরা যে বাড়ির

সামনে খানসেনা মেরেছে, তার উল্টোদিকের বাসায় তূর্যের বাবা-মা থাকে। তূর্যতো ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলে রয়েছে। তুর্যকে চেনেন কি? ঐ যে খুব ভালো ফুটবল খেলে। সালাউদ্দিন ভালো নাম। আমার বন্ধু।'

'চিনি। শুধু তূর্য নয়, তূর্যের মা সিমকিকেও চিনি একেবারে ছোটবেলা থেকে। তূর্যের এক চাচা শুকুর সাহেব রুমীর আব্বার বন্ধু।'

'রুমীরা আসলে কতগুলো মারতে পেরেছে, সেটা জানবার জন্যই ওখানে গেলাম। কিন্তু মুখে বললাম, 'কেমন আছেন খালাম্মা? আপনাদের খোঁজ নেবার জন্য এলাম।' তূর্যের মা বললেন, 'আর বোলো না বাবা, দু'দিন আগে সন্ধ্যার মুখে একটা গাড়িতে মুক্তিবাহিনী এসে সামনের বাসার সবকটা গার্ডকে মেরে দিয়ে গেছে।' তূর্যের মা সেই সময় সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি থেকে গুলির শব্দ হতেই উনি তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে চুপিচুপি দোতলায় উঠে একটা জানালার ফাঁক দিয়ে সব দেখেন। বাড়ির সামনে যতগুলো গার্ড ছিল, সবক'টা মরেছে।'

বিকেল হতেই হ্যারিস চলে গেল। রুমী রেকর্ড প্লেয়ারে জিম রিভ্‌সের একটা রেকর্ড চড়িয়ে চৌকিতে আমার পাশে এসে বসল। আমি বললাম, 'তুই দেখছি এবার জিম রিভ্‌স বেশি শুনছিস!'

রুমীর স্বভাবটা বরাবরই এরকম। যে শিল্পীর গান ওর ভালো লাগে, পারলে তার সবগুলো রেকর্ড কিনে ফেলে। এবং একেক সময় একেক শিল্পী ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এভাবেই গত কয়েক বছরে আমাদের বাড়িতে জমে উঠেছে শচীন দেব বর্মনের, ফিরোজা বেগমের, টম জোন্‌সের, জিম রিভ্‌সের যতগুলো রেকর্ড ঢাকায় পাওয়া যায়—সবগুলো। বইয়ের ব্যাপারেও তাই।

রুমী বলল, 'এই রেকর্ডটা আজ চুল্লু ভাইয়ের বাসা থেকে নিয়ে এসেছি। কালই ফেরত দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'আজ চুল্লু, আলম, ওরা কেউ আসে নি।'

'আলম ঢাকায় নেই। আজ ভোরে শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে মেলাঘরে গেছে।'

'হঠাৎ?'

'ওরা গেল ঢাকায় কিছু ভারি অস্ত্র আনা যায় কিনা, তার খোঁজ খবর করতে। তাছাড়া এখানে এখন প্রচুর টাইম-পেন্সিল আর পি. কে. দরকার। সেগুলোও আনবে ওরা।'

'ভারি অস্ত্রটা কি?'

'এল.এম.জি.। ঢাকার গেরিলাদের এখনো পর্যন্ত হালকা অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে—স্টেন, এস.এম.জি. গ্রেনেড, বিস্ফোরক—এইসব। এল.এম.জি. ভারিও বটে, দামীও বটে। একটা ধরা পড়লে বহুত লস্‌। তবে ঢাকায় এখন যে রকম উন্নত ধরনের গেরিলা অ্যাকশান হচ্ছে, তাতে আমাদের খুব বিশ্বাস ভারি অস্ত্র এলে আরো বড় বড় টার্গেট হিট করতে পারব। তাই ঢাকার গেরিলাদের ইচ্ছে কয়েকটা এল.এম.জি. আসুক। আলম, শাহাদত ভাই, খালেদ মোশাররফ, হায়দার ভাইয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য গেছে। জান আম্মা, যদি এল.এম.জি. আসে ঢাকায়, তাহলে প্ল্যান আছে ছয় সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটা বড় ধরনের অ্যাকশান করা হবে।'

'কেন, ছয় সেপ্টেম্বর কি জন্য?'

'পাকিস্তান সরকার ঐদিন প্রতিরক্ষা দিবস পালন করার আয়োজন করছে। সব যদি ঠিকঠাকমত চলে, তাহলে ঐদিন ঢাকার সমস্ত গেরিলা কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে একই

সময়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা পয়েন্ট হিট করতে পারে—রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্যারেড গ্রাউন্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ কেন?'

'ওখানে যে প্রতিরক্ষা দিবসের জন্য খুব প্যারেড, পিটির প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে, তাই। জান আম্মা, ঢাকায় এখন নয়টা গেরিলা গ্রুপ রয়েছে। ছয় তারিখের প্ল্যানটা যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে আরো অনেক গেরিলা এর মধ্যে ঢাকা চলে আসবে।'

'আর তোদের সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের প্ল্যানটা?'

'ওটাও আছে। ওটার জন্যও পি. কে. আনবে ওরা।'

জিম রিভ্‌সের গলা থেমে গেল। রুমী উঠে রেকর্ডের পিঠ পাল্টে দিয়ে এসে আবার বসল, 'আচ্ছা আম্মা, তোমরা ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পার না।'

আমি চমকে বললাম, 'কেনরে?'

'তোমরা ঢাকায় না থাকলে আমার পক্ষে অ্যাকশান করতে আরো সুবিধে হত।'

'কোথায় যাব? আর যাবার জায়গা যদিবা পাই, খুঁজলে হয়ত পেয়েও যাব, তাহলেও তোর দাদাকে নিয়ে যাবই বা কি করে?'

'দাদাকে কিছুদিন ফুপুর বাড়িতে রেখে দিলে হয় না?'

'তাহলে তো আরো তুলকালাম লেগে যাবে। তোর দাদা তা হলে আসল ব্যাপার সব বুঝে যাবে, তখন আপসেট হয়ে তার ব্লাড প্রেসার ভীষণ বেড়ে যাবে। স্ট্রোক হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। না রুমী, তা হয় না।'

রুমী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। জিম রিভ্‌স বেজে বেজে এক সময় থামল। রুমী উঠে আরেকটা রেকর্ড লাগাল, বলল, আম্মা গানটা শোন মন দিয়ে।'—

টম জোনসের 'গ্রীন গ্রীন গ্রাস' গানটা বেজে উঠল। বহুবার শোনা এ গান। রুমী এটা প্রায়ই বাজায়। শুনতে শুনতে সুরটা আমারও প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে, যদিও ইংরেজি গানের কথা বিশেষ বুঝি না। তিন মিনিটের গানটা শেষ হলে রুমী আস্তে আস্তে বলল, 'গানটার কথাগুলো শুনবে? এক ফাঁসির আসামী তার সেলের ভেতর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল সে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছে। সে ট্রেন থেকে নেমেই দেখে তার বাবা-মা আর প্রেয়সী মেরী তাকে নিতে এসেছে। সে দেখল তার আজন্মের পুরনো বাড়ি সেই একইরকম রয়ে গেছে। তার চারপাশ দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সবুজ সবুজ ঘাস। তার এত ভালো লাগল তার মা-বাবাকে দেখে, তার প্রেয়সী মেরীকে দেখে। তার ভালো লাগল গ্রামের সবুজ সবুজ ঘাসে হাত রাখতে। তারপর হঠাৎ সে চমকে দেখে সে ধূসর পাথরের তৈরি চার দেয়ালের ভেতরে শুয়ে আছে। সে বুঝতে পারে সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল।—'

আমি বলে উঠলাম, 'চুপ কর রুমী, চুপ কর।' আমার চোখে পানি টলমল করে এল। হাত বাড়িয়ে রুমীর মাথাটা বুকে টেনে বললাম, 'রুমী। রুমী। এত কম বয়স তোর, পৃথিবীর কিছুই তো দেখলি না। জীবনের কিছুই তো জানলি না।'

রুমী মুখ তুলে কি একরকম যেন হাসি হাসল। মনে হল অনেক বেদনা সেই হাসিতে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন একটা কথা আছে না আম্মা? হয়তো জীবনের পুরোটা তোমাদের মত জানি না, ভোগও করি নি, কিন্তু জীবনের যত রস-মাধুর্য-তিক্ততা-বিষ—সবকিছুর স্বাদ আমি এর মধ্যেই পেয়েছি আম্মা। যদি চলেও যাই, কোন আক্ষেপ নিয়ে যাব না।'

২৯ আগস্ট
রবিবার ১৯৭১

আজ হাফিজ ঢাকায় এসেছে তার গ্রামের বাড়ি থেকে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হাফিজ গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল মাকে নিয়ে। ঢাকার বাসায় শুধু ওর বড় ভাই ওয়াহিদ ছিল। তা সেও তো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে চিংকুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল।

বিকেলে হাফিজ বাসায় এল রুমীর কাছে এ কয় মাসের সব ঘটনা শুনবে বলে। কিন্তু কোথায় রুমী? সে সকালে নাশতা খেয়ে জিম রিভ্‌সের রেকর্ডখানা হাতে করে বেরিয়েছে, বলে গেছে—দুপুরে ওদের মিটিং আছে, তারপর ও যাবে চুন্নুর বাসায়।

হাফিজকে বললাম, 'কি জানি কোথায় গেছে। ওকি কিছু বলে আমাকে? কি যে করে বেড়ায়, আল্লাই জানে। সব গোল্লায় গেছে।' হাফিজ কাঁচুমাচু মুখে বলার চেষ্টা করল, যা খুশি যা-তা করে বেড়াবার মত ছেলে রুমী নয়।

রুমী এল সন্ধ্যারও পর। হাফিজকে দেখে খুশিতে জড়িয়ে ধরে ছাদের ঘরে চলে গেল নিরিবিলি কথা বলার জন্য।

রাত ন'টায় খেতে ডাকলাম। নেমে রুমী বলল, 'আম্মা হাফিজ রাতে থাকবে এখানে। আমাদের গল্প শেষ হয় নি।'

রুমী-জামীর ঘরের একপাশে একটা ক্যাম্পখাট পেতে হাফিজের জন্য বিছানা পাতল রুমী-জামী মিলে। তারপর রুমী বলল, 'আম্মা মাথাটা কেন জানি খুব দপ্‌দপ্ করছে। ভালো করে বিলি করে দাও তো।'

আমি রুমীর মাথার কাছে বসে ওর চুলে বিলি কাটতে লাগলাম, জামী, হাফিজ নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে খুব নিচুস্বরে কথা বলতে লাগল। মাসুম পাশের ঘরে শোয়—সে উঠে এসে জামীর খাটে বসল। দু'ঘরের মাঝের দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল। কথার শব্দ যেন বাবার কানে না যায়।

সাইড টেবিলে রেডিওটাও খোলা রয়েছে। একের পর এক বাংলা গান হচ্ছে। খুব সম্ভব কলকাতা। হঠাৎ কানে এল খুদিরামের ফাঁসির সেই বিখ্যাত গানের কয়েকটা লাইন।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
ওমা হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী।

রুমী বলল, 'কি আশ্চর্য আম্মা! আজকেই দুপুরে এই গানটা শুনেছি। রেডিওতেই, কোন স্টেশন থেকে—জানি না। আবার এখনো—রেডিওতে। একই দিনে দু'বার গানটা শুনলাম, না জানি কপালে কি আছে।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নিচে গেটে ধমাধম শব্দ আর লোকের গলা শুনে চমকে জেগে উঠলাম। বাড়ির সামনের পুবদিকের জানালার কাছে উঁকি দিয়ে দেখি—সর্বনাশ! সামনের রাস্তায় মিলিটারি পুলিশ। রাস্তার উজ্জ্বল বাতিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে রুমীদের ঘরে গিয়ে দেখি ওরা চারজনেই পাথরের মূর্তির মত ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ঘরের পশ্চিমের জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম পেছনে বজলুর রহমান, সাত্তার, কাসেম সাহেবদের বাড়িগুলোর সামনের রাস্তাতেও অনেক মিলিটারি পুলিশ। দক্ষিণের জানলা দিয়ে দেখলাম ডাঃ এ. কে. খান ও হেশাম সাহেবের বাড়ির সামনের জায়গাটাতেও পুলিশ। উত্তর দিকের জানালা দিয়ে দেখলাম

আমার পুরো বাগান ভরে মিলিটারি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে! অর্থাৎ বাড়িটা একবারে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে।

আবার রুমীদের ঘরে গেলাম। রুমী দু'একবার অস্থিরভাবে পায়চারি করে বলল, 'কোনদিক দিয়েই পালাবার ফাঁক নেই। মনে হয় হাজারখানেক পুলিশ এসেছে। রাস্তার বাতিগুলোও এমন জোরালো, একেবারে দিনের মত করে রেখেছে।'

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম, কোনোখান দিয়ে কোনোভাবে রুমীকে পার করে দেয়া যায় কিনা! না, কোনদিক দিয়েই কোন ফাঁক নেই। পুরো বাড়িটার যতো জানালা সবক'টাতে গ্রিল, পুরো বারান্দা কঠিন গ্রিলে আবদ্ধ। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে পেছনের উঠানে নামবে, তারও উপায় নেই। পেছনের বাউন্ডারি ওয়াল খুব নিচু। পেছনের রাস্তার বাতি আর অসংখ্য পুলিশের চোখ এড়িয়ে উঠান দিয়েও পালানো সম্ভব নয়।

ওদিকে সামনের গেটে অসহিষ্ণু হাতের ধমাধম বাড়ি আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের হাঁকডাক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমি আর শরীফ পরস্পরের দিকে তাকালাম। এই মুহূর্তে আমার মনের ভেতরে কোন অনুভূতি আমি টের পাচ্ছি না। ভয়-ভীতি-উদ্বেগ সব ফ্রিজ হয়ে আমি যেন পুতুল নাচের পুতুল হয়ে গেছি। কেউ দড়ি দিয়ে যেন আমাকে ঘোরাচ্ছে, ফেরাচ্ছে, চালাচ্ছে। শরীফের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চল, সামনের বারান্দায় বেরিয়ে জিগ্যেস করি, কি চায়।'

দু'জনে পুবদিকের ছোট বারান্দায় বেরোলাম। শরীফ বলল, 'কে ডাকেন? কি চান?'

নিচে থেকে কর্কশ গলায় উর্দুতে কেউ বলল, 'নিচে এসে দরজা খুলুন। এত দেরি করছেন কেন?'

শরীফ আবার বলল, 'ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। এত রাতে কি দরকার?'

এবার অন্য একজন একটু মোলায়েমভাবে উর্দুতে বলল, 'বিশেষ কিছু নয়। দরজা খুলুন।'

আমি আর শরীফ দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলাম। দেয়ালে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম বারোটা বেজে দশ মিনিট।

সদর দরজা খুললেই পোর্চ। রাতে সামনে-পেছনে কোলাপসিবল গেট টেনে নিলে ওটা গ্যারেজ হয়ে যায়। শরীফ দরজা খুলে কোলাপসিবল গেটের ভেতর থেকে লাগানো তালা খুলে গেট ফাঁক করল। একজন খুব অল্পবয়সী আর্মি অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে ও পেছনে তাগড়া চেহারার অনেকেই। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'হোয়াট ক্যান উই ডু ফর ইউ?'

অফিসারটি হাত তুলে সালাম দেবার ভঙ্গি করে ইংরেজিতে বলল, 'আমার নাম ক্যাপ্টেন কাইয়ুম। তোমাদের বাড়িটা একটু সার্চ করব।'

আমি বললাম, 'কেন, কি জন্য?'

'এমন কিছু না। এই রুটিন সার্চ আর কি। তোমাদের বাড়িতে মানুষ কয়জন? কে কে থাকে?'

আমি বললাম, 'আমি, আমার স্বামী, শ্বশুর, দুই ছেলে, ভাস্তে—'

'ছেলেদের নাম কি?'

'রুমী, জামী—'

ওরা এগিয়ে এল। আমি একটু পাশ কেটে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দ্যাখো, আমার শ্বশুর বুড়ো, অন্ধ, হাই ব্লাড প্রেসারের রুগী। তোমাদের প্রতি অনুরোধ, তোমরা শব্দ না করে

বাড়ি সার্চ কর। উনি যেন জেগে না যান।'

ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে দেখলে মনে হয় কলেজের ছাত্র। ফর্সা, পাতলা গড়ন, খুব মৃদুস্বরে ধীরে কথা বলে। তার সঙ্গের সুবেদারটি দোহারা, মধ্যবয়সী। উর্দু উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় বিহারী।

ক্যাপ্টেন কাইয়ুমের সঙ্গে ঐ সুবেদার আর তিন-চারজন সশস্ত্র এম.পি ঘরের ভেতরে ঢুকল। এবং মুহূর্তে কয়েকজন একতলায়, কয়েকজন দোতলায় ছড়িয়ে পড়ল। অভ্যস্ত নিপুণতার সঙ্গে ওরা প্রত্যেকটি ঘরের আলমারি, দেরাজ চেক করে দেখল, পেছনের দরজা খুলে উঠানে উঁকি মারল, বাবার ঘরে পা টিপে টিপে হাঁটল, রুমীদের সবাইকে নাম জিগ্যেস করে নিচে নেমে যেতে বলল। আমি প্রায় সব সবই ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'কেন, ওদের নিচে যেতে বলছ কেন?'

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বলল, 'কিছু না, একটুখানি রুটিন ইন্টারোগেশান করব।' শরীফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও নিচে আসুন।' ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিচে নেমে এসে দেখলাম রুমী, জামী, মাসুম আর হাফিজ পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম পোর্চে এসে শরীফকে বলল, 'এটা আপনার গাড়ি? চালাতে পারেন?' শরীফ ঘাড় নাড়লে সে বলল, 'আপনি গাড়ি চালিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন।'

আমি ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম শান্ত মৃদুস্বরে বলল, 'এই তো একটু রমনা থানায়। রুটিন ইন্টারোগেশান। আধঘণ্টা পৌনে একঘন্টার মধ্যেই ওরা ফিরে আসবে।'

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতে কয়েকজন পুলিশ গাড়ির পেছনে উঠে বসল। আমি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলাম, 'আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।'

শরীফ এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি, এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি থাক। বাবা একলা।'

তবু আমি বলতে লাগলাম, 'না, না, আমি যাব।'

বিহারি সুবেদারটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, 'মাইজী, আপুনি থাকেন, এনারা এক ঘোন্টার মধ্যে ওয়াপস আসে যাবেন।' শরীফ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় নীরবে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। আমি হঠাৎ যেন সম্বিত পেয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তাকিয়ে দেখলাম কয়েকজন পুলিশ রুমী, জামী, মাসুমদের হাঁটিয়ে রওনা হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম শরীফের পাশের সিটে উঠে বসল। শরীফ গাড়ি ব্যাক করে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম সেই শূন্য পোর্চে। তারপর বাড়ির ভেতর ঢুকে সব ঘরের সবগুলো বাতি একে একে জ্বালিয়ে দিতে লাগলাম। সদর দরজা হাট করে খোলা রইল, আমি দোতলায় উঠে গেলাম। বাবার ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। যে বাতিগুলো অফ ছিল, সেগুলো সব জ্বেলে দিলাম। তারপর আবার একতলায় নেমে পোর্চে গিয়ে দাঁড়ালাম। একবার গলির মাঝখানে দাঁড়াই, আবার পোর্চে ফিরে আসি, মাঝে-মাঝে বারান্দায় বসি। আধঘণ্টা গেল, একঘণ্টা গেল, দেড়ঘণ্টা গেল। ওরা ফিরে আসে না।

আমি ঘর-বার করতে লাগলাম। আমাদের গলির বিহারি নাইটগার্ডটা মাঝে-মাঝে এসে আমাকে বলতে লাগল, 'মাইজী, আপনি আন্দরে যান।' আমি তার কথায় কান দিলাম না। সদর দরজা খোলা রেখে আবার দোতলায় গেলাম, ছাদে গেলাম, আবার নিচে নেমে এলাম। এবার নাইটগার্ড বলল, 'মাইজী, আপনি দরবাজা খুলা রেখে

আন্দরে যাবেন না। দরবাজা বন্দো করিয়ে দেন।' আমি এবারও তার কথায় কান দিলাম না। গলি দিয়ে হেঁটে মেইন রোডের মুখ পর্যন্ত গেলাম, আবার ফিরে এলাম। নাইটগার্ডটা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'মাইজী, আপনি নিন্দ যাবেন না?'

নিন্দ? ওকি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে? ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম কি নামবে?

৩০ আগস্ট
সোমবার ১৯৭১

ভোর হয়ে আসছে। ওরা এখনো ফেরেনি। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বলেছিল আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টা পরে ফিরবে। আমিও সে বিশ্বাসে ঘর-বার করে পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম? ওরা তো সোজাসুজি ধরে নিয়ে যেতে পারত কিছু না বলে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম মিথ্যে কথা বলল তাহলে?

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম গাড়িতে উঠার আগে ওর ফোন নম্বরটা জিগ্যেস করেছিলাম। কেন জিগ্যেস করেছিলাম? তাহলে কি অবচেতন মনে আমারও সন্দেহ ছিল যে ওরা অত তাড়াতাড়ি ফিরবে না?

ঘড়িতে ছ'টা বাজল। জুবলীর বাসায় ফোন করলাম। জুবলীর ভাইয়ের ছেলে হাফিজ আমাদের বাসা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে—তাকে খবরটা আগে জানানো দরকার। একটা আশার কথা, জুবলীর বড় ভাই ফরিদ এখন ঢাকার ডি.সি। উনি হয়তো এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবেন।

তারপর ফোন করলাম মঞ্জুরকে, মিকিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে জুবলী, মাসুমা আমাদের বাসায় এসে গেল। ওদের দেখে এতক্ষণে এই প্রথম আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওরা আমাকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইল। সান্ত্বনার ভাষা কারো মুখে নেই। ওরাও তো সমান দুঃখে দুঃখী। একজনের স্বামী, অন্যজনের ভাই বর্বর পাকবাহিনীর বন্দিশালায়।

একটু পরে নিজেকে সামলে বাবার ঘরে গেলাম ওঁকে উঠিয়ে মুখ-হাত ধুইয়ে হলে ইজিচেয়ারে বসাতে। জুবলী, মাসুমা রান্নাঘরে গেল বারেককে নিয়ে কিছু চা-নাশতার ব্যবস্থা করতে।

বাবাকে তুলতেই উনি বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, 'মাগো, তুমি কেন? মাসুমা কই?'

আমি প্রাণপণে গলা স্বাভাবিক রেখে বললাম, 'ওরা চারজনেই ভোরবেলা উঠে সাভার গেছে। আজ ওখানে হাটবার কিনা, সস্তায় কিছু বাজার করে আনবে।'

বাবা আর কিছু বললেন না।

'ওঁকে চা-নাশতা খাইয়ে নিচে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসলাম। শুধু এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খেতে পারলাম না, মাসুমা, জুবলীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও।

হঠাৎ গেটের কাছে গাড়ির শব্দ হল। দৌড়ে পোর্চে বেরোলাম। একটা সাদা গাড়ি। শরীফরা ফিরে আসছে! আমাকে দৌড়ে গেটের কাছে যেতে দেখেই কিনা জানি না গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে গলিতেই থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিরাশায় মন ভরে গেল। গাড়িতে মাত্র একজন আরোহী—সে-ই চালাচ্ছে। গাড়িটাও টয়োটা, আমাদের হিলম্যান মিংকস্ নয়। দরজা খুলে চালক নামতেই দেখলাম—স্বপন! তার গায়ে টক্‌টকে লাল একটা

জামা, চুল উস্কখুস্ক, চোখ লাল, মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সে কিছু বলার আগেই আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'শিগগির পালাও স্বপন। রুমী ধরা পড়েছে। কাল রাতে আর্মি এসে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নিয়ে গেছে। শিগগির চলে যাও এখান থেকে। এভাবে গাড়িতে একা ঘুরো না। কোথাও লুকিয়ে থাক।'

স্বপনের মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোল না। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসতেই আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম। সে গেটে গাড়ি ঢুকিয়ে ব্যাক করে বেরিয়ে চলে গেল। আমি শূন্য মন নিয়ে ঘরে এসে বসলাম। দশ মিনিট যেতে না যেতেই দরজায় খুব আস্তে ঠুকঠুক নক্। আমি লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলতেই দেখি দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে—শুকনো মুখ, চোখের চাউনিতে চাপা ভয়। ওরা ঘরে ঢুকলে বললাম, 'তুমি শাহাদত চৌধুরীর ছোট ভাই ফতে না? আর তুমি জিয়া। তোমরা কেন এসেছ? শিগগির পালাও। কাল রাতে রুমীকে নিয়ে গেছে, ঐ সঙ্গে বাড়ির সবাইকে।'

ফতে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমাদের বাড়িও রেইড হয়েছে। আর্মি আমার সেজো দুলাভাইকে ধ'রে নিয়ে গেছে।'

'আর কাউকে নিয়েছে?'

'না, আমি কাল বিকেলেই খবর পেয়েছিলাম, সামাদকে ধরেছে। আমি আমার ছোট দুই বোনকে নিয়ে হাটখোলার বাড়ি থেকে অন্যখানে চলে গেছিলাম, সেজো দুলাভাই ক'দিন আগেই গ্রাম থেকে ঢাকা এসেছিলেন। তাই উনি আব্বা-মা'র সঙ্গে বাড়িতেই ছিলেন।'

'তোমরা আর দাঁড়ায়ো না। তাড়াতাড়ি চলে যাও।'

ফতে আপসোস আর দুঃখভরা স্বরে বলল, 'আমি এ বাড়ি চিনতাম না। কাল রাতে আন্দাজে এ গলি সে গলি অনেক খুঁজেছি—যদি রুমীকে খবরটা দিতে পারি—আজ সকালে জিয়াকে পেয়ে—জিয়া এ বাসা চেনে—তা কোন লাভ হল না—'

কথা অসমাপ্ত রেখেই ফতে আর তার পাশে মাথা নিচু করে জিয়া বেরিয়ে গেল।

পড়শীরা একে একে আসতে শুরু করেছেন। তারা সবাই রাতে জেগে উঠে নিজ নিজ ঘরের মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু কেউ দরজা খুলতে সাহস পান নি। সানু, মঞ্জু, খুকুর হেফাজতে আমাকে রেখে মাসুমা, জুবলী পরে আবার আসবে বলে বিদায় নিল।

আটটার সময় থেকে আর্মি এক্সচেঞ্জে ফোন করতে লাগলাম ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে চেয়ে। কিন্তু কোন হদিস করতে পারলাম না। একবার বলে 'উনি এখনো আসেন নি।' আরেকবার শুনি 'এই এক্সটেন্সান ওনার নয়।' অন্য এক্সটেন্শান নম্বর দেয়—সেখানে চাই, তারা আবার অন্য একটা নম্বর দেয়।

ন'টার সময় মঞ্জুর, মিকি বাসায় এলেন। বাঁকা ঢাকায় নেই, চাটগাঁয়। মঞ্জুর মিকি সব শুনে বললেন, 'অফিসে গিয়ে খোঁজখবর করি। দেখি কি করা যায়।'

সাড়ে ন'টার সময় দরজায় কলিং বেল বাজল। দৌড়ে গিয়ে খুলে দেখি, হাফিজ। একা।

হাফিজকে টেনে ঘরের ভেতর এনে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, 'হাফিজ! তুই এসেছিস বাবা। তুই একা কেন? তোর খালু কই? রুমী, জামী, মাসুম?'

হাফিজের পরনে লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি দলামোচড়া, ধুলোময়লা মাখা। চোখে-মুখে গভীর যন্ত্রণার ছাপ। সে এমনিতেই খুব আস্তে কথা বলে, এখন গলার স্বর প্রায় শোনাই গেল না, 'জানি না।'

ওর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে ওকে আগে বসালাম। প্রথমে ও পানি খেল দুই গ্লাস। তারপর ওকে চা এনে দিলাম এককাপ। ও একটু সুস্থির হয়ে বলল—ওদেরকে প্রথমে

মেইন রোডে নিয়ে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে সামনে একটা জীপের হেডলাইট জ্বালিয়ে সবাইকে সনাক্ত করে। তারপর রুমীকে আলাদা করে নিয়ে ওদের জীপে ওঠায়। হাফিজ, মাসুম, জামীকে শরীফের গাড়িতে উঠতে বলে। শরীফকে বলে তাদের জীপটাকে ফলো করতে। কয়েকজন পুলিশও রাইফেল হাতে শরীফের গাড়িতে ওঠে। মেইন রোডে ঐ জীপটা ছাড়াও আরো কয়েকটা জীপ ও লরি দাঁড়িয়েছিল। ওরা জীপ ফলো করে এয়ারপোর্টের উল্টোদিকে এম.পি.এ. হোস্টেলে যায়। সেখানে ওদের সবাইকে নিয়ে একটা ঘরে রাখে। সেখানে সারারাত ধরে ওদের সবার ওপর খুব মারধর করা হয়েছে।

বলতে বলতে হাফিজের ঠোঁট কেঁপে গেল। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, এখন আর বলতে হবে না। তুই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খেয়ে একটু বিশ্রাম কর। তোর চাচাকে ফোন করি।'

হাফিজের খুব ইচ্ছে নয় চাচাকে ফোন করার। এই চাচার সঙ্গে ওদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। ও বলল, জেবিসকে জানালেই হবে।

জুবলীকে ফোন করে বললাম, হাফিজকে ছেড়ে দিয়েছে। হাফিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চাচা ফরিদকে ফোন করে জানালাম সমস্ত ব্যাপারটা। এই বিপদে আত্মীয়ের ওপর অভিমান রাখতে নেই।

মিকি, মঞ্জুরকেও ফোন করে হাফিজের কাছ থেকে পাওয়া খবরগুলো জানালাম।

হাফিজ ওপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে খানিক বিশ্রাম করে জুবলীদের বাসায় চলে গেল।

আমি খানিক পরপরই আর্মি এক্সচেঞ্জে ফোন করে চলেছি। সেই বিহারি সুবেদার তার নাম বলেছিল সফিন গুল। কাইয়ুম নেই বললে গুলকে দিতে বলি। তাকেও পাওয়া যায় না।

ওপরে বাবা খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন—শরীফরা এখনো ফিরছে না কেন?

আতাভাইকে ফোন করেছি, বাদশাদের এবং অন্য আত্মীয়দের খবর দিতে। ভাবছি আতাভাই বা ইলা-বাদশারা এলে তারপর বাবাকে আসল কথাটা বলতে হবে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত শরীফদের কোন খবর নেই। মঞ্জুর-মিকি ওরা সারাদিন এই ব্যাপার নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। কিন্তু এখনো কোন হদিস লাগাতে পারে নি।

আমি সারাদিনে ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বা সুবেদার সফিন গুল কাউকেই ফোনে ধরতে পারি নি। ভাবছি ব্যাপারটা কি? ওরা মিছে নাম বলে যায় নিত?

সারাদিন ধরে বাসায় লোকজন আসছে—আতাভাইরা, ইলা-বাদশারা, কলিম, হুদা, নজলু, মা, লালু, আতিক, বুলু। পেছনের রাস্তার বজলুর রহমান সাহেবের স্ত্রী, কাসেম সাহেব, সাত্তার সাহেব। এ রাস্তার সব পড়শী, মাসুমা, জুবলী আবার বিকেলে, মিনি ভাই, রেবা, লুলু, চাম্মু। আমার হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, এদের প্রাণে কি ভয়ডর নেই? এরা যে এত আসছে? মেইন রোডের মুখে নিশ্চয় সাদা পোশাকের আই.বি'র লোক নজর রাখছে। এদের তো বিপদ হতে পারে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ কপাল খুলে গেল, ফোনে সুবেদার সফিন গুলকে পেয়ে গেলাম। সফিন গুল খুবই বিনয়ের সঙ্গে জানাল 'ইন্টারোগেশানে কুছু দেরি হোচ্ছে, আপুনি কুছু ফিকির কোরবেন না। উনারা ইন্টাররোগেশান শেষ হোলেই বাড়ি চলে যাবেন।'

আমি বললাম, 'ওরা কেমন আছে? কি এত ইন্টারোগেশান? আমি কি আমার স্বামী কিংবা ছেলে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

সফিন গুল একটু দ্বিধা করে বলল, 'ঠিক আছে। ডাকছি কোথা বোলেন।'

একটু পরে জামীর গলা শুনতে পেলাম 'মা—আমি জামী—'

আমি একেবারে উচ্ছ্বসিত ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, 'জামী, কি ব্যাপার তোদের এখনো ছাড়ে নি কেন? কেমন আছিস তোরা?'

'রুমী কেমন আছে? তোর আব্বু? মাসুম?'

জামী সেই রকম ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল,

'ভালো।—এখন ছাড়ি।'

'জামী-জামী, তোরা খেয়েছিস কিছু?'

'না'।

'বলিস কি? এখনো কিছু খেতে দেয় নি? দে তো সুবেদার সাহেবকে ফোনটা—'

ফোনে সুবেদারের সাড়া পেয়ে আমি বললাম, 'এখনো পর্যন্ত ওদের কিছু খেতে দেন নি? কাল রাত বারোটায় নিয়ে গেছেন এখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা—এতক্ষণ পর্যন্ত ওরা না খেয়ে রয়েছে? আপনার দোহাই সুবেদার সাহেব, ওদের কিছু খেতে দিন। না হয় ওদের কাছ থেকেই টাকা নিয়ে কিছু কিনে এনে দিন।'

সুবেদার 'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, আভি দেতা হ্যায়' বলে ফোন রেখে দিল। আমি খানিকক্ষণ থম ধরে বসে বসে ফুললাম। তারপর হঠাৎ কান্নায় মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়লাম।

৩১ আগস্ট
মঙ্গলবার ১৯৭১

আরো একটা ঘুমহারা রাত পার হয়ে এলাম। কাল থেকে অবশ্য লালু আর মা এ বাড়িতে রয়েছেন। সাড়ে দশটায় মঞ্জুর আর মিকি আসবেন, আমাকে নিয়ে এম.পি.এ. হোস্টেলে যাবেন। সকালে উঠেই মা আর লালুকে নিয়ে স্যান্ডউইচ বানাতে বসেছি। বেশকিছু স্যান্ডউইচ আর ওদের সবার জন্য একপ্রস্থ করে কাপড় নেব। পরশু রাত থেকে শোবার কাপড় পরে আছে। কি মনে করে শরীফের শেভিং সেটটা কাপড়ের প্যাকেটের মধ্যে ভরে নিলাম। কি জানি, যদি আরো কয়েকদিন না ছাড়ে।

বেলা এগারোটার দিকে এম.পি.এ. হোস্টেলে পৌঁছলাম। মঞ্জুর গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আর পাশে মিকি। আমি প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে পেছনের সিটে বসেছিলাম। ড্রাম ফ্যাক্টরির রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঢুকল ডানে—এম.পি.এ. হোস্টেলের গেটে পুলিশ দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল। ঢুকেই সামনে চওড়া খোলা লন, বাঁয়ে বিরাট এম.পি.এ. হোস্টেল, সার সার ঘর। সামনে চওড়া টানা বারান্দা। বিভিন্ন ঘরে ইউনিফর্ম পরা লোকজন ব্যস্তভাবে চলফেরা করছে—বিভিন্ন ধরনের ইউনিফর্ম। বোঝা যায়, সাধারণ সেপাই থেকে বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের অফিসার—সবাই রয়েছে ওর মধ্যে।

মিকি বললেন, 'তুমি গাড়িতেই বসে থাক। আমরা আগে খোঁজ নিয়ে আসি।' মিকি, মঞ্জুর সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় লোকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে বিভিন্ন ঘরে ঢুকতে লাগলেন। আমি বসে বসে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। এইখানেই ওদেরকে এনেছে। এই ঘরগুলোর কোন একটাতে রেখেছে নাকি? ইয়া আল্লা, কোনগতিকে কারো মুখ যদি একঝলক দেখতে পেতাম! তাহলে এক্ষুণি গাড়ি থেকে দৌড়ে ওদের কাছে চলে যেতাম।

মিকি, মঞ্জুর ফিরে এসে বললেন, এখানে না। এর পেছন দিকের আরেকটা বাড়িতে যেতে বলল।

মঞ্জুর আবার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় নামলেন। এম.পি.এ. হোস্টেল পেরিয়ে আরো খানিক গিয়ে আবার ডাইনে একটা গলিতে ঢুকলেন। একটুখানি গিয়ে বাঁয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামলেন। এবার গলিতেই গাড়ি রেখে আমরা তিনজনেই নামলাম। গেট দিয়ে ভেতর ঢুকে একে ওকে জিগ্যেস করতে করতে এঘর-ওঘর করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি একটু দূরে বারান্দা দিয়ে সফিন গুল যাচ্ছে। আমি 'সুবেদার সাহেব, সুববেদার সাহেব' বলতে বলতে দ্রুত পা চালিয়ে তাকে ধরলাম। গুল আমাকে দেখে চমকে গেল। আমি এক নিশ্বাসে বললাম, 'সুবেদার সাহেব আমি ওদের খবর নিতে এসেছি। ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওদের জন্য কিছু খাবার আর কাপড় এনেছি। সুবেদার সাহেব, আমাকে ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।'

সুবেদার গুলের মুখ দেখে মনে হল সে ফাঁপরে পড়েছে। গম্ভীর মুখে বলল, 'ওরা তো এখানে নেই। অন্য জায়গায় আছে। আচ্ছা আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' মিকি, মঞ্জুরের দিকে তাকিলে বলল, 'ওনারা এখানেই অপেক্ষা করুন।'

আমি সুবেদার সফিন গুলের পেছন পেছন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে টেবিলের পেছনে চেয়ারে এক অফিসার বসে আছেন, ঘরের ভেতরে এবং দরজার কাছাকাছি তিন-চারজন সশস্ত্র মিলিটারি পুলিশ। সুবেদার গুল উর্দুতে অফিসারটিকে কি কি যেন বলল, আমি ঠিকমত বুঝলাম না, যেন বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমার চোখ খালি জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—যদি হঠাৎ শরীফকে দেখতে পাই। একটু পরে গুল আমাকে সম্বোধন করে বলল, 'মাইজী, ওনারা তো এখন এখানে নাই। ওনারা ক্যান্টনমেন্টে আছেন। এখন তো দেখা হবে না। আপনি বাড়ি চলে যান।'

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, 'আমি এখানে অপেক্ষা করি? ওরা এখানে ফিরবে তো?'

সুবেদার সফিন গুল গম্ভীর মুখে বলল, 'মাইজী, আপনি বাড়ি চলে যান। এখানে অপেক্ষা করার সুবিধা নাই। আপনি পরে খবর নেবেন। নিজে আসবেন না। অন্য লোক দিয়ে খবর নেবেন।'

আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, 'তাহলে এই প্যাকেট দুটো রাখেন। ওদের কাপড় আর কিছু খাবার।'

সুবেদার গুলও যেন নিরুপায় হয়ে প্যাকেট দুটো নিল। বলল, 'আপনি আর আসবেন না, ওনারা ঠিক বাড়ি ফিরে যাবেন। চিন্তা করবেন না।'

মলিন মুখে মিকি-মঞ্জুরের সঙ্গে গাড়িতে উঠলাম। বাড়ি যখন পৌঁছলাম, বেলা পৌনে দুটো। মা, লালু অধীর আগ্রহে নিচের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। লালু বলল, 'খালুজান খুব বেশি অস্থির হয়ে গেছেন।'

আমি ডাইনিং রুমে চৌকিটার ওপর শুয়ে পড়ে বললাম, 'মা, আপনি গিয়ে বাবাকে সামলান। আমি এখন ওর সামনে দাঁড়াতে পারব না।'

মা দোতলায় উঠে গেলেন। লালু আমার পাশে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দ কান্নায় আকুল হল।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল কে জানে। হঠাৎ পোর্চে গাড়ির শব্দ। আমি লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুললাম। দেখি আমাদের সেই সাদা হিলম্যান মিংকস। গাড়ি থেকে নামছে শরীফ, জামী, মাসুম। শুধু রুমী নেই।

আমার গলা চিরে একটা আর্তস্বর বেরোল, 'রুমীকে ছাড়ে নি?'

কেউ কোন উত্তর দিল না। একে একে ঘরে এসে ঢুকল। আমি তখন সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনজনকেই জড়িয়ে ধরলাম। তারপর হঠাৎ চেতনায় ধাক্কা লাগল। ওদের পরনের লুঙ্গি, পাঞ্জাবি দলা-মোচড়া ছেঁড়া, ধুলো-ময়লা লাগা, ওদের মুখে-চোখে গভীর যন্ত্রণা, দুঃখ আর অপমানের ছাপ, ওদের শরীর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ওরা যেন দাঁড়াতে পারছে না। তাড়াতাড়ি ওদের বসিয়ে ঠাণ্ডা পানির বোতল আর গেলাস নিয়ে এলাম। লালুকে বললাম চা বানাতে, মাকে বললাম বাবাকে গিয়ে খবর দিতে।

ওরা একেকজনে দু'তিন গেলাস করে পানি খেল, ওদের পিপাসা যেন মিটতেই চায় না। আমি বললাম, 'বেলা দেড়টা পর্যন্ত আমি মিকি আর মঞ্জুর এম.পি.এ. হোস্টেলে ঘোরাফেরা করেছি। সুবেদার গুল বলল, 'তোমাদের নাকি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে।'

শরীফ বলল, 'না, আমাদের ক্যান্টনমেন্টে নেয় নি তো! আমরা ঐ এম.পি.এ. হোস্টেলেই ছিলাম।'

'বল কি! সুবেদার তাহলে ডাহা মিথ্যে কথা বলছে? কখন ছেড়েছে তোমাদের?'

'আমাদের ঐ দেড়টার দিকেই ছেড়েছে। গাড়ির চাবি ওরা নিয়ে নিয়েছিল। সেইটা খুঁজে পেতে খানিক দেরি হল।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আড়াইটা বাজে।

আমি তাজ্জব হয়ে বললাম, 'কি রকম নিপাট মিথ্যে কথা বলে ওরা! আমি আবার তোমাদের জন্য এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ, সবার জন্য একসেট করে কাপড় গুলের কাছে দিয়ে এলাম। ওগুলো আবার রাখলও সে। তখনি তো বলে দিতে পারত, তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে এক সঙ্গেই ফিরতে পারতাম।'

ওরা তিনজনেই কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে নীরবে চেয়ে রইল। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ে বললাম, 'কি? তোমরা সব অমন করে তাকিয়ে আছে কেন?'

জামী বলল, 'মা, তুমি এখনো তোমার মান্ধাতা আমলের ধারণা নিয়ে বসে আছ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশরা রাজবন্দীদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করত— আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে দিত, খাবার, কাপড় পাঠাতে দিত, তারপর ফাঁসি দিয়ে লাশটা আত্মীয়দের ফিরিয়ে দিত। ভাবছ এখনো ব্যবস্থা ওইরকমই আছে? জেনে রাখ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর এই পাঁচ মাসে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এ বিষয়ে পাঁচশো বছর এগিয়ে গেছে। ওদের কীর্তিকলাপ শুনলে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীও মাথা হেঁট করবে। তার প্রমাণ আমরা এই দু'দিন দু'রাতে দেখে এসেছি। ইনফ্যাক্ট, আমরা সশরীরে, সজ্ঞানে হাবিয়া দোজখ ঘুরে এসেছি। সব বলব। শুনে শেষ করতে তোমার দু'দিন লাগবে।'

ওপর থেকে বাবার ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছে 'ও শরী! রুমী। জামী। মাসুম।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'বাবার কাছে যাও আগে। উনি একেবারে উতলা হয়ে রয়েছেন। আমি ততক্ষণে ফোন করে সবাইকে খবরটা দেই।'

সেপ্টেম্বর

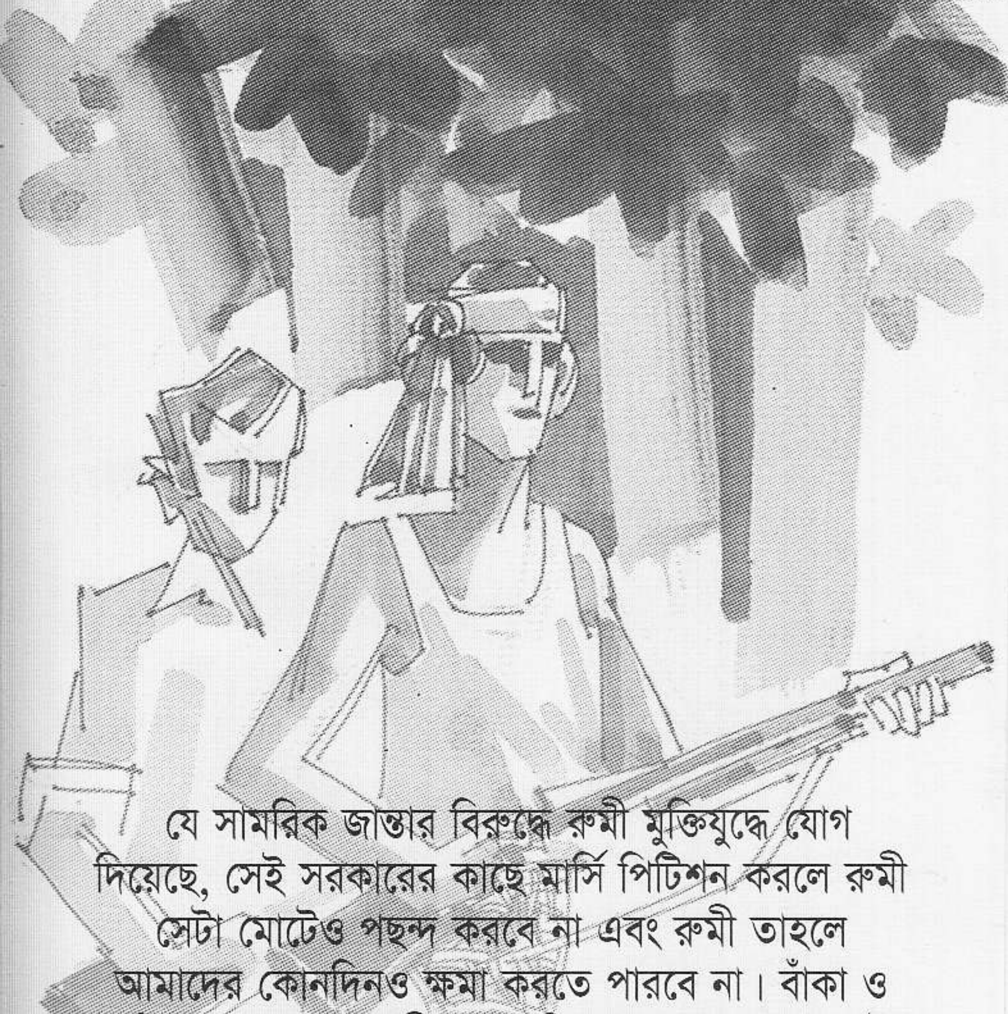

যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছেন– ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না। খুনী সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেঁট করা।

১ সেপ্টেম্বর
বুধবার ১৯৭১

বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার এক অবিশ্বাস্য, অমানবিক কাহিনী গতকাল শুনলাম শরীফ, জামী ও মাসুমের মুখ থেকে। শরীফ বরাবরই কম কথা বলে, সে তাদের দু'দিন-দু'রাত বন্দিদশার একটা সংক্ষিপ্তসার দিল নিজের মত করে। খুঁটিয়ে সমস্ত বিবরণ শুনলাম জামী আর মাসুমের মুখ থেকে।

সেদিন রাতে বাড়ির গেট থেকে রুমী-জামীদের হাঁটিয়ে নিয়ে খানসেনারা মেইন রোডে গিয়ে দাঁড়ায়। শরীফরা দেখে রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটা জীপ আর লরি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি ঘেরাও করে যেমন মিলিটারি পুলিশ ছড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের গলি আর কাসেম সাহেবদের গলি থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে এসে জমা হয়। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম শরীফদের পাঁচজনকে রাস্তার পাশে লাইন ধরে দাঁড় করায়। তারপর উল্টোদিকের কম্পালা হোটেল বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে একটা জীপ এগিয়ে এসে ওদের সামনে থেমে হেডলাইট জ্বালে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম জীপের কাছে গিয়ে জীপে বসা কারো সঙ্গে মৃদুস্বরে কি যেন কথা বলে। তারপর শরীফদের সামনে এসে রুমীর বাহু চেপে ধরে বলে, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো।' রুমীকে নিয়ে ওই জীপটাতে তোলে। জামী, মাসুম ও হাফিজকে শরীফের গাড়িতে উঠতে বলে তাদের জীপটাকে ফলো করতে বলে। কয়েকজন মিলিটারিও শরীফদের গাড়িতে গাদাগাদি করে ওঠে। রুমী ও ক্যাপ্টেন কাইয়ুমসহ জীপটা প্রথমে, তারপর শরীফদের গাড়ি, তার পেছনে পেছনে বাকি সব জীপ ও লরি। ক্রমে ওরা গিয়ে থামে এম.পি.এ. হোস্টেলের সামনে। ওখানে যাওয়ার পর রুমীদের পাঁচজনকে নামিয়ে আবার লাইন বেঁধে দাঁড় করানো হয়। আবার তাদের মুখে গাড়ির হেডলাইট ফেলা হয়। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এক আর্মি অফিসার, বলে ওঠে 'হু ইজ রুমী?' রুমীকে সনাক্ত করার পর সবাইকে বারান্দায় উঠিয়ে দাঁড় করায় এক পাশে। মাত্র কয়েক মিনিট ঐ একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানোর সময় রুমী ফিসফিস করে বলে, 'তোমরা কেউ কিছু স্বীকার করবে না। তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আমি তোমাদের কিছু বলি নি।'

একটু পরেই কয়েকজন সেপাই এসে রুমীকে আলাদা করে ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর আরো কয়েকজন সেপাই এসে শরীফদেরকে একটা মাঝারি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে সোফাসেট ছিল, তবু ওদেরকে মেঝেয় বসতে বলা হয়।

তারপরই শুরু হয়ে যায় নারকীয় কাণ্ডকারখানা। খানিক পরপর কয়েকজন করে খানসেনা আসে, শরীফ, জামী, মাসুম, হাফিজকে প্রশ্ন করে 'অস্ত্র কোথায় রেখেছ?', 'কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ?' 'কয়টা আর্মি মেরেছ?'—এইসব উত্তরগুলো স্বভাবতই না-সূচক হয় আর অমনি শুরু হয় ওদের মার। সে কি মার! বুকে ঘুষি, পেটে লাথি, হঠাৎ করে আচমকা পেছন থেকে ঘাড়ে রদ্দা—সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে গেল, রাইফেলের বাঁট দিয়ে বুকে-পিঠে গুঁতো, বেত, লাঠি, বেল্ট দিয়ে মুখে, মাথায়, পিঠে, শরীরের সবখানে মার, উপুড় করে শুইয়ে বুটসুদ্ধ পায়ে-উঠে দাঁড়িয়ে মাড়ানো, বিশেষ করে কনুই, কবজি, হাঁটুর গিঁটগুলো থেঁতলানো। আশপাশের ঘরগুলোতেও একই ব্যাপার চলছে, বন্দী বাঙালিদের চিৎকার, গোঙানি, খানসেনাদের উল্লাস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ কানে আসছে। বন্দীরা যেন ওদের খেলার সামগ্রী, এতগুলো খেলার জিনিস পেয়ে ওদের মধ্যে

মহোৎসব পড়ে গেছে। একদল আসছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মারধর করে চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের বিরতি। এর মধ্যে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আরেক দল এসে আবার সেই সর্বনেশে খেলা শুরু করেছে।

একটা ব্যাপারে খানসেনারা বেশ হুঁশিয়ার। ওরা কেউ এমনভাবে মারে না যাতে বন্দী হঠাৎ মরে যায়। এমনভাবে মারে যাতে বন্দী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। নাকমুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোয়, হাত-পা, আঙুলের হাড় ভাঙে অথচ মরে না। অজ্ঞান হলে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে, একটু বিশ্রাম করতে দেয়—যাতে খানিক পরে আবার নতুন করে মার সহ্য করার মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এরি মাঝে একজন করে ডেকে নিয়ে যায় অন্য একটা ঘরে—সেখানে এক কর্নেল বসে আছে—কর্নেল হেজাজী। সে এদেরকে এক এক করে নানা কথা জিগ্যেস করে। শরীফকে নিয়ে যাবার পর প্রথমে তাকে চেয়ারে বসতে বলে, জিগ্যেস করে শরীফ কি করে, কয়টা ছেলেমেয়ে, বাড়িতে কে কে আছে, রুমীর বয়স কত, কি পড়ে—এসব। শরীফ সব কথার উত্তর দেয়, হাফিজ সম্বন্ধে বলে, সে আজকেই মাত্র চাটগাঁ থেকে ঢাকা এসেছে, সে বেচারী ঢাকার কোনো হালহকিকতই জানে না। তাছাড়া ওর চাচা ঢাকার ডি.সি.।

তারপর কর্নেল হেজাজী জিগ্যেস করে রুমী কবে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, কোথায় ট্রেনিং নিয়েছে। শরীফ বলে সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে না। এতক্ষণ বেশ ভদ্রভাবেই কথাবার্তা চলছিল, এবার হেজাজী একটু গরম হয়ে বলে, 'তুমি জান না তোমার ছেলে কি ধরনের বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে, বাজে কাজ করে?' শরীফ বলে 'আমার ছেলে বড় হয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, সে কাদের সঙ্গে মেশে, কি করে—তার খবর রাখা আমার পক্ষে কি সম্ভব?' হেজাজী বিদ্রূপ করে বলে, 'তাহলে তো দেখছি তুমি একজন আন্‌ফিট্‌ ফাদার। ছেলেকে সৎ পথে গাইড করার কর্তব্য করতে পার নি।' শরীফ রেগে গিয়ে বলে, 'তুমিই কি ঠিক করে বলতে পার তোমার ছেলে কাদের সঙ্গে মেশে, কোথায় কোথায় ঘোরে?'

শরীফকে ফেরত আনার পর হাফিজকে নিয়ে যায়। হাফিজের পাঞ্জাবির পকেটে ওর চাটগাঁ থেকে ঢাকা আসার প্লেন-টিকিটের মুড়িটা রয়ে গেছিল; ও সেইটা দেখিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে সে সত্যিই ঐ দিনই ঢাকা এসেছে। তারপর একে একে জামী, মাসুম। এরা একেকজন করে যাচ্ছে। বাকিরা মার খাচ্ছে। যারা যাচ্ছে, তারা ফিরে এসে আবার মার খাচ্ছে। এমনি করে করে ভোর হল।

এরপর কয়েকজন সেপাই শরীফদেরকে নিয়ে যায় আরেকটা ঘরে, সেখানে শরীফদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিরাট চমক! ছোট্ট একটা ঘর, ছয় ফুট বাই আট ফুট হবে। ঢুকে দেখে চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে, সারা মেঝে জুড়ে এক দঙ্গল লোক বসে আছে—তার মধ্যে বদি আর চুল্লুকে দেখে শরীফরা চমকে যায়। শরীফরা বাকিদের না চিনলেও খানিকক্ষণের মধ্যে সবার পরিচয় পেয়ে যায়। খানসেনারা একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয়। অমনি সবাই ফিসফিস করে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করতে শুরু করে। আলতাফ মাহমুদ, তার চার শালা নুহেল, খনু, দীনু ও লীনু বিল্লাহ, আর্টিস্ট আলভী, শরীফের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু মান্নানের দুই শালা রসুল ও নাসের, আজাদ, জুয়েল, ঢাকা টি.ভি'র মিউজিশিয়ান হাফিজ, মর্নিং নিউজের রিপোর্টার বাশার, নিয়ন সাইনের মালিক সামাদ এবং আরো অনেকে। আলতাফ মাহমুদের গেঞ্জি বুকের কাছে রক্তে ভেজা, তার নাকমুখে তখনো রক্ত লেগে রয়েছে, চোখ, ঠোঁট সব ফুলে গেছে, বাশারের বাঁ হাতের কবজি ও

কনুইয়ের মাঝামাঝি দুটো হাড়ই ভেঙেছে। ভেঙে নড়বড় করছে, একটা রুমাল দিয়ে কোনমতে পেঁচিয়ে রয়েছে, সেই অবস্থাতে হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। হাফিজের নাকে-মুখে রক্ত, মারের চোটে একটা চোখ গলে বেরিয়ে এসে গালের ওপর ঝুলছে। জুয়েলের এক মাস আগের জখম হওয়া আঙুল দুটো মিলিটারিরা ধরে পাটকাঠির মত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে সবাই চুপ করে যায়। কারণ কথা বলা নিষেধ। কথা বলতে শুনলেই খানসেনারা মারবে। দরজা খুলে খানসেনারা রুমী এবং আরো কয়েকটা ছেলেকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। একজন কেউ বলে 'সেপাইজী, বহোত পিয়াস লাগা। যারা পানি পিলাইয়ে।' সেপাইরা জবাবে হাতের বেল্ট ও তারের পাকানো দড়ি দিয়ে খানিক এলোপাতাড়ি মেরে আবার বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'জল্লাদ। জল্লাদ। পানি পর্যন্ত দেবে না? পানি চাইলে আরো মার?'

খানিক পরে দেয়াল ঘেঁষে বসা একজন নড়েচড়ে বসতেই সামনে থেকে আরেকজন বলে ওঠে, 'আরে! ওই তো একটা পানির কল দেখা যাচ্ছে।' সবাই চমকে দেখে দেয়ালের গায়ে একটা পানির ট্যাপ। এত লোক ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে বসার দরুন ট্যাপটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তখন সবাই ট্যাপের কাছে গিয়ে হাত পেতে পানি খায়। বাশারকে অন্য একটি ছেলে হাতের তালুতে পানি নিয়ে খাওয়ায়।

আবার ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্তা শুরু হয়। জানা যায় কারা কখন কিভাবে ধরা পড়েছে। বদি ধরা পড়ে ২৯ আগস্ট দুপুর বারোটার সময়। ঐদিন সকালে সে রুমীদের সঙ্গে ২৮ নম্বর রোডের বাড়িতে মিটিং করে। তারপর রুমী যায় চুল্লুর বাসায় গান শুনতে। বদি যায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরিদের বাসায় গল্প করতে। সেই বাসা থেকে মিলিটারি তাকে ধরে। সামাদকে ধরে বিকেলে চারটেয়। আজাদের বাসায় মিলিটারি যায় রাত বারোটায়। ও বাসায় সেদিন ছিল জুয়েল, বাশার, আজাদসহ খালাতো বোনের স্বামী এবং অন্য দু'জন অতিথিকেও মিলিটারিরা ধরে এনেছে, কেবল কাজী হঠাৎ আচমকা ক্যাপ্টেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতের স্টেন ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অচিন্তনীয় ছিল যে, মিলিটারিরা হকচকিয়ে ঘরের মধ্যেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। সেই ফাঁকে কাজী পালিয়ে যায়।

আজাদদের বড় মগবাজারের বাসা থেকে আলমদের বাসা কাছেই। দিলু রোডে আলমদের বাসা, আর্মি যায় রাত দুটোর দিকে। ও বাসা থেকে ধরেছে আলমের ফুপা আবদুর রাজ্জাক আর তার ছেলে মিজানুর রহমানকে। রাত দেড়টার সময় ও বাসায় কাজী যায় একেবারে দিগম্বর অবস্থায়। বলে, 'একটু আগে আজাদদের বাড়িতে আর্মি গিয়ে রেইড করেছে। আমি ওরি মধ্যে ধস্তাধস্তি করে কোনমতে পালিয়ে এসেছি। আমাকে একটা লুঙ্গি দিন, আর একটা স্টেন দিন। আর্মি নিশ্চয় একটু পরে এ বাড়িতেও আসবে। আমি ওদের ঠেকাব।' আলমের মা তাকে লুঙ্গি দিয়ে বলেন, 'বাবা, তুমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও। আমাদের ব্যবস্থা আমরা দেখব।' কাজী বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আলমের মা এবং চার বোন আলমের বাবাকে পেছনদিকের নিচু বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর দিয়ে ওপাশে পার করে দেয়। এবং তার পরপরই আর্মি এসে বাসা ঘেরাও করে ফেলে। আলমদের রান্নাঘরের মেঝের নিচে পাকা হাউজের মতো বানিয়ে সেখানে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল। আর্মি এসে প্রথমেই জিগ্যেস করে রান্নাঘর কোনদিকে? তখন বাড়ির সবাই বুঝে যায়

যে ওরা আর্মস অ্যামুনিশান ডাম্পয়ের কথা আগেই জেনে গেছে। খানসেনারা রান্নাঘরে গিয়ে রান্নাঘরের মেঝে থেকে লাকড়ি সরিয়ে শাবল দিয়ে ভেঙে কংক্রিটের স্ল্যাব তুলে সব অস্ত্র, গোলাবারুদ তুলে নিয়ে গেছে। বাড়িতে যেহেতু পুরুষ মানুষ ছিল আলমের ফুপা আর ফুপাত ভাই, আর্মি ওই দু'জনকেই ধরে নিয়ে এসেছে। বেচারীরা কয়েকদিন আগেই খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছে। কিছু না জেনে এবং কিছু না করেই ওরা বাপ বেটা মার খেয়ে মরছে। ওরা বুঝেও পাচ্ছে না কেন ওদের এরকম এলোপাতাড়ি মারধর করছে।

হাটখোলায় শাহাদতদের বাসায় রাত তিনটের দিকে মিলিটারি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কাউকে না পেয়ে শাহাদতের সেজো দুলাইভাই বেলায়েত চৌধুরীকেই ধ'রে এনেছে। সে বেচারা পি.আই.এ.তে চাকরি করে, দু'মাসের ছুটিতে করাচি থেকে দেশে বেড়াতে এসে আর ফিরে যায় নি। গ্রামের বাড়িতেই ছিল, কপালে দুর্দৈব—মাত্র দশ-বারোদিন আগে ঢাকায় এসেছিল। বেচারা সাতেও ছিল না, পাঁচে ছিল না, মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকদের বদৌলতে এখন খানসেনার হাতে পিটুনি খাচ্ছে।

চুল্লুদের বাড়িতে মিলিটারি যায় রাত বারোটা-সাড়ে বারোটার সময়। চুল্লুর ভাই এম. সাদেক সি.এস.পি. এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তার সরকারি বাসভবন এলিফ্যান্ট রোডের এক নম্বর টেনামেন্ট হাউস থেকে চুল্লুকে ধরেছে।

স্বপনদের বাসায় আর্মি যায় রাত দেড়টা-দুটোর দিকে। এলিফ্যান্ট রোড থেকে চুল্লুকে চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে সেই জীপ স্বপনদের বাড়িতে যায়। চোখে বাঁধা বলে চুল্লু প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় এসেছে, কিন্তু কানে আসে এক খানসেনার কথা 'স্বপন ভাগ গিয়া।' স্বপনের বাবার গলা শুনতে পায় চুল্লু। মেয়েদের কান্না শোনে। অনুমান করে স্বপনের বোন মহুয়া, কেয়া, সঙ্গীতার কান্না। স্বপনের বাবা শামসুল হক সাহেবকেও ধরে এনেছে খানসেনারা।

আলতাফ মাহমুদের বাসায় আর্মি যায় ভোর পাঁচটার দিকে। ওদের বাসাটা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উল্টোদিকে আউটার সার্কুলার রোডে। শরীফের বন্ধু মান্নানের পাশের বাসাটা ভাড়া নিয়ে থাকতো ওরা। ওটা মান্নানের বড় ভাই বাকি সাহেবের বাড়ি। কয়েকদিন আগে নিয়ন সাইনের সামাদ গুলি ও বিস্ফোরক ভর্তি একটা বিরাট ট্রাঙ্ক আলতাফ মাহমুদের কাছে রাখতে আনে। মান্নানদের বাড়ির পেছনের উঠানে ওটা পুঁতে রাখা হয়। আর্মি এসেই প্রথমে আলতাফকে মাহমুদের বুকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ভীষণ জোরে মারে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে। তারপর তাকে আর সামাদকে নিয়ে উঠান খুঁড়িয়ে সেই ট্রাঙ্ক তোলায়। আর্মি সামাদকে সঙ্গে নিয়েই ওদের বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর আলতাফের শালাদের দিয়ে সেই ট্রাঙ্ক গাড়িতে তোলায়। আলভী ওই সময় ওদের বাড়িতে ছিল। খানসেনারা 'আলভী কৌন হ্যায়' বলে খোঁজ করছিল। কিন্তু আলভীর কপাল জোর, ঐ সময়ের মধ্যেই আলতাফ এক ফাঁকে আলভীকে বলে 'তোমার নাম আবুল বারাক। তুমি আমার ভাগনে। দেশের বাড়ি থেকে এসেছ।' তাই আবুল বারাক নাম বলে আলভী বেঁচে যায়। অবশ্য দলের অন্যান্যের সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে যায় খানসেনারা।

মান্নানের দুই শালা রসুল ও নাসের তাদের মা'র সঙ্গে বোনের বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়ে থাকত। যেহেতু দুটো বাড়িই গায়ে গায়ে লাগানো, ট্রাঙ্কটাও বেরিয়েছে মান্নানদের পেছনের উঠান থেকে, অতএব রসুল, নাসেরকেও ধরে নিয়ে যায় খানসেনারা। ভাগ্য ভালো, মান্নান এ সময় চাটগাঁয়ে, তাই সে বেঁচে গেছে। আলতাফদের

দোতলায় ভাড়া থাকেন এক ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, তাঁকে, তাঁর ছেলেকে, তাঁর এক ভাগ্নেকেও ধ'রে নিয়ে গেছে খানসেনারা।

রুমীকে ওই ছোট ঘরটায় আনার পর রুমী শরীফকে বলে, 'আব্বু এরা আমাকে ধরবার আগেই জেনে গেছে ২৫ তারিখে আমরা ১৮ আর ৫ নম্বর রোডে কি অ্যাকশান করেছি, কে কে গাড়িতে ছিলাম, কে কখন কোথায় গুলি চালিয়েছি, কতজন মেরেছি, সব, স-ব আগে থেকেই জেনে গেছে। সুতরাং আমার স্বীকার করা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তোমরা চারজনের কিছুতেই কিছু স্বীকার করবে না। তোমরা কিচ্ছু জান না, সেই কথাটাই সব সময় বলবে। তোমাদের প্রত্যেককে হয়ত আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমরা কিন্তু সবাই সব সময় এক কথাই বলবে। আমি কি করে বেড়াই, তোমরা কোনদিন কিছু টের পাও নি। দেখো, একটুও যেন হেরফের না হয়।'

আলতাফ মাহমুদও তার চার শালাকে, আলভীকে, রসুল, নাসেরকে একই কথা বলে, 'তোমরা সবাই একই কথা বলবে, তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। যা কিছু করেছি, সব আমি। যা স্বীকার করার আমি করব।'

এমনিভাবে সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। একবার করে খানসেনারা ঘরে ঢোকে এলোপাতাড়ি খানিক পেটায়, গালিগালাজ করে, আবার বেরিয়ে যায়। তখন এরা ফিসফিস করে কথা বলে। খানিকক্ষণ পর কয়েকজন খানসেনা রুমী, বদি আর চুল্লুকে বের করে নিয়ে যায়। পরে এক সময় আলতাফ মাহমুদ আর তার সঙ্গের সবাইকে নিয়ে যায়। আরেক সময় শরীফ-জামীদের নিয়ে যায়। এরই মধ্যে সকাল ন'টার দিকে হাফিজকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাও ওরা জানে না। স্থান-কালের কোনো হুঁশ কারো ছিল না। কাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কখন নিয়ে যাচ্ছে—সে সম্বন্ধে কেউ কিছু এখন আর সঠিক করে বলতে পারছে না। ওদের শুধু তীক্ষ্ণভাবে মনে গেঁথে আছে খানিক পরপর ওদের ওপর কি রকম টর্চার করা হয়েছে। ওরা দেখেছে স্বপনের বাবা শামসুল হককে দুই হাত বেঁধে ফ্যানের হুকে ঝুলিয়ে তারপর মোটা লাঠি দিয়ে, পাকানো তারের দড়ি দিয়ে পিটিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেলে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে পানির ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়েছে। তাঁর ওপর খানসেনাদের বেশি রাগ—তাঁর এক ছেলে স্বপন ওদের হাতের মুঠো ফসকে পালিয়ে গেছে। আরেক ছেলে ডালিম আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে।

মেলাঘরের আরেক গেরিলা উলফাতের খোঁজে তাদের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে ধরে এনেছে তার বাবা আজিজুস সামাদকেও। এঁকে আমি নামে চিনি। এঁর স্ত্রী সাদেকা সামাদ আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। সাদেকা আপার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই আমার পরিচয়। ঢাকার কয়েকটা দুঃসাহসিক অ্যাকশানে উলফাতের অবদান আছে। ছেলেকে পায় নি, বাপকে ধরে এনে অমানুষিক নির্যাতন করছে।

এইদিন সন্ধ্যার পর আমি ফোনে সুবেদার গুল আর জামীর সঙ্গে কথা বলি। জামী এখন বলল, 'মা, তোমার ফোন পাবার পর গুল আমাদেরই কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু রুটি কাবার কিনে এনে আমাদের খেতে দেয়।'

রাত এগারোটার দিকে এদের সবাইকে অর্থাৎ ২৯ মধ্যরাত থেকে ৩০ সকাল পর্যন্ত যতজনকে ধরেছিল, তাদের সবাইকে—কেবল রুমী বাদে—জীপে উঠিয়ে রমনা থানায় নিয়ে যায়। সেখানে সবার নাম এনট্রি করিয়ে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। এরা যখন রমনা থানায় আসে, তখন চারদিকটা একদম চুপচাপ ছিল। ঘরে ঢোকানোর

পর দেখে মেঝেয় অনেক বন্দী শুয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। এদের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা তালাবদ্ধ করে খানসেনারা যখন জীপে করে চলে গেল, তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সূচনা হয়। মেঝেয় মরার মতো ঘুমোনো লোকগুলো হঠাৎ সবাই একসঙ্গে উঠে বসে, হৈহৈ করে নতুন বন্দীদের নাম, কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে সেবা-যত্ন করা শুরু করে দেয়। কার কোথায় ভেঙেছে, কোথায় রক্ত পড়ছে, কোথায় ব্যথা—খোঁজ নিয়ে কাউকে ব্যান্ডেজ করে, কাউকে ম্যাসাজ করে, কাউকে নোভালজিন খাওয়ায়। প্রথম চোটে সবাইকে পানি খাওয়ায়। যারা সিগারেট খায় তাদের সিগারেট দেয়। তারপর কিছু ভাত-তরকারি আসে, দু'চামচ করে ভাত আর একটুখানি নিরামিষ তরকারি। যারা পান খায়, তাদের জন্য পানও যোগাড় হয়ে যায়। এই বন্দীগুলোও দেশপ্রেমিক বাঙালি, এরাও কিছুদিন আগে মিলিটারির হাতে ধরা পড়েছে। এদেরও এম.পি.এ. হোস্টেল পর্ব শেষ করে আসতে হয়েছে। এরা নবাগত বন্দীদের বলে, 'কাল ভোরে আবার আপনাদের এম.পি. এ হোস্টেলে নিয়ে যাবে। আরো টর্চার করবে। একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই। প্রথমে দু'এক ঘা মারার পরেই অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করবেন, চোখ মটকে নিশ্বাস বন্ধ করে থাকবেন। তখন ওরা পানি ঢেলে খানিকক্ষণ ফেলে রেখে যাবে। এতে পিটুনিটা কম খাবেন।'

পরদিন সকালে আবার গাড়ির শব্দ পাওয়া যায় সাতটায়। এবার একটা বিরাট বাস। সবাইকে উঠিয়ে বাসের সবগুলো জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়। আবার এম.পি.এ. হোস্টেল। হোস্টেলে খানিকক্ষণ রাখার পর এদেরকে পেছনের আরেকটা বাড়িতে নিয়ে যায়। গেট দিয়ে বেরিয়ে গলি রাস্তা দিয়ে খানিক গিয়ে এম.পি.এ. হোস্টেলের পেছনের দিকে এই বাড়িটা। শোনা গেল এখানে সবাইকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে। এ বাড়িতে যাওয়ার পর আরেক নারকীয় ঘটনার অবতারণা হয়।

স্টেটমেন্ট দেওয়া মানে এক এক করে একজন আর্মি অফিসার বন্দীর বক্তব্য শুনবে, তাকে প্রশ্ন করবে, তার জবাব শুনবে—এবং সেগুলো কাগজে লিখে নেবে। এই 'স্টেটমেন্ট' দেওয়া ও নেয়ার সময় বন্দীদের ওপর যে পরিমাণ নির্যাতন করা হয়, তা গত দু'দিনের নির্যাতনকে ছাড়িয়ে যায়। অফিসার বন্দীকে প্রশ্ন করে, উত্তর যদি হয় না-সূচক, অমনি শুরু হয় তার ওপর দমাদম লাঠির বাড়ি, লাথি, রাইফেলের বাঁটের গুঁতো। পরপর ক্রমাগত না-সূচক উত্তর হতে থাকলে স্টেটমেন্ট গ্রহণকারী অফিসারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, সে খানিকক্ষণের জন্য বিরতি দেয়, তখন খানসেনারা ঐ বন্দীকে সিলিংয়ের হুকে ঝুলিয়ে পাকানো দড়ি দিয়ে সপাসপ পেটায়। কাউকে উপুড় করে শুইয়ে দুই হাত পেছনে টেনে পা উল্টোদিকে মুড়ে তার সাথে বেঁধে দেয়—দেহটা হয়ে যায় নৌকার মত। লোকটার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, চিৎকারও দিতে পারে না। বেশি ত্যাড়া কোন বন্দীর পা দুটো সিলিংয়ের ফ্যানে ঝুলিয়ে জোরে পাখা ছেড়ে দেয়। নিচের দিকে মাথা ঝোলানো লোকটা ফ্যানের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নাকে-মুখে-চোখে রক্ত তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

এই রকম নারকীয় কাণ্ডকারখানার ভেতর দিয়ে স্টেটমেন্ট নিতে নিতে বারোটা-একটা বেজে যায়। দেড়টার দিকে শরীফদের তিনজনকে আবার এম.পি.এ. হোস্টেলে কর্নেলের রুমে আনা হয়। কর্নেল বলে তোমরা এখন বাড়ি যেতে পার। শরীফ জিগ্যেস করে রুমীর কথা। কর্নেল বলে 'রুমীকে একদিন পরে ছাড়া হবে। ওর স্টেটমেন্ট নেয়া এখনো শেষ হয় নি।'

২ সেপ্টেম্বর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

শরীফকে কর্নেল বলেছিল রুমী একদিন পরে ফিরবে। কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? আমি কি বিশ্বাস করেছিলাম ? শরীফের ফিরে আসার খবর পেয়ে পরশু বিকেল থেকে বাসায় আত্মীয়বন্ধুর ঢল নেমেছে। সবাই রুমীর জন্য হায় হায় করছে। হায় হায় করছে কেন ? তবে কি রুমীর ছাড়া পাবার কোনো আশা নেই ? গতকাল এগারোটায় আমি মঞ্জুরের সঙ্গে আবার এম.পি.এ. হোস্টেলে গিয়েছিলাম। রুমীর কিছু কাপড়-চোপড়ের একটা প্যাকেট করে সেটা তাকে দেবার এবং তার সঙ্গে দেখা করার প্রার্থনা জানিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাওয়াই সার। কোনখানে কোন সুরাহা করতে পারলাম না। কেউ রুমীর সম্বন্ধে কোন হদিসই দিতে পারল না। কর্নেল হেজাজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিনি নাকি নেই। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম, সুবেদার গুল তারাও যেন বাতাসে হাওয়া হয়ে গেছে। এম.পি.এ. হোস্টেলটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে এরই অভ্যন্তরে দিবারাত্রি ঐসব নারকীয় অত্যাচার হয়ে চলেছে। এখানে কি সাউন্ড প্রুফ ঘর আছে ? নইলে ৩১ তারিখে যখন এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এখানে দুটো বাড়িতে যাওয়া আসা করেছি, কোথাও কোন চিৎকার, গোঙানি শুনি নি কেন ? অথচ শরীফ, জামী, মাসুমের কাছে যা শুনেছি, তাতে তো ঐ সময়টাতে পেছনের দোতলা বাড়িটার ভেতরে বন্দীদের 'স্টেটমেন্ট নেয়া' চলছিল। নিশ্চয় সাউন্ড প্রুফ ঘর আছে, নইলে একটুও চিৎকার শুনি নি কেন?

বাড়ি ফিরে এসে এই কথাটাই জামী আর মাসুমকে জিগ্যেস করলাম। জামী বলল, সাউন্ড প্রুফ ঘর নেই। তবে এম.পি.এ. হোস্টেলে আর পরের বাড়িটায় পেছনে দিক দিয়ে অনেক ঘর আছে। নির্যাতন ঐ পেছনে হয়। সামনের দিকে কিছু অফিসরুম সাজানো আছে। রাতের গভীরে অবশ্যই এই অফিসরুমগুলোতেও মারধর করার কাজ চালানো হয়।

বিকেলে মান্নান আর নূরজাহান এসেছে। মান্নান চাটগাঁ থেকে ফিরেছে কাল। নূরজাহানের দু'ভাই রসুল ও নাসের মঙ্গলবারেই ছাড়া পেয়েছে। ভীষণ মারের চোটে ওদের অবস্থা কাহিল। রসুলের বাঁ হাতের তর্জনী ভেঙে গেছে, পিঠে কোমরে ব্যথা। নাসেরেরও তাই।

আলতাফ মাহমুদের চার শালা আর 'ভাগনে আবুল বারাক' গতকাল ছাড়া পেয়েছে। ওদের অবস্থাও খুব খারাপ। সবাইকেই যথেষ্ট রকম পিটিয়েছে, ওর মধ্যে বড় ভাই নুহেলের ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে বেশি চোট লেগেছে, মেজ দীনুর দুই হাত পায়ে আঙুলের গিঁট, হাতের কবজি ভেঙেছে, প্রচণ্ড চড়ে বাঁ কানের পর্দা ফেটে গেছে। আলভীর বেঁচে যাওয়াটা প্রায় অলৌকিক মনে হয়। বাসায় আলতাফ একবার তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল সে আলভী নয়, আবুল বারাক, আলতাফের বোনের ছেলে। এম.পি.এ. হোস্টেলের সেই ছোট্ট ঘরটাতে খানসেনারা আবার জিগ্যেস করছিল, 'আলভী কৌন হ্যায়'। আলভী একবার বেখেয়ালে প্রায় 'হাম হ্যায়' বলে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস পাশেই লীনু তার জামার পেছন চেপে ধরে থামিয়ে দিতে পেরেছিল। খানসেনারা চলে যাবার পর লীনু দীনুরা আলভীকে মুখস্থ করিয়েছিল 'আমার নাম আবুল বারাক। বাবার নাম অমুক, মার নাম অমুক' অর্থাৎ আলতাফের

বোন আর দুলাভাইয়ের নাম।

ওরা পাঁচজন বেঁচে ফিরেছে, আলতাফ মাহমুদ ফেরে নি।

নূরজাহান, মান্নান থাকতে থাকতেই দাদাভাই, মোর্তুজা ভাই এলেন। শরীফের ফেরার খবর পেয়ে এঁরা রোজ দু'বেলা করে আসছেন। রুমীর জন্য আপসোসের শেষ নেই। মোর্তুজা ভাই বারবার দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, 'রুমীই ২৫ তারিখের অ্যাকশান করেছিল? যদি একটু জানতাম ভাবী! রুমীকে কিছুতেই ঢাকায় রাখতে দিতাম না। আপনারা তো আমাদের একদম জানতে দেন নি। আমরা যখনই ১৮ নম্বর, ৫ নম্বর রোডের অ্যাকশানের কথা বলেছি, আপনারা শুধু চুপ করে শুনেছেন। এমন ভান করেছেন যে কিচ্ছু জানেন না, আমাদের মুখ থেকেই প্রথম শুনছেন।' দাদাভাই একরকম তিরস্কার করেই বললেন, 'রুমী মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিল, আমাদের একটু বললে কি হত? আর না হয় নাই বলতেন, রাতের বেলা তো আমাদের বাড়িতে শুতে পাঠাতে পারতেন।'

কি জবাব দেব এ কথার? দাদাভাই, মোর্তুজা ভাই নিজের নিজের বাড়ির ছেলেদের সামলে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছেন, দেখতাম। তার ওপর রুমিকে ওদের ঘাড়ে চাপাবার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না।

বাঁকা ফিরেছে চাটগাঁ থেকে। বাঁকা, মঞ্জুর, মিকি, মোর্তুজা, দাদাভাই, ফকির, মিনিভাই—সবাই মিলে নানারকম চিন্তাভাবনা করছেন রুমীকে ছাড়ানোর ব্যাপারে কি উপায় করা যেতে পারে। সবারই কোন না কোন সামরিক অফিসারের সঙ্গে পরিচয় বা খাতির আছে। সবাই নিজের নিজের মতো করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় আছেন।

লালু আর মা ৩০ তারিখে এ বাসায় এসেছিলেন, আর যেতে দিই নি। এখানেই রয়ে গেছেন। মাও তার নিজের মতো করে জায়নামাজের পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে দেন-দরবার করছেন রুমী জন্য।

এই সব ডামাডোলের মধ্যে জামীর জন্মদিন কখন এসে চলে গেছে, কারো খেয়ালই নেই। জামীর নিজেরই হয়তো খেয়াল নেই। আমার হঠাৎ মনে পড়ল সন্ধ্যার মুখে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এসেছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একসময় উঠলেন। উনি এমনিতেই কথা খুব কম বলেন। আর এখন তো বলার কিছুই নেই। ওকে বিদায় দিতে বাইরের গেট পর্যন্ত গেলাম! বাগানের চার পাঁচটা গোলাপ গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে বোরহান বললেন, 'ভারি চমৎকার ফুল তো। বাগান একেবারে আলো করে ফুটে রয়েছে।'

আমি বললাম, 'ফুলগুলোর এতটুকু লজ্জা বা হৃদয় বলে কিছু নেই। সারাবছর এত খাটি, এত যত্ন করি ওদের জন্য। অথচ আমার এত বড় সর্বনাশেও ওদের কিছু যায় আসে না। কেমন নির্লজ্জের মতো ফুটে রয়েছে।'

কেমন এক আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইলাম বনি প্রিন্স, এনা হার্কনেস, সিমোন আর পিসয়ের উজ্জ্বল, সুখী চেহারাগুলোর দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মনে পড়ল রুমী বনি প্রিন্সের একটা আধ-ফোটা কলি উপহার দিয়েছিল আমার জন্মদিনে। আহা, আমার বনি প্রিন্স আজ কোথায়? কোন জালেমের হাতে শুকিয়ে ঝরছে?

এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল আজ জামীর জন্মদিন। আমার আরেকটা বনি প্রিন্স তো রয়েছে। রুমীর শোকে জামীকে ভুলতে বসেছি!

আমি বনি প্রিন্সের ফুলটা ছিঁড়ে নিয়ে জামীর খোঁজে বাড়ির ভেতর গেলাম। একতলায় নেই, দোতলায় নেই। ছাদের গিয়ে দেখি জামী খোলা ছাদের মেঝেতে বসে মাথা নিচু করে সেতার বাজাচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জামী টের পেল না। একটু নিচু হয়ে দেখলাম ও চোখ বুজে বাজাচ্ছে, চোখের পাতা ভেজা। বুকে ধাক্কা লাগল, জামী প্র্যাকটিস করার সময় রুমী তবলা বাজাত। সেই কথা মনে হয়ে কি জামীর চোখে পানি? নাকি ওর জন্মদিনে ওর ভাইয়ার কথা মনে করে চোখে পানি? বাড়ির সবাই ওর জন্মদিনের কথা ভুলে গেছে বলে অভিমানে ওর চোখে পানি?

আমারও চোখ ভরে পানি এল, ফুলটা আলতো করে জামীর গায়ে ছুঁইয়ে অস্ফুটে বললাম, 'মেনি মোর রিটার্নস।'

৩ সেপ্টেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? ক'দিন থেকে স্রোতের মতো আত্মীয়, বন্ধু আসছে, রুমীর জন্য মাতম করছে, তা দেখে আমার মনে তো শান্তি হওয়া উচিত। কতোজনের বেলায় শুনি—মিলিটারি এসে স্বামী বা ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবার পর সে বাড়িতে আত্মীয়বন্ধু ভয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমার বেলায় উল্টো। তবু হঠাৎ আজ বিকেলে আমি ক্ষেপে গেলাম কেন? তখন বসার ঘর, খাওয়ার ঘর ভর্তি করে বসেছিলেন, বাঁকা, মঞ্জুর, ফকির, মোস্তাহেদ, মিনিভাই, নূরুজ্জামান, দাদাভাই, মোর্তুজা ভাই এবং এঁদের মিসেসরা। আমি খাওয়ার ঘরে চৌকিটায় শুয়েছিলাম, মিসেসরা এদিকে আমার কাছে বসেছিলেন। মিষ্টাররা ওদিকে বসার ঘরে।

দুপুরে একটু কেমন যেন হয়েছিল। খুব কান্না পেয়েছিল, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু থামাতে পারছিলাম না। শেষে হিক্কার মতো উঠে চোখ অন্ধকার হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ি। মনে হচ্ছিল গলার কাছে দমটা আটকে গেছে। শরীফ অফিসে ছিল। মা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন। সানু, খুকু, মঞ্জু এবং আরেক পড়শী আকবরের মা এসে শুশ্রূষা করেছিলেন। আকবরের মা মাথায় তেলপানি থাবড়ে দিতে দিতে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন মগবাজারে পাগলাপীর খুব তেজী পীর, ওঁর পায়ের ওপর গিয়ে পড়তে পারলে রুমীর একটা উপায় হবেই হবে। পীরফকিরে জীবনে কখনো বিশ্বাস ছিল না। এখন রুমীর জন্য পাগলাপীরের কাছে যাব বলে স্থির করেছি। আগামীকাল আকবরের মা আমাকে নিয়ে যাবেন ওর কাছে।

আমার অসুস্থতার কথা শুনেও আরো আত্মীয়বন্ধু দেখতে আসছেন। ডাঃ এ. কে. খান আগেই এসে ব্লাডপ্রেসার চেক করে দেখে এখন ওপাশে শরীফদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল আতিক, বুলু, চাম্মু, হাফিজ, জুবলী। আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, তোমরা সবাই এত এ বাড়িতে আস কেন? জান না, মেইন রোডে ছদ্মবেশে আই.বি'র লোক সর্বক্ষণ নজর রেখেছে এ বাড়ির ওপর? তোমাদের সব্বার বিপদ হবে, দেখো।'

আমার মন বিকল হবার আরো কারণ ছিল। কাল রাতে মাসুম এক সময় আমাকে

একা পেয়ে চুপিচুপি বলে, 'চাচী, চাচা আমাকে বারণ করেছেন আপনাকে বলতে। কিন্তু না বলে পারছি না। চাচাকেও বেত দিয়ে খুব মেরেছে। পিঠে দাগ পড়ে গেছে। আপনি চালাকি করে এক সময় পিঠটা দেখে নেবেন, তারপর উনাকে জিগ্যেস করবেন। আমি বলেছি তা বলবেন না যেন।'

আমি মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম। শরীফকে বেত মেরেছে, সেটা সে আমার কাছে লুকিয়েছে! উঃ! কি মানুষ! কোথায় সব খুলে বলবে, পিঠে তেল বা মলম লাগিয়ে দেব। তা না। তাই দেখি ফিরে আসার পর থেকে একদম জামা খোলে না। গোসলের আগে জামা পরেই বাথরুমে ঢুকে যায়।

আজ সকাল থেকে তক্কে তক্কে ছিলাম। বাথরুমের সঙ্গে লাগানো ড্রেসিংরুম। ড্রেসিংরুমে ঢুকে জামা খুলে বাথরুমে ঢুকতে যাবে, অমনি আমি দরজার কাছে এসে হাজির। 'একি তোমার পিঠে দাগ কিসের ? দেখি দেখি।' বলে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেছি। শরীফের তখন স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। সে আরো স্বীকার করল, খানসেনারা বুট-পরা পা দিয়ে তার মাথাতেও মেরেছে। ফলে তার মনে হয় সবসময় মাথায় যেন একটা লোহার টুপি এঁটে বসানো আছে।

এই সব বলতে বলতে শরীফ হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ও আমাকে ধরেই ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বসতে হল। আমরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে 'রুমী, রুমী' বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম। আমি জীবনে কখনো শরীফকে কাঁদতে দেখি নি। এই প্রথম ও রুমীর নাম করে কাঁদল।

শরীফ শেভ, গোসল করে নাশতা খেয়ে অফিসে চলে যাবার পরও আমি সুস্থির হতে পারছিলাম না। শরীফের মানসিক অবস্থার কথাই ভাবছিলাম। ও চিরকাল ধীর, স্থির, দায়িত্ব সচেতন। ওর মান-অপমান-জ্ঞান অন্য অনেকের চেয়ে বহুগুণে তীক্ষ্ণ। খানসেনাদের বর্বর নির্যাতনে ও শরীরে যত না যন্ত্রণা পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান বোধ করেছে মনে। এ কয়দিন আমি শুধু দুঃখ বোধেই যেন আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন শরীফের মনের ক্রোধ আর অপমান বোধটা আমার মনেও ছড়াতে শুরু করল।

খুব অস্থির হয়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জামী ডেকে বলল, 'মা, দেখে যাও।' ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও গত কয়েকদিনের খবর কাগজ সামনে নিয়ে দেখছে। একটা কাগজ তুলে বলল, 'এই দেখ।'

এই কয়দিনে আমি খবর কাগজের কথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। এখন বসে কাগজটা মেলে দেখলাম অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্রের একটা বড় ছবির নিচে লেখা :

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্দার : কয়েকজন গ্রেপ্তার।

জামী বলল, 'মা, মনে হচ্ছে এগুলোই আলম ভাইদের বাড়ির রান্নাঘরের নিচে থেকে বের করেছে।'

খবর কাগজের ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্টেনগান, রাইফেল, স্টেনের ম্যাগজিন, পিস্তল, গ্রেনেড, মাইন, তারের বাণ্ডিল আরো কি কি যেন।

৩১ আগস্টের দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, পাকিস্তান অবজারভার, পাকিস্তান টাইমস—সব কাগজেই অস্ত্রশস্ত্রের ছবি বেরিয়েছে। সব কাগজে একই খবর ছাপা হয়েছে, 'গত রোববার রাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে একাদিক্রমে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযানগুলো চালানো হয়।'

দেশপ্রেমিক নাগরিক! আল্লাহ, এই দেশপ্রেমিক নাগরিকদের জন্য তোমার নিকৃষ্টতম, ভয়াবহতম হাবিয়া দোজখও যথেষ্ট হবে না।

আমার মনের মধ্যে মাথার মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণা দপ্দপ্ করে জ্বলতে লাগল।

আমি জামীকে জিগ্যেস করলাম, 'একটা কথার জবাব দে দেখি। স্ট্রেইট উত্তর দিবি। রুমীকে কি রকম টর্চার করেছে?'

জামী হঠাৎ চমকে যেন বোবা হয়ে গেল। আমার মনের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, দুঃখ সব যেন একসঙ্গে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছিল। আবার বললাম, 'তোরা তো এসে সবার কথাই বলেছিস বদিকে কি রকম টর্চার করেছে, আলতাফ মাহমুদের রক্ত বের করে দিয়েছে, হাফিজের চোখ গেলে গিয়েছে, বাশারের হাত ভেঙেছে, স্বপনের বাবা, উলফাতের বাবা, শাহাদতের দুলাভাই, আলমের ফুফা সবাইকে হুকে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে, পিঠের ওপর চড়ে পায়ে মাড়িয়েছে, জুয়েলের আঙুল ভেঙে দিয়েছে, চুল্লুকে আধমরা করে ফেলেছে। রুমীকে কতোখানি টর্চার করেছে, তোরা কেউ বলিস নি কিন্তু। এখন বল আমাকে—

জামী বলতে গেল, 'মা, মা শোন'—

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কোন কথা শুনব না। আমি জানতে চাই রুমীকে কতোখানি টর্চার করেছে। বল তুই। দেশপ্রেমিক নাগরিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে মিলিটারি আমার রুমীকে ধরে কতোখানি টর্চার করেছে, আমি জানতে চাই।'

জামী মাথা তুলে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়াকে আমরা শেষ দেখি ৩০ তারিখের দুপুরে। তারপর সেই ছোট ঘরটা থেকে ভাইয়া, বদি ভাই আর চুল্লু ভাইকে নিয়ে যায়। তারপর আর ভাইয়াকে দেখি নি। সকালে ভাইয়াকে যখন ছোট ঘরে আনে, তখন ভাইয়া প্রথমে আমাদের চারজনকে এক সঙ্গে বলে, আমরা যেন সবাই আর্মির কাছে একরকম কথা বলি। একটু পরে ভাইয়া আব্বুর কাছ থেকে একটু সরে বসে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাদা কথা বলে। ঐ সময় বলেছিল, 'আমি শুধু নিজে পঁচিশের রাতের ঘটনা স্বীকার করেছি। ওরা আমাকে খুব মেরেছে, আরো অনেকের নাম বলার জন্য। আমি শুধু বদি ছাড়া আর কারো নাম জড়াই নি। সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব বদি আর আমি নিয়েছি।' আমি বলেছিলাম, 'ভাইয়া, যদি খুব বেশি টর্চার করে?' ভাইয়া বলেছিল, 'তুইতো জানিস আমি কতো টাফ। ওরাও সেটা বুঝে গেছে। ওরা আমাকে ব্রেক করার জন্য এমনভাবে টর্চার করেছে বাইরে কোথাও কাটে নি, ভাঙে নি। কিন্তু ভেতরটা মনে হচ্ছে চুরচুর হয়ে গেছে! দেখিস, আম্মাকে যেন বলিস না এসব কথা। মা, তুমি জোর করলে, তাই বলে দিলাম। ভাইয়া কিন্তু বারণ করেছিল।'

আমি প্রাণপণে নিজেকে শক্ত রেখে বললাম, 'আমার জানার দরকার ছিল। ভয় নেই, আমার কিছু হবে না।' উঠে রুমীর ঘরে গেলাম। বইয়ের আলমারি খুলে বের করলাম একটা বই : হেনরী এলেগের 'জিজ্ঞাসা'। রুমী এটা আমাকে পড়তে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। বলেছিল, 'আম্মা, যার ওপর টর্চার করা হয়, খানিকক্ষণ পরে সে কিন্তু আর কিছু ফিল করে না। পরে যারা শোনে বা পড়ে তারাই বেশি শিউরায়, ভয় পায়।' রুমী আরো অনেক কিছু আমাকে বলেছিল : শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পর কি কি উপায়ে তাদের টর্চার সহ্য করে নেয়া যায়। কি কি পন্থায় টর্চার সহনীয় করে মুখ বন্ধ রাখা

যায়। এ সম্বন্ধে সে ইপক্রেস ফাইল এবং আরো কয়েকটা বই আমাকে পড়তে দিয়েছিল।

রুমী। রুমী। তুই কি সত্যিই ওই সব পন্থাতে ওদের সব অত্যাচার সহ্য করতে পারছিস? তুই কি সত্যিই খানিক পরে আর কিছু টের পাস না? আমি কেমন করে কার কাছে তোর খবর পাব?

৪ সেপ্টেম্বর
শনিবার ১৯৭১

আজ দশটার সময় আকবরের মায়ের সঙ্গে পাগলাপীরের বাসায় যাব। আকবরের মা বলেছেন ওঁর কাছে যেতে হলে কিছু একটা হাতে নিয়ে যেতে হয়। কেউ খালি হাতে গেলে খুব রাগ করেন। তাই আমিরুদ্দিকে পাঠিয়েছি মিষ্টি কিনে আনতে। এই অবসরে গত কয়েকদিনের খবর কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। গতকাল তো জামীর ডাকে খবর কাগজ দেখতে গিয়ে রাগে-দুঃখে কেঁদেকেটে একটা কেলেঙ্কারিই বাঁধিয়ে ফেলেছিলাম।

প্রদেশে এতদিনে বেসামরিক গভর্নর দিয়েছে। নতুন গভর্নর ডাঃ মালিকের হাসিমুখের ছবি ছাপা হয়েছে। নতুন সামরিক আইন প্রশাসকও দেওয়া হয়েছে—লেঃ জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজী।

একই সঙ্গে গভর্নর আর সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করে অবশেষে টিক্কা খান বিদায় নিয়েছে। গভর্নর হয়েই ডাঃ মালিক ঘোষণা করেছেন শিগরিই মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে।

সামরিক বাহিনী আরো একটা জায়গায় হানা দিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। নয়জনকে মেরেছে, একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা থেকে তিন মাইল দূরে নাসিরাবাদ বস্তির একটা বাড়ি থেকে ১ সেপ্টেম্বর পাক আর্মি এই অস্ত্রশস্ত্র ধরেছে।

এখানেও 'দেশপ্রেমিক নাগরিকদের' কাছ থেকে খবর পেয়ে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস—সংক্ষেপে ইপকাফের একটা দল এই অস্ত্র 'উদ্ধার' করে এবং যাদের মারে তারা হল 'ভারতীয় এজেন্ট'। ভাবছি কোন নয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে ওরা মেরেছে? তাদের কেউ কি আমাদের চেনা? যাকে গ্রেপ্তার করেছে সেও কি সেক্টর টুয়েরই কোন মুক্তিযোদ্ধা? কে জানে? জানবার কোন উপায়ই নেই।

৩১ আগস্টের দৈনিক পাকিস্তানের একটা খবরে চোখ আটকে গেল।

'মরতে যখন হবেই, তখন দেশের জন্যই মরি। বিশ বছর বয়স্ক পাইলট রশীদ মিনহাজ গত ২০ আগস্ট পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি বিমানকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছেন।'

এটা আবার কি ধরনের খবর? জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস যিনি করেছেন তার নাম কই? কে তিনি? কি তাঁর পরিচয়?

পরবর্তী দিনগুলোর কাগজ ঘাঁটতে লাগলাম। তিন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবল রশীদ মিনহাজের বীরত্বগাথার কাহিনী। বীরত্বের জন্য তাকে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক খেতাব নিশানে হায়দার দেওয়া হয়েছে, তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য নির্ধারিত গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে, তার বাপের ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে, তার

চোদ্দগুষ্ঠির কুষ্টি-কুলুজী বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ কে বিমান হাইজ্যাক করলেন, তাঁর নাম নেই!

চার সেপ্টেম্বরে এসে নাম পেলাম। রশীদ মিনহাজের অমর বীরত্বগাথা নাম দিয়ে চার কলামজুড়ে এক নিবন্ধে রশীদের বীরত্ব, মহত্ত্ব, ত্যাগের অনেক ধানাই-পানাই করে বলা হয়েছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ. কে. এম. মতিয়ুর রহমান বলে আট বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক পাইলট বিমানটা হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেন। পরিণামে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে দু'জনেই মৃত্যুবরণ করেন।

কে এই মতিয়ুর রহমান? কোন দেশী লোক? কিছুই বলে নি। বোঝাই যাচ্ছে কোন দেশপ্রেমিক বাঙালি পাইলট একটি বিমান হাইজ্যাক করে ভারতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভারতের আকাশে পৌছেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং দু'জনেই মৃত্যুবরণ করেছে। একজন সর্বোচ্চ বীরের খেতাব পেয়েছে, অন্যজনকে বলা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক। এই খবর দৈনিক পূর্বদেশ-এ 'বিশ্বাসঘাতকের নাম মতিয়ুর রহমান'—এই শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

মুক্তিকামী বীর বাঙালি মতিয়ুর রহমান বিশ্বাসঘাতক? যদি কোনদিন পূর্ব বাংলার এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয়, তবে মতিয়ুর রহমান—সেই স্বাধীন দেশ নিশ্চয় তোমাকে সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক খেতাবে ভূষিত করবে।

এলিফ্যান্ট রোডের যে অংশটা রমনা থানার সামনে দিয়ে ঘুরে আউটার সার্কুলার রোড ক্রস করে ওয়ারলেস কলোনির দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তায় ঢুকে রেললাইন ক্রস করে একটু এগোলোই বাঁয়ে পাগলাপীর বাবার বাড়ি। আগে বোধ হয় টিন ও বেড়া ছিল, এখন সামনের দিকের দু'তিনটে ঘর পাকা। সদ্য সমাপ্ত, দেখেই বোঝা যায়। চারদিকে ইট, বালি, লোহা এলোমেলো পড়ে রয়েছে। একটা ঘরে সিমেন্টের বস্তার টাল, পেছন দিকে কাজ চলছে। বাবার কাছে দোয়াপ্রার্থী নারী-পুরুষের ভিড়ে চারদিক থৈথৈ করছে।

আকবরের মা বলেছেন, 'বাবার খুব ক্ষমতা। দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে শক্ত শক্ত অসুখ চোখের নিমেষে ভালো করে দেন। ওনার কাছে যে যা আর্জি নিয়ে আসে, তাই কবুল হয়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড়ো বড়ো মেজর, কর্নেল, জেনারেল সবাই ওনার কাছে আসেন দোয়া নিতে। দেখবেন, উনি ঠিক আপনার রুমীর খবর বের করে দেবেন।'

সেই আশাতেই তো এসেছি। এই একই আশা নিয়ে পাগলাপীরের কাছে এসেছেন রাজশাহীর ডি.আই.জি. মামুন মাহমুদের স্ত্রী মোশফেকা মাহমুদ, এসেছেন রাজশাহীর এস.পি. শাহ আবদুল মজিদের স্ত্রী নাজমা মজিদ, এসেছেন চট্টগ্রামের এস.পি. শামসুল হকের স্ত্রী মাহমুদা হক, এসেছেন আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী ঝিনু মাহমুদ।

ঝিনু মাহমুদকে দেখে আমি চমকে গেছি। ছোট্টখাট্টো চেহারার সোনারবরণী এক মেয়ে, পুতুলের মতো সুন্দর—কাঁদতে কাঁদতে চোখের কোণে কালি প'ড়ে গেছে। এইটুকু মেয়ে, কতোই বা বয়স, দেখে মনে হয় আঠারো-উনিশ। কোলে আড়াই বছরের মেয়ে শাওন। এই নবীন বয়সে ওর জীবনে এত বড় দুর্দৈব? ঝিনুর সঙ্গে পাগলা বাবার কাছে এসেছেন ঝিনুর মা, তার ছোট বোন শিমুল বিল্লাহ আর চার ভাই নুহেল, খনু, দীনু ও লীনু বিল্লাহ। শরীফ, জামী, মাসুমের কাছে এই চার ভাইয়ের কথা আগেই শুনেছি।

মোশফেকা মাহমুদকে আগে অল্পস্বল্প চিনতাম, তার মুখে শুনলাম, ২৬ মার্চ বাসায় মিলিটারি এসে মামুন মাহমুদকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই যে গেল মামুন, আর ফিরে আসে নি। একই কাহিনী নাজমা মজিদের, মাহমুদা হকের।

এরা কেউ এদের স্বামীর খোঁজ জানে না। আমি জানি না আমার ছেলের খোঁজ। পাগলাপীর বাবা সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন—এরা সবাই বেঁচেবর্তে আছে। উনি ঠিকই সকলের খোঁজ বের করে আনবেন।

৫ সেপ্টেম্বর
রবিবার ১৯৭১

একটা কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে গত দু'দিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। রুমীকে কি করে বের করে আনা যায়, তা নিয়ে শরীফের বন্ধুবান্ধবরা নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হল : যে কোন প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। বাঁকা আর ফকির মনে করছে—শরীফকে দিয়ে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমী হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। সেটাও একটা আশার কথা।

রুমীর শোকে আমি প্রথম চোটে 'তাই করা হোক' বলেছিলাম। কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না। যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছে—ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মত এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না। খুনী সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেঁট করা। গত দু'রাত শরীফ ঘুমোয় নি, আমি একবার বলেছি, 'তোমার কথাই ঠিক। ঐ খুনী সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না।' আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি, 'না, মার্সি পিটিশন কর।'

এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দু'দিন দু'রাত। শেষ পর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে—না, মার্সি পিটিশন সে করবে না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি। রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার যতরকম চেষ্টা আছে, সব করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়।

৬ সেপ্টেম্বর
সোমবার ১৯৭১

আজাদের মায়ের কাছে যাবার জন্য মনটা ছটফট করছে। এ কয়দিন ভাল করে উঠতে পারি নি। আজ বেলা এগারোটার দিকে গেলাম। আজাদের মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন, বললেন, 'বইন গো, কি সর্বনাশ হয়া গেল আমাদের। আপনের রুমীরেও তো লয়া গেছে শুনছি।'

'হ্যাঁ আপা, বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই নিয়ে গেছিল। দু'দিন-দু'রাত পর রুমী ছাড়া বাকিরা ফিরে এসেছে।'

বাড়িটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। খাট ভেঙে পড়ে আছে, লোহার আলমারির পাল্লা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে বুলেটে, দেয়ালে জায়গায় জায়গায় রক্তের ছিটে শুকিয়ে খয়েরি হয়ে আছে।

জিগ্যেস করে করে পুরো ঘটনাটা শুনলাম আজাদের মার মুখ থেকে।

২৯ আগস্টের রাতে তার বাসাতে অনেক লোক ছিল। বোনের ছেলে জায়েদ, চঞ্চল এরাতো থাকতোই, তাছাড়াও অন্য জায়গা থেকে বেড়াতে এসেছিল আরেক বোনের ছেলে টগর, বোন-ঝি জামাই মনোয়ার। জুয়েল, কাজী, বাশার এরা তিনজন ছিল। আর কপাল মন্দ সেকেন্দার হায়াত খানের—জয়েন্ট সেক্রেটারি এ. আর. খানের ছেলে—আজাদের বন্ধু, সে রাতে এ বাসাতেই ছিল।

রাত দুপুরের ঘুম ভেঙে সবাই দেখে আর্মি সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এঘর-ওঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বোঝা যায় সামনে, দু'পাশে, ছাদে সর্বত্র মিলিটারি। ভেবেছিল পেছনদিকে মেথরের রাস্তাটায় নিশ্চয় কেউ নেই, ওইদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। জায়েদ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কোনমতে মেথর আসার চিকন দরজাটার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে খুলতেই গলি থেকে কয়েকজন আর্মি উঠে এসে ঢুকে বাড়িতে। তারা ঘরে ঢুকে সামনের দরজা খুলে দেয়—সেদিক দিয়ে আরো মিলিটারি পুলিশ সব ঘরে ঢুকে পজিসন নিয়ে দাঁড়ায়। জুয়েলের দুটো আঙুলে তখনো একটুখানি ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, ক্যাপ্টেন সেই আঙুল দুটো ধ'রে দুমড়ে ভেঙে দেয়। জুয়েল 'মা-গো' বলে একটা প্রাণঘাতী চিৎকার দিয়ে ওঠে। আর তখনি ঘটে যায় সেই কাণ্ডটা। কাজী হঠাৎ ক্যাপ্টেনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন টাল সামলাতে না পেরে খাটের ওপর পড়ে যায়। কাজী পড়ে তার ওপর। দু'জনের আছড়ে পড়ার ভারে খাট ভেঙে যায়। কাজী ক্যাপ্টেনের স্টেন ধরে টানাটানি করতে থাকে। সেপাইরা ভাবতেও পারে নি এই রকম কিছু ঘটতে পারে। তারা ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। গুলিতে ভীষণ রকম জখম হয় জায়েদ আর টগর। এর মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে কাজী পালিয়ে যায়—টানাটানির চোটে তার লুঙ্গি খুলে যায়। সেই অবস্থাতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

কাজীকে ধরতে না পেরে খানসেনাদের সব রাগ গিয়ে পড়ে বাড়ির বাকি লোকদের ওপর। মারের চোটে আজাদের নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, বাশারের বাঁ হাত কবজি আর কনুইয়ের মাঝে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, জুয়েলের আঙুল তো আগেই ভেঙেছিল, এখন নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে, মনোয়ার, সেকেন্দারও প্রচুর মার খায়।

তারপর গুলিবিদ্ধ, অচেতন জায়েদ আর টগরকে রক্তের স্রোতের মধ্যে ফেলে বাকিদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে খানসেনারা চলে যায়। চোখের সামনে এরকম পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা দেখে আজাদের মায়ের হুঁশ ছিল না বহুক্ষণ। চেতনা ফিরলে দেখেন ভোর হয়ে আসছে। দেখেন রক্তের থৈ-থৈ মেঝেতে দু'টি প্রাণী তখনো অজ্ঞান। তিনি পাশের বাসায় গিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফোন করেন এম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য। কিন্তু এম্বুলেন্স আসে না। তিনি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফোন করেন, কিন্তু এম্বুলেন্স আসে না। এই করতে করতে সকাল আটটা-ন'টা হয়ে যায়। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে রিকশা করে ইন্টারকনের সামনের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসেন। জায়েদ, টগরকে অনেক কষ্টে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তোলা হয়। তিনি ড্রাইভারকে মেডিক্যাল কলেজে যেতে বলেন। ড্রাইভার

তাকে পরামর্শ দেয় মেডিক্যালে না নিতে। কারণ মেডিক্যালে মিলিটারি ভর্তি। তারা গুলিবিদ্ধ পেসেন্ট দেখলে গুম করে ফেলবে। তখন আজাদের মা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যান।

হোলি ফ্যামিলিতে জায়েদ, টগর এখনো সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে। জায়েদ ছয়দিন অজ্ঞান ছিল। আজাদের মা স্টিল আলমারির পাল্লা দুটো খুলে দেখালেন স্টেনের গুলি পাল্লা ফুটো করে পেছনের লোহার পাত ফুটো করে ঘরের দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে। ভাঙা খাট যেভাবে ছিল, সেভাবেই পড়ে আছে। মেঝের চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে, সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় নি। কে করবে? তিনি তো একদিকে নিজের ছেলের শোকে কাতর, অন্যদিকে আহত বোনের ছেলে দুটোর জন্য হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছেন। এই আটদিনে ওঁর চেহারাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, চুলে তেল নেই, পরনের কাপড় ময়লা। ঘরের দিকে, নিজের দিকে তাকাবার এক মুহূর্ত ফুসরত নেই ওঁর।

আজাদের মা জিগ্যেস করলেন, 'রুমীর কোন খবর করতে পারলেন বইন?'

'না আপা, এখনো কোনদিকে কোন সুরাহাই করতে পারছি না। পাগলাপীর বাবা ভরসা দিয়েছেন উনি রুমীকে বের করে এনে দেবেন। আপা, আপনি যাবেন ওঁর কাছে? খুব ক্ষমতাবান পীর উনি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড় বড় জেনারেল পর্যন্ত ওর কাছে আসে।'

'না বইন, আমার পীর সাহেব আছেন জুরাইনে, আমি গেছি তেনার কাছে। আল্লায় দিলে আজাদ আমার ছাড়া পায়া যাইব। আমি রমনা থানায় আজাদের লগে দেখা করছি।'

আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে এল। 'আজাদের সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছে!'

'না বইন। অরা দেখা করতে দেয় নাই। রাইতে রমনা থানায় আইনা রাখে, আমাদের চিনা এক লোক সিপাইরে ঘুষ-মুষ দিয়া কেমন কইরা জানি বন্দোবস্ত করছিল, রাইতে লুকাইয়া জানালার বাইরে দাঁড়ায়া কথা বলছি।'

'কি কথা বললেন? কেমন আছেন আজাদ?'

'বইনরে। বড্ড মারছে আমার আজাদরে। আমি কইলাম বাবা কারো নাম বল নাই তো? সে কইল, 'না মা, কই নাই। কিন্তু মা যদি আরো মারে? ভয় লাগে যদি কইয়া ফেলি?' আমি কইলাম, 'বাবা, যখন মারবো, তুমি শক্ত হইয়া সহ্য কইরো।'

৭ সেপ্টেম্বর
মঙ্গলবার ১৯৭১

বিকেলবেলা পাগলা বাবার ভেতরের ঘরে খুব মন খারাপ করে বসেছিলাম। আমার চারপাশ ঘিরে বসে ছিল লালু, মা, ঝিনু, শিমুল, ওদের মা, মোশফেকা মাহমুদ, তার মা, মাহমুদা হক, নাজমা মজিদ এবং আরো অনেকে। পাগলা বাবা পাশের ঘরে পুরুষদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি সবাইকে আজাদের মায়ের কাহিনী বলছিলাম। শুনে প্রায় সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। খানিক পরে শিমুলের একটা কথায় ভয়ানক চমকে গেলাম। গত তিনদিন থেকে নাকি আলতাফ মাহমুদ আর বদিকে রাতে

রমনা থানায় আনছে না। ওদের তাহলে কি হল? আমি শিমুলকে জিগ্যেস করলাম, 'কার কাছে শুনলে এ কথা?'

'চুল্লু ভাইয়ের ভাবীর কাছে।'

'চুল্লুর ভাবী ইশরাতও পাগলা বাবার কাছে আসে। তার কাছ থেকে আমরা মাঝে মাঝে রমনা থানার ছিটেফোঁটা জানতে পারি। চুল্লুর ভাইয়ের সঙ্গে এক ডি.আই.জি. সাহেবের বেশ ভালো জানাশোনা আছে। তার মারফত রমনা থানার বন্দীদের কিছু কিছু খবর চুল্লুর ভাই-ভাবী পান।

ঝিনু অঝোরে কাঁদছে। আমার মা তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি গুম হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম রমনা থানায় না আনার অর্থ কি? শরীফ, জামীরা যখন আলতাফ মাহমুদকে দেখে তখনই তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তবে কি আলতাফ মাহমুদ মরে গেছেন? নাকি ওরা গুলি করে শেষ করে দিয়েছে? বদিরও কি তাই হয়েছে? জামী ফিরে এসে বলেছিল বদি নাকি ভয়ানক উতলা হয়ে থাকত। খালি বলত, 'আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি আত্মহত্যা করব।' একবার সে ঘরের প্লাগপয়েন্টে আঙুল ঢুকিয়ে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মরতে চেয়েছিল। আরেকবার হঠাৎ দৌড় দিয়েছিল এই আশায় যে দৌড়োতে দেখলেই খানসেনারা ওকে গুলি করবে। কিন্তু খানসেনারা খুব সেয়ানা। ওরা বুঝে গিয়েছিল চারধারে এত পাহারার মাঝখানে খালি হাতে দৌড় দেয়ার কি অর্থ। গুলি না করে কয়েকজন খানসেনা তিনদিক থেকে এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলে।

রুমীকে কখনই রমনা থানায় আনে নি কেন? আনলে তবু তো ছিটেফোঁটা কিছু খবরও পেতাম। কোথায় রেখেছে তাকে, কিভাবে রেখেছে—ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে মাথা ঘুরে যায়। কি করব আমি? কেউ কোন খবর বের করতে পারছে না। পাগলা বাবা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন—শিগগিরই তিনি রুমীর খবর বের করে আনবেন। কিন্তু কবে?

পাগলা বাবা ভেতরের ঘরে এলে আমরা তাকে আলতাফ মাহমুদের কথা জিগ্যেস করলাম। ঝিনু কেঁদে তার পায়ের ওপর পড়ল। ঝিনুর মা কাঁদতে লাগলেন। আমরা সবাই নিজের নিজের হারানো প্রিয়জনের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলাম। পাগলা বাবা ধমক দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, 'তোরা কোথা থেকে কি সব ভুল-ভাল আবোল-তাবোল কথা শুনে মাতম করিস! আমি বলছি আলতাফ সহি-সালামতে আছে। শিগগিরই তার খবর পাবি। বাকিরাও সবাই ভালো আছে। তোরা সবাই খবর পাবি ঠিক সময়ে। আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রাণপণে।'

৯ সেপ্টেম্বর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

প্রতি বৃহস্পতিবারে পাগলা বাবার আস্তানায় মিলাদ-মাহফিল হয়। এখানে আজ সকাল থেকে পাগলা বাবা রুমী, আলতাফ মাহমুদ, মামুন মাহমুদ, আবদুল মজিদ, শামসুল হক, ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর—সকলের জন্য কোরান খতম শুরু করিয়েছেন। মিলাদের জন্য দশ সের অমৃতি এনেছি। অন্যরাও ওই রকম পরিমাণ মিষ্টান্ন এনেছে। বাদ আছর মিলাদের সময় প্রচুর লোক হয়। পেছনদিকে বিরাট একটা বেড়ার ঘর আছে—

নামাজের জন্য জামাতঘর, সেইখানে পাগলা বাবা নিজে মিলাদ পড়ান। মেয়েরা এদিককার পাকা ঘরে বারান্দায় বসে। বাবা আমাদের সবাইকে বলেছেন তিনি জায়নামাজে বসে খাস দেলে ধ্যান করে জেনেছেন রুমী, আলতাফ, মামুন—ওরা সবাই বেঁচে আছে। তিনি শিগগিরই ওদের সবাইকে বের করে আনবেন। আমাদের শুধু একটুখানি ধৈর্য ধরতে হবে, আল্লার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, পাগলা বাবার ওপর ভরসা রাখতে হবে।

পাগলাপীরের কথামতই চলছি। সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন যে যা বলছে তাই করে চলেছি। একজন বললেন, রুমীর নামে একটা খাসি কোরবানি দাও—জানের সদকা। তাই দিলাম। পরশুদিন একটা খাসি কিনে এনে বাড়িতে কোরবানি দেওয়া হল। আকবরের বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খাসিটা নিজের হাতে জবাই করলেন। কিছু গোশত ফকিরদের বিলানো হল, বাকিটা এতিমখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঐদিন দুপুরের পর পাগলা বাবার আস্তানায় খতমের দোয়া ও মোনাজাত করা হল রুমীর জন্য। বাবার নির্দেশে সাত সের অমৃতি নিয়ে গিয়েছিলাম। দু'সের আলাদা করে বাবা দোয়া পড়ে দম করে দিয়েছিলেন পাড়ায় বিলোবার জন্য।

ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের জি. এম. আমিনুর রহমান সাহেব নিয়মিত পাগলাপীরের কাছে যান। তিনি শরীফ, ফকির এবং মিনিভাইয়ের বন্ধু। ওঁকে ধরে গতকাল পাগলা বাবাকে বাসায় আনিয়েছিলাম। বাবা বাড়িতে এসে দোতলায় রুমীর ঘরে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন, সালাম ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চোখ বুজে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন। তারপর বললেন, 'একটুও ঘাবড়াসনে। সে ভালো আছে। শিগগিরই তাকে বের করে আনব।'

মিলাদের পর বেশির ভাগ লোক চলে গেছেন। আমরাও যাবার উদ্যোগ করতে পাগলা বাবা বসতে বললেন। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। আরো লোকজন চলে গেলে বাবা আমাকে আর শরীফকে ডাকলেন, বললেন, রুমীকে বের করে আনার একটা ব্যবস্থা তিনি করেছেন। জামাতঘরে একজন পাঞ্জাবি সার্জেন্টকে বসিয়ে রেখেছেন। এর সঙ্গে তিনি আগেই কথাবার্তা বলে নিয়েছেন। সার্জেন্টটি খবর বের করেছে রুমীকে কোথায় রাখা হয়েছে। আমরা দু'জন যদি তাকে গাড়িতে উঠিয়ে এখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যাই, তাহলে সে রুমীকে বের করে আমাদের গাড়িতে তুলে দেবে। কথাটা অন্য কাউকে যেন না বলি। কারণ সকলের জন্য এরকম বিশেষ ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রুমীর জন্যই তিনি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই গোপন ব্যবস্থাটা করেছেন।

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য যে শোনামাত্র আমাদের তাক লেগে গেল। সম্বিত ফিরে পেয়ে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল—আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, 'যাবো, এক্ষুণি যাবো।' শরীফের প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ উল্টো। সে বলল, 'এক্ষুণি যাওয়া সম্ভব নয়। একটু অসুবিধে আছে। কাল আপনাকে জানাব।' শরীফের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে আমি আর কোন কথা না বলে চুপ করে গেলাম।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতেই শরীফ আমাকে বোঝাল—এভাবে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। ওখানে ঢোকার পর খানসেনারা আমাদের দু'জনকে মেরে গাড়িটা গুম করে দিলে আমাদের আত্মীয়বন্ধুরা কোনকালেও খুঁজে বের করতে পারবে না আমাদের কি হল।

১১ সেপ্টেম্বর
শনিবার ১৯৭১

ভারবাহী গর্দভের মত দিনগুলো টেনে নিয়ে চলেছি। ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় পাগলা বাবার বাসায় যাই। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে শরীফ সেভ, গোসল করে নাশতা খেয়ে অফিসে যায়। আমরা সংসারের কাজে লেগে যাই। লালুর সাংঘাতিক এক মাথা ধরার ব্যারাম আছে—মাইগ্রেন। বাবা বলেছেন লালুর মাথা ঝেড়ে তিনি ফুঁক দেবেন ফজরের নামাজেরও আগে। তার জন্যই এই রকম ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটায় যাওয়া।

গতকাল থেকে মা আর আতাভাই আরেক দফা কোরান খতম শুরু করেছেন। আতাভাই এক থেকে পনের পারা, মা ষোল থেকে শেষ পারা পড়বেন। এটা ওরা শেষ করবেন আগামী বৃহস্পতিবার। এই কোরান খতমের শেষে দোয়া পাঠ করানো হবে পাগলা বাবাকে দিয়ে—তাঁর সাপ্তাহিক মিলাদের মাহফিলে।

এত ভোরে উঠে শরীফ ক্লান্ত। নিজের হাতে সংসারের সমস্ত কাজ করা—কারণ বারেকও চলে গেছে। বিকেলে আবার পাগলা বাবার আস্তানায় যাওয়া। এর মধ্যে নানা ধরনের দোয়া, আমল, খতম। এর মধ্যেও চমক—দেড়টার সময় হঠাৎ আবুর ফোন।

আবু—পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের উইং কমান্ডার মাহবুবুর রহমান—সে তো করাচিতে রয়েছে বলেই জানতাম। তার ফোন পেয়ে অবাক হলাম, 'তুমি ঢাকায় কি করছ? কবে এসেছে?'

'বাসায় আছো তো? এসে সব বলছি।'

আবু ১৯৪৪-৪৮ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শরীফের সঙ্গে পড়ত। সেই থেকে বন্ধুত্ব। আবুর কোন বড় বোন ছিল না। তাই সে আমার সঙ্গে বুবু পাতায়। সেই থেকে আমি তার সবগুলো ভাইবোনের বুবু।

আবু বাসায় এসে এক চমকপ্রদ, অবিশ্বাস্য কিন্তু খাঁটি সত্য কাহিনী শোনাল। গত দুই মাস পাঁচদিন ধ'রে ঢাকায় সে সামরিক জান্তার বন্দীশালায় বন্দী জীবনযাপন করেছে। আজকে তাকে ছেড়েছে, আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে তাকে করাচি যেতে হবে। সেখানে তার বউ-ছেলে রয়েছে—তারা জানে যে, আবু ঢাকায় এয়ারফোর্সের যে ইস্ট-ওয়েস্ট কম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশান আছে, সেটা মেরামত করতে ঢাকা গেছে। ১৯৬৭ সালে আবুই এয়ারফোর্সের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঢাকায় ঐ মাল্টিচ্যানেল রেডিও-টেলিফোন-টেলিপ্রিন্টার লিঙ্ক ইনস্টল করেছিল। আবুকে করাচিতে বলা হয়, ঢাকায় ঐ লিঙ্ক ইকুইপমেন্ট ঠিকমত চলছে না। যেহেতু তুমিই ওটা বসিয়েছিলে, অতএব তুমি ছাড়া আর কেউ ওটা ঠিকমত মেরামত করতে পারবে না।

তেজগাঁ এয়ারপোর্টে নামার পর আবুকে জানানো হয় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয় সে এ বছরের প্রথমদিকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে শেখের কাছে কিছু গোপন খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল।

এরপর আবুর ওপর শুরু হয় নির্যাতন। এয়ারপোর্টের উল্টোদিকে যে এয়ারফোর্স অফিসার্স মেস, তার পেছন দিকে কাঁঠাল বাগানের একটা জায়গায় আবুকে নিয়ে রাখে। ব্যারাকের মত ঘর, টিনের ছাদ, পাঁচ ইঞ্চির পাকা দেয়াল, চারধারে ডবল কাঁটাতারের বেড়া। এখানে ওকে রাখে একটা ছোট্ট ঘরে—একদম একা। ওকে বলা

হয় 'আমরা তোমার সম্বন্ধে সব জানি। কিছু গোপন করে লাভ হবে না। যা জান, যা করেছ, সব বলবে।'

এখানে তেরদিন নির্জন ঘরে একাকী রাখার পর একরাতে আবুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যায় অন্য একটা জায়গায়—শেরে বাংলা নগরের ফিল্ড এন্টারোগেশান ইউনিটে। এখানেও কাটে তেরটা দিন। এই তেরদিন আবুকে ঘুমোতে দেওয়া হয় নি, শুতে দেয়া হয় নি, কড়া বাতি চোখের সামনে জ্বালিয়ে অনবরত ইন্টারোগেশান চলেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, এলোপাতাড়ি প্রশ্ন, এলোমেলো প্রশ্ন—কয়েক ঘণ্টা প্রশ্ন করে, তারপর কাগজ-কলম দিয়ে বলে, লেখ, যা জান সব লেখ। লেখা পছন্দ না হলে নির্যাতন। বেশ খানিক নির্যাতন করে লেখা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে আবার লিখতে বলে।

এরপর তাকে এয়ারপোর্টের উল্টো দিকে প্রাদেশিক সংসদ ভবনের কাছে একটা বাড়িতে নিয়ে রাখে কয়দিন, আবার ফেরত নেয় কাঁঠাল বাগানের ব্যারাকে। সব জায়গাতেই অমানুষিক নির্যাতনের পর শেষমেষ আবুর 'স্টেটমেন্ট' নেওয়া শেষ হয়।

আজ আবুকে ছেড়েছে। প্রথমে সে তার চাচার বাসায় গিয়েছিল। গিয়ে দেখে চাচার বাসায় বিহারি দারোয়ান বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। চাচা পাড়ার পিস কমিটির মেম্বার। সেখানে ঘণ্টাখানেকও বসে নি, চলে এসেছে এখানে।

আমি বললাম, 'তোমার চেহারা একদম খারাপ হয়ে গেছে। খুব লাঠিপেটা করেছে না?'

'না, আমাকে কিন্তু লাঠি দিয়ে তেমন পেটায় নি। সবাইকে ওরা একই রকম টর্চার করে না। ওরা দেখে কার কি রকম স্ট্যামিনা, কার কি রকম সহ্য করার ক্ষমতা, কে অল্পেই ঘাবড়ে যায়, কে নার্ভাস, কে স্টেডি। বন্দীর সাইকোলজি বুঝে ওদের টর্চারের হেরফের হয়। তাছাড়া একজন সিনিয়ার মিলিটারি অফিসার হিসেবে আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস ছিল পুরোপুরি। তাই ওরা অনেক অত্যাচার করেও আমাকে কাবু করতে পারে নি। তোমরা তো জান আমি চিরকাল যোগ ব্যায়াম করেছি। হেডস্ট্যান্ড করেছি।'

'জানি না? রুমীকে হেডস্ট্যান্ড করা তুমিই তো শিখিয়েছিলে। রুমী যোগ ব্যায়ামও তো শুরু করে তোমার কাছেই।'

'ওরা প্রথম প্রথম আমার ওপর কয়েকটা গতানুগতিক অত্যাচার ক'রে দেখে আমার কিছুই হয় না। তখন ওরা অন্যরকম চর্টার করে আমাকে কাবু করতে চাইল। ফ্যানের সঙ্গে পা বেঁধে মাথা নিচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। আমার হেডস্ট্যান্ড করা অভ্যেস ছিল বলে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে নি। ওরা পরপর তিন রাত—প্রত্যেকবার ঘণ্টা তিনেক করে এভাবে ঝুলিয়ে দেখল, আমার কিচ্ছু হয় না, তখন ওরা এটা বাদ দিল। আসলে যে কোন প্রকারে আমার মনোবল ভেঙে দিয়ে আমার কাছে থেকে ওদের ইচ্ছেমত স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেওয়াই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম—একদম প্রথমে যা বলেছি, শেষ পর্যন্ত তাই বলে যাব। প্রথম দিন কাগজে যা লিখেছি, শেষ পর্যন্ত তাই লিখে যাব।'

অত্যাচারের চোটে আবুর হাতের আঙুলের গিঁঠগুলো মচকে গেছে, কোমরে অসম্ভব ব্যথা। সামনে ঝুঁকতে পারে না, বসলে উঠতে পারে না, উঠলে বসতে পারে না। শরীফ, জামী, মাসুম তিনজনেই তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে তাদেরও প্রত্যেকের ঘাড়ে, কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা, তাদেরও হাতের আঙুল মুঠ করতে, হাঁটু ভাঁজ করতে বিষম ব্যথা লাগে।

একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকেই গলার কাছে উসখুস করছিল, করব কি করব না করে অনেকক্ষণ গেল, শেষমেষ করেই ফেললাম, 'এমনকি কোন টর্চার আছে, যাতে শরীরের কোথাও কাটবে না, ভাঙবে না, কিন্তু ভেতরটা চুরচুর হয়ে যাবে?'

'আছে বই কি, অনেক রকম আছে। যেমন একটা হল সকিং। মোজার মধ্যে বালি ভরে মারলে শরীরে কোথাও দাগ পড়বে না কিন্তু মারের চোটে মনে হবে শরীরের সমস্ত মাংস—'

জামী চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, আবার? মামা প্লীজ, বলবেন না। মা, ওইসব শুনবে, তারপর কাঁদতে কাঁদতে ফিট হবে।'

১২ সেপ্টেম্বর
রবিবার ১৯৭১

মন খুব খারাপ। আবু এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বাসা থেকে গেল এগারোটার দিকে। সকালে উঠে পরটা করে ডিম, মিষ্টি, গোশত ভুনা দিয়ে যতটা সম্ভব ভারি নাশতা খাইয়ে দিয়েছি আবুকে। করাচির প্লেন ক'টায় ছাড়বে আবু জানে না, তার ওপর নির্দেশ ছিল বারোটার মধ্যে তেজগাঁও এয়ারপোর্ট পৌঁছানোর।

গতকাল বিকেলে আবুকে পাগলাপীরের কাছে নিয়ে গেছিলাম। বাবার পায়ের কাছে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট রেখে সালাম করার কথা আবুকে আগেই বলে দিয়েছিলাম। বাবা আবুকে খুব খাতির করে কথাবার্তা বললেন, দোয়া করলেন, তার কোমরে ফুঁক দিয়ে দিলেন।

কাল রাতে প্রথমে নিচতলায় ডাইনিংরুমের চৌকিটায় আবুর জন্য বিছানা করেছিলাম। খানিক পরে উপলব্ধি করলাম আবু একা একা নিচতলায় থাকার চিন্তায় খুব স্বস্তি পাচ্ছে না। তখন ওকে আমাদের বেডরুমে নিয়ে গেলাম। খাটের ওপর আবু আর শরীফকে দিয়ে আমি মেঝেতে তোষক পেতে শুলাম। কিন্তু ঘুম তেমন হল না। অনেকক্ষণ কথাবার্তা, তারপর নামাজ, কোরান শরীফ পড়া, তারপর শুয়ে শুয়ে আবার কথাবার্তা। ভোরের দিকে অল্প একটুখানি ঘুম।

মাত্র বিশ ঘণ্টার জন্য এসে আমাদের দুঃখক্লিষ্ট জীবনে একটুখানি আলোড়ন তুলে আবু চলে গেল তার অজানা, অনির্দিষ্ট ভাগ্যের পথে। কে জানে, করাচিতে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। আমরা জানি না সামনের দিনগুলোতে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।

১৩ সেপ্টেম্বর
সোমবার ১৯৭১

রুমীর কোন খবর নেই। প্রতিদিন পাগলা বাবার কাছে যাচ্ছি, তার পায়ের ওপর পড়ে কান্নাকাটি করছি। তিনি বেশির ভাগ সময় চুপ করে ধ্যানে বসে থাকেন, কোন কথা বলেন না। বেশি চাপাচাপি করলে বিরক্ত হন। তবু আমরা সবাই পাগলাপীরের আস্তানায় ধরনা দিয়ে বসে থাকি—আমি, মা, লালু, মোশফেকা মাহমুদ, তার মা, ঝিনু

মাহমুদ, শিমুল বিল্লাহ, তাদের চার ভাই, তাদের মা নাজমা মজিদ, মাহমুদা হক। ধরনা দিয়ে বসে থাকেন চট্টগ্রামের অ্যান্টি করাপসান ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টার নাজমুল হকের স্ত্রী, বরিশালের এ.ডি.সি. আজিজুল ইসলামের স্ত্রী, কুমিল্লার ডি.সি. শামসুল হক খানের স্ত্রী, রাজশাহীর সিনিয়ার রেডিও ইঞ্জিনিয়ার মহসীন আলীর স্ত্রী, চট্টগ্রামের চীফ প্লানিং অফিসার রেলওয়ে, শফী আহমদের স্ত্রী, পিরোজপুরের এস.ডি.পি.ও. ফরিদুর রহমান আহমদের স্ত্রী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সি.ও.লে. কর্নেল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ফিল্ড ইনটেলিজেন্সের মেজর আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রী এবং এরকম আরো বহু। এঁদের সকলেরই স্বামী নিখোঁজ। আমরা পরস্পরের দুঃখের কাহিনী শুনি, কাঁদি, দোয়া-দরুদ পড়ি, আবার নিজেদের মধ্যে দুঃখের কথা নিয়ে আলোচনা করি, আবার কাঁদি। এত লোক আসে পাগলাপীরের কাছে! অবাক হই সারা বাংলাদেশের যত ছোবল-খাওয়া লোক—সব যেন আসে এখানে! এতগুলো লোক প্রিয়জন হারানোর দুঃখে মুহ্যমান, এদের মধ্যে বসে নিজের পুত্রশোকের ধারটা কমে যায় অনেকখানি। এক ধরনের সহমর্মিতায় মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। সবাইকে মনে হয় আত্মার আত্মীয়, মনে হয় সবাই মিলে আমরা একটি পরিবার। পি.এস.পি. আওয়াল সাহেব আগে থেকে আমাদের পরিচিত, তিনি ও তাঁর স্ত্রী আসেন ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে। আমি জানি, তাঁদের অন্য তিনটি ছেলে মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে। কিন্তু আমরা ভুলেও তাদের কথা তুলি না। উলফাতের বাবা আজিজুস সামাদ সাহেব ছাড়া পাবার পর সাদেকা সামাদ আপা তাঁকে নিয়ে পাগলাপীরের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁদের কুশল জিগ্যেস করেছি কিন্তু উলফাত, আশফাক কেমন আছে—একবারও শুধোই নি। ভয় হয় ফিসফিস করে শুধোলেও বুঝিবা দেয়াল শুনে ফেলবে, ইশারায় শুধোলেও বুঝিবা আকাশ দেখে ফেলবে। পাগলা বাবার কাছে নিয়মিত আসেন গায়ক আবদুল আলীম, আসেন বেদারউদ্দিন আহমদ, আসেন আরো অনেক শিল্পী। শুধু যে ছোবল খাওয়ারাই আসেন তা নয়। ছোবল যাতে না খেতে হয় তার জন্য দোয়া নিতেও বহুজন আসেন।

ফকির পাগলাপীরের ওপর প্রসন্ন নয়। আমরা পাগলাপীরের কাছে যেতে শুরু করেছি শুনেই প্রথমদিন মন্তব্য করেছিল : 'ও বাবা, বহুত এক্স্‌পেন্‌সিভ পীরের কাছে গেছেন।' ওর বন্ধু আমিনুল ইসলাম নিয়মিত পাগলাপীরের কাছে যায়, সেটাও ফকিরের পছন্দ নয়। এই নিয়ে আমিনুল ইসলামের সঙ্গে তার প্রায় তর্ক হয়। ফকিরের দৃঢ়বিশ্বাস পাগলাপীর পাক আর্মির দালাল। সেদিন যে তিনি পাঞ্জাবি সার্জেন্টের সঙ্গে আমাদের দু'জনকে ক্যান্টনমেন্টে পাঠাতে চেয়েছিলেন রুমীকে আনার জন্য, সেটা ওঁর স্রেফ ভাঁওতা। আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে বাঘের খোঁপে ঢুকিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমিনুল ইসলাম এবং আমরা কেউই ফকিরের কথায় কান দিই নি এবং পাগলা বাবার ওপর বিশ্বাসও হারাই নি।

শরীফদের আরেক বন্ধু আগা ইউসুফ আগে যখন আর্মিতে ছিলেন, তখন তাঁর বস্ ছিলেন, আজকের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল নিয়াজী। ঐ সময় নিয়াজীর সঙ্গে আগার বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। আগা ইউসুফ অনেক দিন হয় আর্মি থেকে রিটায়ার করে বর্তমানে আই.পি.বি-র চেয়ারম্যান। লেঃ জেঃ নিয়াজী ঢাকায় আসার পরপরই আগা ইউসুফকে খোঁজ করে তাঁর বাসায় চা খেতে ডেকেছিলেন। শরীফের সঙ্গে আগা ইউসুফের প্রায় দেখা হয় ঢাকা ক্লাবে। শরীফ এবং ফকির তাকে অনুরোধ করেছে—নিয়াজীকে বলে রুমীর খবরটা বের করার চেষ্টা করতে।

১৪ সেপ্টেম্বর
মঙ্গলবার ১৯৭১

একটা রক্ত হিম করা গুজব কানে এল। চার সেপ্টেম্বর রাতে নাকি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। পাঁচ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তা নিয়ে সেনাবাহিনীর ভেতরে নাকি মতভেদ ছিল। একদলের মত ছিল এই সব দেশদ্রোহী দুষ্কৃতকারী কোনভাবেই সাধারণ ক্ষমা পাবার যোগ্য নয়। এদের ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে 'দেশের' সমূহ ক্ষতি। তাই প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হবার আগের রাতেই তাড়াহুড়ো করে প্রায় শ'খানেক দেশদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

গুজবটা শুনে প্রথমে আমরা সবাই স্তম্ভিত বাকহারা হয়ে রইলাম। খবরটার সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। তাহলে, শিমুল যে বলেছিল, চার সেপ্টেম্বরের রাত থেকে আলতাফ মাহমুদকে রমনা থানায় আনে নি, সে খবরটার মূল তাৎপর্য এই? তাহলে কি সত্যি সত্যি ঐ চার সেপ্টেম্বরের রাতেই আলতাফ, বদি, জুয়েল, আজাদ, রুমী—?

আজাদের মা'র কাছে ছুটলাম। উনি বললেন, আজাদ ধরা পড়ার পর প্রথম সপ্তাহেই মাত্র দু'দিন তিনি লুকিয়ে রমনা থানার জানালার বাইরে থেকে আজাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলেন, তার পর আর সুযোগ পান নি। তিনি জানেনও না, আজাদকে এখনো রমনা থানায় আনে কিনা।

চুল্লুর ভাবী ইশরাতও আর কোন খবর বলতে পারল না। যে ভদ্রলোক এর আগে একটু ছিটেফোঁটা খবর এনে দিতেন, তাঁকেও অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে খবর জানতে হত। তাঁরও বোধ হয় কিছু অসুবিধে হয়ে গেছে।

কি করি? কার কাছে যাই? আগা ইউসুফ সাহেব চেষ্টা করবেন বলেছেন। তবে তাঁর অসুবিধে হল নিয়াজী নিজে থেকে তাকে চা খেতে না ডাকলে তিনি নিয়াজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। শুধু রুমী নয়। আহাদ সাহেব এবং সাইদুল হাসান সাহেবের খবর এনে দেবার অনুরোধও রয়েছে তাঁর কাছে।

পাগলা বাবা কিন্তু ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন ও গুজব সত্যি না। ওরা সবাই বেঁচে আছে।

কিন্তু পাগলা বাবার কথায় ষোল আনা ভরসা করতে মন যেন আর সায় দিতে পারছে না। পাগলা বাবার কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু মনের ভেতরের মনে যেন মাঝে মাঝে কেউ বলছে: রুমী নেই, আলতাফ নেই, জুয়েল নেই, বদি, বাশার, হাফিজ নেই, আজাদ নেই, নেই, নেই, ওরা কেউ নেই।

রুমী নেই? এই নবীন বয়সে—যখন পৃথিবীর রূপ-রস-মধু-গন্ধ উপভোগ করার জন্য সবে বিকশিত হচ্ছিল, তখনই সে নেই? এই সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ থেকে তার ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ক্লাস করার কথা। তার বদলে চার তারিখে কোথায় গেল সে?

মনে পড়ল, ডাইনিং রুমের এই চৌকিটার সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে—২৮ আগস্টে সে বলেছিল, যদি চলেও যাই, কোন আক্ষেপ নিয়ে যাব না। হয়তো জীবনের পুরোটা তোমাদের মত জানি নি, তবু জীবনের যত রস-মাধুর্য-তিক্ততা-বিষ সবকিছুর স্বাদ আমি এর মধ্যে পেয়েছি।

সেদিন সেই বিষণ্ন বিকেলে রুমী চৌকির সামনে মেঝেতে পায়চারি করতে করতে বলেছিল তার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম-বিরহ-মিলন-বিচ্ছেদের এক অনুক্ত কাহিনী।

একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চেয়ে দু'এক ক্লাস ওপরে পড়ত, সেই মেয়ে তাকে হাতে ধরে প্রেমের আনন্দ-বেদনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়েছিল। শেষমেষ মেয়েটি তাকে ছলনাই করেছিল, রুমী তাতে প্রচণ্ড দুঃখও পেয়েছিল। কিন্তু পরে মেয়েটির ওপর তার আর কোন রাগ ছিল না। কারণ মেয়েটি তখন তার কাছে রক্ত-মাংসের কোনো মানবী ছিল না, তখন সে তার মনের মধ্যে হয়ে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতীক স্বরূপিনী।

ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে সেদিন রুমী রবি ঠাকুরের একটি কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করেছিল :

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মনি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

১৭ সেপ্টেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

রেবা টাট্টুকে নিয়ে করাচি চলে যাচ্ছে আগামীকাল। মিনিভাইয়ের পাশের বাসার পড়শী লেঃ কর্নেল কেরোয়শীর ভাবভঙ্গি ক্রমেই আতঙ্কজনক হয়ে উঠছে। ভদ্রলোকের পড়শীসুলভ সদ্ভাব বজায় রাখার প্রচেষ্টা ক্রমেই যাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মিনিভাইদের বাড়ি সব্বার দেখভাল করার দায়িত্ব যেন ওর কাঁধেই গিয়ে পড়েছে। দু'বাড়ির মাঝখানের বাউন্ডারি ওয়াল বেশ নিচু। ভদ্রলোক বিকেলে লনে তো বসবেই, এদিকে মিনিভাইরা কেউ বেরোলেই সে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে এসে চেঁচিয়ে ডেকে খোশগল্প জুড়ে দেবে। মিনিভাইদের বাড়িতে কেউ মেহমান এলেই খানিক পরে কোরায়শীও এ বাড়িতে আড্ডা দিতে এসে হাজির হয়ে যাবে। আর জাহির, টাট্টু, সোজন, মিনিভাই— রেবার তিন ছেলে যেন তারও চোখের মণি। এই ছেলেদের খবরদারির চোটেই মিনিভাই-রেবার ঘুম হারাম হয়ে উঠেছে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে রুমী-জামীকে নিয়ে যখন এ বাসায় একটু বেশি আসতাম, তখন আমাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল এর। টাট্টু পরীক্ষা দিতে পারে নি 'দেশদ্রোহী দুষ্কৃতকারীদের' জন্য, করাচিতে নভেম্বরে পরীক্ষা হচ্ছে, করাচিতে টাট্টুর বাবার বিজনেস পার্টনার যখন আছেনই, তখন ছেলেকে ওখানে পাঠিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ছেলের একটা বছর নষ্ট হবে না— কোরায়শী সাহেবের এসব সুবুদ্ধির ঠেলায় মিনিভাইরা দিশেহারা।

শেষমেষ ছেলেকে নিয়ে করাচি যাওয়াই ঠিক হয়েছে। রেবা নিয়ে যাচ্ছে আগামীকাল।

২৪ সেপ্টেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

ফকির বলল, 'ঠেটা মালেক্যার মন্ত্রীদের তো একেবারে কুফা অবস্থা—'

জামী হেসে ফেলল, 'চাচা, আপনিও দেখি চরমপত্রের ভাষায় কথা বলছেন।'

ফকিরও হাসল, 'শুধু আমি কেন রে বেটা, ঢাকায় প্রায় সবার মুখেই তো এখন এই সব কথাই শুনছি—কুফা, ফাতা ফাতা, ছ্যারাব্যারা অবস্থা, মাদারের খেইল, গুয়ামুরি হাসি, ফুচি মারা—ইঃ! বাংলা ভাষাকে একেবারে—'

ফকিরের মুখের কথা কেড়ে শরীফ পাদপূরণ করল, 'সমৃদ্ধ করে দিল!'

আজ দুপুরে নাকি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাকের গাড়িতে 'মুক্তি'রা বোমা ছুঁড়েছে, মন্ত্রীর হাত-পা দুই-ই জখম, গাড়ির ড্রাইভার ও অন্য দু'জন যাত্রীও জখম। ফকিরই খবরটা এনেছে। ২৯-৩০ আগস্ট একগাদা মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার হবার পর ঢাকা শহর ক'দিন যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, এখন আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে একটু একটু নড়েচড়ে উঠছে। দশ তারিখে বাসাবো এলাকায় একদল মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে ওখানকার কদমতলী ফাঁড়ির পুলিশ আর রাজাকারদের বেশ বড় রকম সংঘর্ষ হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা নদীর ওপারের এক গ্রাম থেকে এসে ফাঁড়ি ঘেরাও করে রেইড করে বেশিকিছু পুলিশ আর রাজাকার মেরে আবার নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেছে। খবরটা আমাদের কানে আসতে ক'দিন দেরি হয়েছিল। নিজেদের দুঃখ-ধান্দা নিয়ে বড় বেশি মুষড়ে ছিলাম, খবরটা শুনে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠি সবাই।

শরীফ বলল, 'আচ্ছা কাগজে দেখলাম শেখ মুজিবের বিচার নাকি সমাপ্ত? মিলিটারি ট্রাইবুনাল শিগগিরই রিপোর্ট পেশ করবে প্রেসিডেন্টের কাছে। কি হবে বলে মনে হয়?'

ফকির বলল, 'কি করে বলব? আগা মাথা কিছুই তো ভেবে পাই না। শেখকে বাঁচিয়ে যে রেখেছে—এইটাই তো আমার কাছে প্রায় অলৌকিক মনে হয়।'

শরীফ বলল, 'আমার মনে হয় শেখকে মারতে ওরা সাহস পাবে না, এমনিতেই ওদের এখন ছ্যারাব্যারা অবস্থা, এ সময় শেখকে মারলে আরো যে গভীর গাড্ডায় পড়বে, সেটুকু বুদ্ধি ওদের আছে।'

২৯ সেপ্টেম্বর
বুধবার ১৯৭১

আজ থেকে ঠিক তিরিশ দিন আগে তারা আমার রুমীকে নিয়ে গেছে। এই তিরিশ দিনের মধ্যে একবারও কারো কাছ থেকে ছিটেফোঁটা একটু খবরও পেলাম না রুমী সম্বন্ধে।

খবর নেই অন্যদেরও। পাগলাপীর যদিও সব সময় প্রবল বেগে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন যে তারা সবাই বেঁচে আছ, তবুও আলতাফ, বদি, জুয়েল, বাকের, বাশার, হাফিজ, মামুন, মজিদ, শামসুল হক, জাহাঙ্গীর—কারো সম্বন্ধেই এক ফোঁটা খবরও কেউ কোনভাবে পাচ্ছে না।

সুফিয়া কামাল আপার বাসায় এসেছি। ঝিনু বলেছিল উনি আমাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

সুফিয়া কামাল আপা শব্দ করে কাঁদতে পারেন না। বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে

ফেলতে যেভাবে কথা বলেন, মনে হয় ওঁর বুকের হাড়-পাঁজর সব ভেঙে যাচ্ছে। এর চেয়ে যদি চেঁচিয়ে কাঁদতে পারতেন, বুঝি কষ্ট কম পেতেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে উনি একনাগাড়ে বলে যাচ্ছেন : 'এই তো মাত্র গেল বছর—আমরা বরিশালে রিলিফে যাব, রুমী এসে বলল, খালা আপনি একটু আম্মাকে বলুন, আম্মা তো যেতে দিচ্ছে না—আমি তোকে বললাম, তুই বললি, আপা আপনার সঙ্গে যাবে, তাতে আমার আপত্তি কিসের? ওতো আপনারও ছেলে—হায়রে—আমারও ছেলে! কি মায়াতেই যে বেঁধেছিল। যখনি আসত, চুপিচুপি পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমো দিত—মেলাঘর থেকে ফিরেই আমার কাছে এসেছিল। লুলু টুলুর সব খবর আমাকে বলে গেল—আর এই যে আলতাফ—আহা, হীরের টুকরো ছেলে—আমিই তো ঝিনুর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম—সেও আমার বুকে শেল হেনে কোথায় গেল—আলভী—আহারে, আলভী যখন এল আমার কাছে—তার সারা গায়ে রক্ত—রোগা দুবলা ছেলে কি মারটাই না মেরেছে—আমার ভালোবাসার ধনগুলোকে জালেমরা এমনভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে—

আমি আপার মাথাটা বুকে চেপে বললাম, 'আপা, চুপ করুন, একটু শান্ত হোন—।'

'আমি তো শান্তই আছিরে ভাই, দেখছিস না কেমন বুকে পাথর বেঁধে রয়েছি। রান্না করছি, সংসার দেখছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। এর চেয়ে আর কত শান্ত হয়ে থাকব?'

'আলভী কবে এসেছিল আপনার কাছে?'

'যেদিন ছাড়া পায়, সেইদিন রাতেই। রানা নিয়ে এসেছিল। রানাকে চিনিস? লুৎফর রহমানের ছেলে—লুৎফর রহমান—ঐ যে কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের ছোট জামাই—'

'চিনি। উনিই তো নুহেল, আলভীদের এসেম্বলি হাউসের সামনের রাস্তা থেকে তুলে আনেন।'

সুফিয়া কামাল আপা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, নুহেলরা চার ভাই আর আলভী যেদিন ছাড়া পায়, সেদিন এম.পি.এ. হোস্টেলের গেট থেকে মেইন রোড পর্যন্ত ওরা হেঁটে এসেছিল। তারপর এসেম্বলি হাউসের সামনে যে মাটির টিপির মত আছে, সেইখানে ওরা পাঁচজন বসেছিল। ওদের শরীর এত খারাপ ছিল যে আর হাঁটতে পারছিল না। সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে লুৎফর রহমান সাহেব গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উনি দেখতে পেয়ে ওদের পাঁচজনকে গাড়িতে তুলে বাসায় নিয়ে আসেন। নুহেলদের মুখে শুনেছি এ কথা। ওদের সঙ্গে তো এখন রোজই দেখা হয় পাগলাপীরের আস্তানায়। আলভী এখন কেমন আছে? আর দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আরো দু'বার এসেছিল। ও বোধ হয় এতদিনে আবার মেলাঘর চলে গেছে। ওর তো হাঁটবার মত অবস্থা ছিল না। ওর কিছু আর্টিস্ট বন্ধু—দেলোয়ার, কবীর—তারা তাদের বাসাতে লুকিয়ে রেখে ওর চিকিৎসা করিয়েছে। আমি আলভীর সঙ্গে গিয়াসের যোগাযোগ করে দিয়েছি। গিয়াসের ছোটভাই ডাঃ রশীদউদ্দিন—সে ওপারে চলে যেতে চায়। আলভী তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছে। অ্যাদ্দিনে চলেও গেছে মনে হয়।'

অক্টোবর

খালেদ মোশাররফ মাথা ঠাণ্ডা রেখে মুক্তিযুদ্ধের কাজ চালিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে দুই নম্বর সেক্টর, মেলাঘর তার হেডকোয়ার্টার্স। নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিরাট গেরিলা বাহিনী। দেশের অন্য সব জায়গা থেকে তো বটেই, বিশেষ করে ঢাকার যত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, টগবগে, বেপরোয়া ছেলে এসে জড়ো হয়েছে এই সেক্টর টুতে।

২ অক্টোবর
শনিবার ১৯৭১

মা বললেন, 'রুমীর নামে আরেকটা সদকা কোরবানি দাও।' আমি বললাম, 'এবার একটা গরু আনাই। রুমীর সঙ্গে আলতাফ, বদি, জুয়েল ওদের নামেও কোরবানি হোক।'

একটা গরু কিনে আনা হয়েছে। সলিমুল্লাহ এতিমখানা কাছেই—আজিমপুরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে কোরবানি দেওয়া হবে। গরু নিয়ে আমিরুদ্দি ড্রাইভার আর একজন পিওন হেঁটে রওনা হয়ে গেল। ওদের দু'জনকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হল—'পথে যদি কোন মিলিটারি জিগ্যেস করে গরু কোথায়, কি জন্য নিচ্ছ? শুধু বলবে এতিমখানায় নিয়ে যাচ্ছি। খবরদার কোরবানি দেবার কথা বলবে না। যদি জিগ্যেস করে কোন বাড়ি থেকে আসছে, খবরদার আমাদের বাড়ির ঠিকানা বলবে না। বলবে মোহাম্মদপুর থেকে আসছি।'

আধঘণ্টা পরে মাসুমের হাতে রুমী, আলতাফ, বদি, জুয়েল, আজাদ, বাশার ও হাফিজের নাম লেখা কাগজ দিলাম। বললাম, 'কোন্ বাড়ি থেকে গরু এসেছে, বোলো না।'

মাসুম বলল, 'তাতো হবে না। ওদের তো খাতায় ঠিকানা লিখতে হয়।'

তাহলে যা হোক একটা বানিয়ে ঠিকানা দিয়ে দিয়ো—মোহাম্মদপুরেরই দিয়ো। আর ঈমাম সাহেবকে বোলো কোরবানির পর গোশত যেন রেঁধে এতিমদের খাওয়ানো হয়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ো কোথাও কোন মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কোরবানি হওয়া মাত্রই সরে পোড়ো। আর পৌছেই আমিরুদ্দিদের চলে যেতে বোলো।'

মিলিটারির সম্ভাব্য সন্দেহের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এতসব আটঘাট বাঁধা। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সদকা কোরবানি দেবার 'অপরাধে' আবার না ধরে নিয়ে যায়!

বুড়া মিয়াকে খবর দিয়ে আবার আনানো হয়েছে। বাসায় একটা চব্বিশ ঘণ্টার বাঁধা কাজের লোক না থাকলে শুধু ঠিকা রেণুর মাকে দিয়ে আর চালানো যাচ্ছে না। তাছাড়া মা, লালুই বা আর কতদিন নিজের বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকবে? সামনে রোজা আসছে।

বুড়া মিয়া গত ষোল বছর ধরে আমাদের বাসায় বাবুর্চির কাজ করেছে। আলসারে কাহিল হয়ে এ বছরই জানুয়ারি মাসে বাড়ি চলে গিয়েছিল। বাবুর্চির কাজ করলেও বুড়া মিয়া খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। ধবধবে সাদা চুলদাড়ি আর রাশভারী ব্যবহারে ওকে মুরুব্বির মত লাগে। বুড়া মিয়া আসতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বাড়িঘর নির্দ্বিধায় ওর হাতে ফেলে যখন-তখন বেরুনো যাবে। এমনকি দরকার হলে পালানোও যাবে।

৫ অক্টোবর
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ শবেবরাত। গত রাতে শরীফ ১৪০ রাকাত নামাজ পড়েছে—তাছাড়াও দোয়াদরুদ। একটুও ঘুমোয় নি। মা আর জামীও সারারাতই জেগেছেন বলা যায়—মাঝে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে। আমি আরো কম জেগেছি। শরীর এত দুর্বল, রাতদুপুরের পর মাথা ঘুরতে লাগল। মা জোর করে শুইয়ে দিলেন।

আজকের রুটি-হালুয়া তৈরিতে অন্যান্যবারের মত কারুকার্য নেই। শুধু আটার

রুটি, সুজির হালুয়া আর গরুর গোশ্‌ত। পরিমাণে অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি। যত বেশি ফকিরকে দেওয়া যায়।

বাড়ির সবাই রোজা—কেবল আমি বাদে।

টেবিলে এফতার সাজাচ্ছি, শরীফ, জামী, মাসুম একে একে ওজু করে এসে জড়ো হচ্ছে, হঠাৎ কানে এল একটা শব্দ—বু-ম্‌ ম্‌ ম্‌। বেশ দূরে শব্দটা হয়েছে, তবু সারা শরীর শিউরে উঠল। বড় পরিচিত শব্দ—গত একমাসে খুব কম শুনেছি এ শব্দ। আজ শব্দটা বেশ পরিষ্কার, বেশ জোরালো।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে শরীফ এসে বসল একটা চেয়ারে, মৃদুস্বরে বলল 'শুনলে?'

'শুনলাম তো। বেশ দূরে মনে হল।'

'এখন থেকে কাছেও শুনবে।'

'তার মানে?'

'নতুন চালান এসেছে।'

মা, লালু রান্নাঘরে ছিলেন, দু'হাতে খাবারের বাটি নিয়ে তাঁদের আসতে দেখে শরীফ মুখ বন্ধ করে ফেলল।

এরপর ঘণ্টা দুয়েক আর নিরিবিলি কথা বলারই সুযোগ মিলল না। পড়শীদের বাড়ি থেকে রুটি-হালুয়া আসছে, দরজায় ফকিরদের ভিড়, তাদের সুস্থির করে একে একে রুটি-হালুয়া, গোশত বিলি করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর মধ্যে দাদা ভাই, মোর্তুজা ভাই একটি টিফিন কেরিয়ার ভর্তি রুটি-হালুয়া নিয়ে এসে উপস্থিত। ওঁরা আসতেই শরীফ ওদের সঙ্গে বসার ঘরে রেডিও নিয়ে বসল। স্বাধীন বাংলা বেতার অনুষ্ঠানের সময় হলেই আর অন্য কোন কথা নয়, যে যেখানেই থাকুক, রেডিও নিয়ে বসবেই।

রাতে শুতে যাবার সময় শরীফের কাছে শুনলাম মেলাঘর থেকে নতুন গেরিলা দল এসে ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারের দিকে ঘাঁটি গেড়েছে। সেই দলের ডেপুটি লিডার বাচ্চু মঞ্জুর হোসেনের আপন ভাগনে। বাঁকার বউ ডলিও মঞ্জুরের এক ভাগনী, সেই সুবাদে বাচ্চু, বাঁকারও শ্যালক হচ্ছে।

ওরা আপাতত ফার্মগেটে আর ফকিরাপুলে দুটো বাড়িভাড়া নিয়েছে। এ সবের খরচ যোগাচ্ছে বাঁকা আর মঞ্জুর। পরে সুযোগ বুঝে আরো দুটো জায়গায় বাড়ি ভাড়া করবে। আজ শবেবরাতের রাতে ওদের প্রথম অ্যাকশান করার কথা ছিল। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওটা ওদেরই অ্যাকশান। কাল পরশু জানা যাবে ঘটনার বিবরণ।

৭ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঝিনুরা বাসা বদল করেছে। আগের বাসাটা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উল্টো দিকে ছিল, আত্মীয়বন্ধু যেতে ভয় পেত। এই বাসাটা পাগলাপীরের বাসার পেছনে হয়েছে। দুই বাসার মাঝের বাউন্ডারি ওয়াল এত নিচু যে, দু'পাশে দুটো টুল রেখে দিলে সিঁড়ির মত পা ফেলে যাতায়াত করা যায়।

আজ পাগলা বাবার সাপ্তাহিক মিলাদ শেষ হবার পর ঝিনুদের বাসায় এসেছি নুহেল আর দীনুকে দেখতে। ওদের দুই ভাইয়ের শরীর খুব খারাপ। পূর্ণিমা-অমাবস্যার সময় হলেই ওদের চার ভাইয়ের কোমরে, পিঠে, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা বাড়ে। কিন্তু

এবারে নুহেল আর দীনুর শরীরটা বেশি কাবু হয়ে পড়েছে। নুহেলের পিটুনিটা বেশির ভাগ পিঠে, কোমরে আর মাথায় পড়েছে।

দু'তিনটে ইলেকট্রিক তার একত্রে পাকানো, মাঝে-মাঝে একটা করে গিঁঠ—এই রকম তারের দড়ি দিয়ে বেশির ভাগ সময় নুহেলকে মেরেছে। মেরুদণ্ডের হাড় নড়েচড়ে তো গেছেই, সারা পিঠ ফালা-ফালা, মাথার বিভিন্ন জায়গায় কাটা। দীনুর অবস্থাও সমান খারাপ। তার বাঁ কানের পর্দা ফেটে গেছে এক ক্যাপ্টেনের প্রচণ্ড চড়ে, ডান হাতের কবজির একটু ওপরে হাড় ফেটে গেছে লাঠির বাড়িতে—কপাল ভালো একেবারে ভেঙে দু'টুকরো হয় নি। নূরজাহানের বোনের স্বামী ডাঃ আশেকুর রহমান মিটফোর্ডে আছেন—দীনু তাঁর কাছ থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছে মিটফোর্ড গিয়ে—কানের এবং হাতের। ডাঃ আশেকুর রহমান বলেছিলেন হাতটা প্লাস্টার করলে ভালো হয়। তাড়াতাড়ি সারবে। কিন্তু দীনু ভয়ে হাত প্লাস্টার করতে পারে নি। যদি রাস্তায় মিলিটারি দেখলে 'মুকুত' বলে ধরে। একেইতো তার চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল বলে এম.পি.এ হোস্টেলে খানসেনারা তাকে 'ইয়ে শালা মুকত হ্যায়' বলে বেশি পিটুনি দিয়েছে। হাত প্লাস্টার না করার ফলে সারতে দেরি হচ্ছে। বাঁ কানটাও খুব কষ্ট দিচ্ছে। এর ওপর সব ভাইয়েরই হাতের আঙুলের গিঁঠ মচকানো, কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা—এসব তো আছেই।

জামী বলল, 'মামা, আমারো কোমরে মাঝে-মাঝে বেশ ব্যথা করে, আব্বুরও। তবুও তো আমাদের কাউকে হুকের সঙ্গে ঝোলায় নি, মাথা নিচে দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঘোরায় নি, তাইতেই এই অবস্থা! স্বপন ভাই, উলফাত ভাইয়ের আব্বাদের যে কি খারাপ অবস্থা। ওঁরা তো এখনো নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না, ধ'রে নিতে হয়। তবুতো ওঁদের ছেলেরা বেঁচে গেছে, সেইটাই ওঁদের মস্ত সান্ত্বনা।'

জামীকে এভাবে কথা বলতে শুনে আমি ভেতরে ভেতরে চমকে গেলাম। রুমীর গ্রেপ্তার ওকেও কতোখানি কাবু করেছে, বুঝতে পারলাম। ছোটবেলায় দুই ভাই খুব মারামারি করত, কিন্তু একটু বড় হতেই রুমী ওর কাছে 'হিরো' হয়ে উঠেছিল।

একটু পরে জামী আবার বলল, 'স্বপন ভাই কিভাবে পালিয়েছিল, তোমরা কেউ শুনেছ নাকি? মিলিটারি নাকি বাড়ির সামনের দিকটা ভরে ফেলেছিল, তারই মধ্যে স্বপনের মা ওকে ঠেলে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। ওদের বাড়িটা একতলা ছিল, আর পেছন দিকে কচু বন, ঝোপঝাড়, তারপর বস্তি এই সব ছিল। সামনের বারান্দার জানালা দিয়ে মিলিটারিরা নাকি দেখতে পেয়েছিল স্বপনের মা স্বপনকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। তাইতেই তো মিলিটারিরা আরো বেশি রেগে গিয়েছিল স্বপনের বাবার ওপর।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই কার কাছে শুনলি এত কথা?'

'আমার স্কুলের এক বন্ধু ওই পাড়ায় থাকে। স্বপন ভাইদের বাড়ির খুব কাছে। আজ দুপুরে যে মিষ্টি কিনতে গেছিলাম মরণচাঁদে, সেখানে ওর সঙ্গে দেখা। তখন বলল।'

আমি ৩০ আগস্ট ভোরে স্বপনের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারাটা মনে করে বললাম, 'ইস্, অতবড় বিপদ গেছিল রাতে, তাও সোনামানিক আমার সকাল বেলা ছুটে এসেছিল খবর দিতে। আমি যখন বললাম, 'রুমীরা ধরা পড়েছে, তুমি এক্ষুণি পালাও।' তখন কিন্তু একটা কথাও বেরোয় নি ওর মুখ দিয়ে। একেবারে নীরবে গাড়ি ঘুরিয়ে চ'লে গেল। বলতে পারল না যে ওর বাড়িতেও সর্বনাশ ঘটে গেছে। আহারে! যেখানেই থাকুক, আল্লা ওকে ভালো রাখুন।'

১১ অক্টোবর
সোমবার ১৯৭১

শরীফ বলল, 'সেই যে মাস খানেক আগে কাগজে পড়েছিলাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ুর রহমানের কথা, তার সম্বন্ধে আজ শুনে এলাম।'

'কি শুনে এলে? কোথায় শুনলে?'

'ডাঃ রাব্বির কাছে। রাব্বি—জানোতো, আমাদের সুজার ভাস্তে।'

শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সুজা সাহেব, তাঁর ভাস্তে ডাঃ ফজলে রাব্বি।

শরীফ বলল, 'আজ ফকিরের অফিসে গেছিলাম, ওখানে রাব্বির সঙ্গে দেখা। ওর মুখেই শুনলাম মতিয়ুর রহমানের ফ্যামিলি ২৯ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে ঢাকা এসেছে। মতিয়ুর রহমানের শ্বশুর গুলশানের এক বাড়িতে থাকেন। সেইখানে ৩০ তারিখে মতিয়ুরের চল্লিশা হয়েছে। রাব্বি গিয়েছিল চল্লিশায়। মিসেস মতিয়ুর নাকি বাংলা বিভাগের মনিরুজ্জামানের শালী।'

'আমাদের স্যার মনিরুজ্জামানের? তার মানে ডলির বোন? দাঁড়াও, দাঁড়াও—এই বোনকে তো দেখেছি ডলিদের বাসায়—মিলি এর নাম।'

ডলির কথা মনে প'ড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ডলি, মনিরুজ্জমান স্যার, ওদের কোন খোঁজই জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—কে জানে। ওপারেও যায় নি, গেলে বেতারে নিশ্চয় গলা শুনতে পেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারে বহু পরিচিতজনের গলা শুনি, তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু গলা শুনে চিনতে পারি। প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা-চেনা লেগেছিল, দু'একদিন পরেই চিনেছিলাম—সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরেজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হল আলী যাকের আর আলমগীর কবির। গায়কদের গলা তো সহজেই চেনা যায়-রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হরলাল রায়। কথিকায় সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান, ফয়েজ আহমদ প্রায় সকলেরই গলা শুনে বুঝতে পারি। নাটকে রাজু আহমেদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়—এদের সবার গলাই এক লহমায় বুঝে যাই।

১৪ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সারা শহরে হৈচৈ! গতকাল রাতে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা বনানীতে মোনেম খানের বাড়িতে ঢুকে তাকে গুলি করে পালিয়ে গেছে। ভোররাতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মোনেম খান মারা গেছে। খবর কাগজে ছবিসহ বেশ বিস্তারিতভাবেই তার হত্যাকাহিনী ছাপা হয়েছে। কাগজের অবশ্য 'দুষ্কৃতকারী' এবং 'আততায়ী' বলা হয়েছে। সন্ধ্যার পর মোনেম খান তার ড্রয়িংরুমে বসে মেহমানদের সঙ্গে কথা বলছিল। মেহমানরা ছিল প্রাক্তন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন, কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা আর মোনেম খানের জামাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। ড্রয়িংরুমের সদর দরজা খোলা ছিল, মোনেম খান দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল।

বাইরের বারান্দার বাতি নেভানো ছিল। এমনি অবস্থায় দরজার কাছ থেকে কে বা কারা মোনেম খানকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে, গুলি তার পেটে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোনেম খানের রক্তাক্ত দেহ সোফা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। গুলি ছুড়ে আততায়ী অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যায়। মোনেম খানকে হাসপাতালে নেওয়ার পর জানা যায় গুলি তার পেট-পিঠ ছেদা করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থা খুব গুরুতর। মাঝরাতে অপারেশনও করা হয় কিন্তু রুগীকে বাঁচানো যায় নি।

আজ ফখরুকে হাসপাতালে দেখতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাগজে মোনেম খানের ঘটনা পড়ার পর ভাবলাম আজ আর হাসপাতালের দিকে না যাওয়াই ভালো। নিশ্চয়ই মিলিটারিতে গিজগিজ করছে জায়গাটা। দাঁতের ডাক্তার ফখরুজ্জামানের কিডনিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে গত মাসে। সে আছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিউ কেবিনে। ফখরুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বিশ বছরের। আপন ছোট ভাইয়ের মত। মনটা খুব দমে গেছে খবরটা শুনে। ক্যান্সারের মত ভয়াবহ রোগের ছোবল!

ফখরু বিলেতে গিয়ে অপারেশন করাবে, স্থির করছে। তার যোগাড়যন্তর চলছে।

বেরোব বলে ঠিক করেছিলাম, তাই ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না। ভাবলাম নিউ মার্কেটে গিয়ে কিছু ওষুধপত্র কিনে, মিষ্টির দোকান থেকে আজ বিকেলে পাগলাপীরের মিলাদের মিষ্টি কিনে নিয়ে আসি এখনই।

যে দোকানেই যাই, সবখানে চাপা উল্লাস আর ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা। মোনেম খান মরেছে—এর চেয়ে সুখবর আর বুঝি কিছু হতে পারে না! বিচ্ছুরা কি রকম অনায়াসে বারান্দায় উঠে দরজার কাছ থেকে গুলি করে চলে গেল, ঘরভর্তি লোক কেউ কিছু করতে পারল না—এর চেয়ে সফল অ্যাকশান আর বুঝি কিছু হতে পারে না। মিষ্টির দোকানে গিয়ে আমি হতভম্ব। মিষ্টির দোকান সাফ! সকাল থেকে দলে দলে লোক এসে মিষ্টি কিনে নিয়ে গেছে। ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে প্রায় পাশাপাশি দুটো দোকান—মরণচাঁদ আর দেশপ্রিয়। দুটো দোকান থেকে কুচিয়ে-কাচিয়ে জিলিপি পেলাম সের দুয়েক আর রসগোল্লা-কালোজাম-চমচম সব মিলিয়ে সের দেড়েক! আর কিছু নেই দোকানে!

বাসায় ফিরে ভাবতে লাগলাম একটা অত্যাচারী লোকের ওপর কতখানি ঘৃণা থাকলে লোকে তার খুন হবার খবরে এরকম খুশিতে উল্লসিত হয়ে মিষ্টি কিনে দোকান সাফ করতে পারে! এই মোনেম খান—এই বাংলারই কুসন্তান মোনেম খান, আইয়ুব খানের আমলে গভর্নর হয়ে বাঙালিদের বুকের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল ছয়-সাত বছর ধরে। মানুষ সহ্য করতে করতে শেষে আর না পেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। প্রভু আইয়ুব খানের পতনের আগেই তার বশংবদ তাঁবেদার মোনেম খানের পতন হয়। তারপর কয়েক বছর মোনেম খান বাড়ির ভেতরেই দিন কাটিয়েছে। বাইরে আর বেরোয় নি। কিন্তু একাত্তরের মাঝামাঝি আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পাকিস্তানি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু একটা করার তোড়জোড় করছিল।

বিকেলে পাগলাপীরের আস্তানাতেও দেখলাম সমাগত লোকজনের মুখে চাপা উল্লাস। কে একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'পাগলা বাবার উচিত আজ মিলাদ শেষে ঐ বিচ্ছুগুলোর জন্য দোয়া করা।'

কিন্তু পাগলাপীরের মুখ আজ অসম্ভব গম্ভীর! মেজাজও বেজায় রুক্ষ! কিছুটা বিচলিত মনে হচ্ছে। কে জানে কি কারণে!

১৫ অক্টোবর
শুক্রবার ১৯৭১

গতকাল নিউ মার্কেটের ওষুধের দোকান থেকে যেসব ওষুধ কিনেছি, সেগুলো আজ প্যাকেট করতে বসেছি বেডরুমের দরজা বন্ধ করে। জামী তার দাদার কাছে বসে আছে। মা-লালু একটু বাইরে গেছেন। এখন বিভিন্ন বর্ডারে যুদ্ধ খুব জোরেশোরে হচ্ছে। ওষুধের খুব দরকার। ওষুধ কিনে ছোট ছোট প্যাকেট করে রাখি। সুযোগমত বিভিন্নজনের হাতে পাঠাই। শুধু ওষুধই নয়, টাকা, সিগারেট এসবও।

বেশির ভাগ কাটা-ছেঁড়ার ওষুধ কিনি—পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্ট, টেরামাইসিন অয়েন্টমেন্ট, সালফানিলামাইড পাউডার, জামবাক, ডেটল, টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেনজিন, তুলো, গজ। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক-টেরামাইসিন, পেনব্রিটন, ক্লোরোমাইসেটিন। কারো কারো টাইফয়েডও হয়ে যেতে পারে।

আমাশয়ের ওষুধেরও খুব চাহিদা। সেগুলোও কিনি—ফ্ল্যাজিল, নিভেম্বিন, অ্যাম্বিকুইন, এন্টারোভায়োফর্ম, নিয়োভায়াসেপ্ট।

জ্বর-মাথা ধরার জন্য নোভালজিন, ডিস্প্রিন। সর্দি-কাশিতে আরামের জন্য ভিক্স, ইউক্যালিপটাস তেল। মচকানো ব্যথার জন্য আয়োডেক্স। এছাড়া ছোট কাঁচি ও ব্লেড একটা করে দিয়ে দিই প্রতি প্যাকেটে। এমার্জেন্সির সময় নিজেরাই যেন ব্যান্ডেজ করে নিতে পারে।

১৭ অক্টোবর
রবিবার ১৯৭১

আজ ঝিনুদের বাসায় মিলাদ। নতুন বাসায় আসার মিলাদ। মিলাদ শেষে রাঙামা বললেন, 'মাগো, একটু বসে যাও। কথা আছে।'

ঝিনুর মাকে আমি রাঙামা বলে ডাকি। এই প্রৌঢ় বয়সেও এমন কাঁচা সোনার মত রং, এমন দেবী প্রতিমার মত রূপ, এমন মধুর স্নেহমাখা ব্যবহার—রাঙামা ছাড়া অন্য কোন ডাক মুখেই আসে না।

লোকজন একে একে চলে গেলে রাঙামা ভেতরের একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে একটা চৌকিতে দুটো ছেলে বসে ছিল। আমি ঢুকতেই একটি ছেলে উঠে এগিয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে উঠলাম, 'ইকু।'

মান্নানের বড় ভাই বাকি সাহেবের ছেলে ইকু—২৮ আগস্ট শাহাদত আলমের সঙ্গে মেলাঘর চলে গিয়েছিল।

'তুমি কবে এসেছ ইকু?'

'এসেছি এ মাসের প্রথমেই।'

ইকুর মুখে শুনলাম ষাটজন গেরিলার বিরাট একটা দলের সঙ্গে ও এসেছে। ক্যাপ্টেন হায়দার অনেক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই দলকে ঢাকায় পাঠিয়েছেন গেরিলা অপারেশান করার জন্য। ওরা গোপীবাগের পেছন দিক দিয়ে ঢাকায় ঢুকেছে। ঢাকার বাইরে ওইদিক বাইগ্‌দা বলে একটা গ্রামে ওদের বেস্ ক্যাম্প—সেখান থেকে অল্পে

অল্পে অল্পে অস্ত্রশস্ত্র ঢাকার ভেতর দিয়ে আসছে।

তাদের অস্ত্র আনার পদ্ধতি শুনলাম। ভোরবেলা গ্রাম থেকে লোকেরা ঝুড়িভর্তি শাকসবজি নিয়ে ঢাকায় আসে। তাদের সঙ্গে মিশে সবজিওয়ালা সেজে ঝুড়িতে সবজির তলায় ছোট অস্ত্র লুকিয়ে আনে। বড় অস্ত্রগুলো সাধারণত বস্তার ভেতরে অন্য জিনিসের সঙ্গে ভরে রাত্রিবেলা নিয়ে আসে।

২১ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সকাল সাড়ে সাতটার সময় তৈরি হয়ে ডাঃ খালেকের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট এসেছি। ফখরুজ্জামানের মেডিক্যাল বোর্ডের অর্ডার হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে হাতে হাতে বের করে না নিলে কতোদিন যে লাগবে, কে জানে। এদিকে ওর বিলেত যেতে যত দেরি হবে, ওর কিডনির ক্যান্সারও তত বেশি খারাপ হতে থাকবে।

অর্ডার টাইপ হয়ে সই হয়ে হাতে আসতে আসতে বারোটা বাজল। কাগজ নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এলাম। এখন এটাতে ডাঃ আলী আশরাফের সই লাগবে। তিনি অপারেশান থিয়েটারের ভেতর। ফখরুর বউ আঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারের সামনে যে ছোট্ট অ্যান্টিরুম আছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়ার্ড বয়ের হাতে করকরে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা অপারেশান শেষ করে মুখের মাস্ক খোলামাত্রই যেন ডাঃ আলী আশরাফকে সে বলে যে আমি খুব জরুরী ব্যাপারে তাঁর জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। অবশ্যই যেন দু'মিনিটের জন্য তিনি এ ঘরে আসেন। একটু দেরি হলেই কিন্তু আর ওঁকে পাওয়া যাবে না।

ডাঃ আলী আশরাফ খুব রাগী মানুষ। এভাবে অপারেশান থিয়েটার থেকে ডেকে আনার স্পর্ধা স্বরূপ ওয়ার্ড বয় তো বকা খাবেই, আমারও কপালে কি আছে, কে জানে। কিন্তু এদিকে আর তো সময় নেই। আজ ওঁর সই না হলে ফরেন এক্সচেঞ্জ যোগাড় করতে দেরি হয়ে যাবে। আগামীকাল, পরশু দু'দিনই এগারোটা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক, তার পরের দিন রোববার—ব্যাঙ্ক বন্ধ।

ডাঃ আলী আশরাফ গনগনে মেজাজ নিয়ে এলেন, প্রচণ্ড বকাবকি করলেন আমায়—তাঁকে এভাবে দুই অপারেশানের মাঝখানে ডেকে পাঠানোর জন্য। আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, 'এছাড়া আর উপায় ছিল না। একটা লোক মরতে বসেছে। দেরি করলে তার আর কোনো চান্স থাকবে না।'

বকাবকি করতে করতেই সইটা করে দিলেন ডাঃ আলী আশরাফ। সব ভুলে দাঁত বের করে হেসে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ফখরুজ্জামানের কেবিনে ঢুকে দেখি ডাঃ ফজলে রাব্বি তাকে দেখতে এসেছেন। শুনলাম ফখরুকে রাব্বি বলছেন, 'যান, ভালো হয়ে ফিরে আসুন। এসে দেখবেন আমরা হয়তো অনেকেই নেই।'

২২ অক্টোবর
শুক্রবার ১৯৭১

আজ থেকে রোজা শুরু হয়েছে। শরীফ, জামী, বুড়া মিয়া তিনজনেই রোজা। মা আর লালু গত পরশুদিন নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেছেন।

রুমীর এখনো কোন হদিস বের করা সম্ভব হয় নি। পাগলা বাবা ক্রমাগত আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা ক্রমাগত বাবাকে প্রতি বৃহস্পতিবার একটি করে পঞ্চাশ টাকার নোট, পাঁচ-সাত সের মিষ্টি, এক কার্টন ৫৫৫ সিগারেট (বাবা ৫৫৫ ছাড়া খান না) নজরানা দিয়ে যাচ্ছি। যখনই দরকার, তখনই ড্রাইভারসহ গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন আর ফজরের নামাজের আগে যাই না, কারণ তিন সপ্তাহ ঝাড়ার পরও যখন লালুর মাইগ্রেন সারার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও সৌজন্যবশতই নিঃশব্দে ভোরে যাওয়া বন্ধ করেছি। কিন্তু গতকাল বাবা আবার বললেন, কাল ভোরে আসিস। তাই আজ ভোরে গিয়েছিলাম। রোজার প্রথম দিন এত ভোরে কোথাও যাওয়া যে কি কষ্টকর। তবু গেলাম। গতকাল সাপ্তাহিক মিলাদের পর আমি বাবাকে চেপে ধরেছিলাম, খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। বাবা তাই বলেছিলেন, তিনি সারারাত হুজরাখানায় আল্লার কাছে এবাদত করবেন, সকালে যেন যাই। খুব একটা আশা নিয়ে সকালে গিয়েছিলাম, কোন সুখবর নিশ্চয় তিনি দেবেন। কিন্তু তিনি শুধু বললেন রোববার পর্যন্ত দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে। আটটায় বাড়ি ফিরে আবার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি—পাগলা বাবার দরকার।

কিচ্ছু ভালো লাগছে না, মাথা ধরে উঠছে। কষ্টে, হতাশায়, অক্ষম রাগে চোখ দিয়ে দরদর করে পানি বেরোচ্ছে, ঠেকাতে পারছি না। মাসুমা গতকাল একটা কাজের ছেলে এনে দিয়েছে—ওসমান। তাকেও কিছু কাজ দেখিয়ে দেওয়া উচিত, তাও পারছি না।

এইরকম পাগল অবস্থা থেকে রেহাই দিল মোতাহার, রেজিয়া আর মিনি। মোতাহারুল হক, শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু, রেজিয়া তার বউ, মিনি তার বড় ভাইয়ের মেয়ে।

রেজিয়া অর্থাৎ বাচ্চু আমার খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওরও শুধু ছেলে—আমার মত, কোন মেয়ে নেই। তাই বোধ হয় মিনিকে প্রায় প্রায়ই ওদের সঙ্গে দেখা যায়। মিনি খুব চমৎকার মেয়ে, হাসিখুশি, মিশুক, ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় ভারি সুন্দর। অন্য সময় মিনিকে গান গাইতে বললে বাহানা করে, গা-মোড়ামুড়ি দেয়, আজ বলা মাত্র ও গাইতে শুরু করল। আমার কান্নায় ফোলা লাল চোখের দিকে চেয়ে ও গাইল :

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।

জ্বলতে দে তোর আগুনটারে
ভয় কিছু না করিস তারে।
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে ॥

এড়িয়ে তারে পালাস নারে
ধরা দিতে হোস্‌না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে।
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে ॥

মিনিরা থাকে রোকনপুরে—ওদের পৈতৃক বাড়িতে। মোতাহাররাও গুলশানের বাড়ি ছেড়ে রোকনপুরের বাড়িতে চলে গেছে। বাচ্চুর বাপের বাড়িও শ্বশুরবাড়ির দুটো বাড়ির পরেই। মার্চে ক্র্যাকডাউনের পর থেকেই আমাদের সকলের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে আত্মীয়স্বজন মিলে কাছাকাছি একত্রে থাকার। সামরিক জান্তার প্রতিকারহীন নির্যাতনের মুখে অরক্ষিত অসহায় বাঙালি পরিবারগুলো কাছাকাছি থেকে এভাবেই বোধ করি শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করে।

আমার মানসিক অবস্থা দেখেই কি না জানি না, ওরা বহুক্ষণ রইল আমার সঙ্গে। মিনির কাছ থেকে জানতে পারলাম ঢাকার কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার কার্যকলাপ।

বাচ্চুর বড় বোনের ছেলে জন, বাচ্চুর বড় ছেলে দোলনের বন্ধুর ছোট ভাই আরিফ, তাদের বন্ধু ফেরদৌস—এরা সব স্কুলের ছাত্র, কিন্তু সবাই দুর্ধর্ষ বিচ্ছু। জন থাকে নারিন্দায়, ফেরদৌস মগবাজারে, আরিফ ধানমণ্ডিতে কিন্তু এরা সবাই মিনিদের বাড়িতে আসে, খায়, প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে। এদের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে আসে-গান গায় যে মাহবুব, যাকে ওরা এল.পি. মাহবুব বলে ডাকে, সে আসে, সোহেল আসে, ফিরোজ আসে। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, রাইসুল ইসলাম আসাদ, মানিক এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা। ওরা বিরাট এক দল সাভারের কাছে কোন এক গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে, গ্রামের নাম মিনি জানে না, কিন্তু ওখান থেকে ঢাকা শহরে অস্ত্র আনতে মিনি আর ডালিয়া সালাহউদ্দিনের খালা শাহানা সাহায্য করে। আরিফ গাড়িতে করে মিনি আর শাহানাকে সাভারের কাছাকাছি এক নদীর ধার পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেখানে গাড়িতে অস্ত্র ওঠানো হয়। গাড়িতে মহিলা থাকলে সাধারণত মিলিটারিরা চেকপোস্টে গাড়ি সার্চ করে না, কখনো-সখনো শুধু থামিয়ে দু'একটা কথা জিগ্যেস করে ছেড়ে দেয়। সেই জন্যেই মিনি আর শাহানা গাড়িতে বসে থাকে।

বুঝলাম, মিনি যে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কথা বলছে, সে-ই হচ্ছে মঞ্জুরের ভাগনে বাচ্চু—যার কথা শরীফ আমাকে আগেই বলেছে। আমি মিনির কাছে ভাঙলাম না যে আমি ওদের কথা আগেই জেনেছি। আমি শুধু মিনির কথা শুনে যাচ্ছি, যত শুনছি, তত আমার বুকের ওপর থেকে চাপ চাপ ভার হালকা হয়ে যাচ্ছে, আমার মনের ভেতর থেকে কষ্ট, হতাশা আর রাগ উবে যাচ্ছে। ২৯-৩০ আগস্টের গ্রেপ্তারের পর মাত্র কয়েকটা দিন ঢাকা শহর নিথর ছিল। তারপরই আবার বিচ্ছুরা কিল্‌বিল্‌ করতে শুরু করেছে। আবার দলে দলে গেরিলারা ঢাকায় ঢুকছে বিভিন্ন দিক দিয়ে, ইউসুফ বাচ্চুরা সাভারের দিকে দিয়ে, ইকুরা গোপীবাগের দিক দিয়ে। আরো কতো কতো দল কতো দিক দিয়ে ঢাকায় ঢুকছে, তার সব খবর কি আমি জানি।

এই যে গত পরশু বুধবার দুপুর একটা সময় স্টেট ব্যাঙ্কের ছয়তলায় একটা বাথরুমে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে দু'জন পাকিস্তানি কম্যান্ডো মরেছে, যে বিচ্ছুরা এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তাদের নাম আমি জানি না। তার আগের দিন মঙ্গলবার সকালের দিকে মতিঝিলে ই.পি.আই.ডি.সি, হাবীব ব্যাঙ্ক আর প্রুডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলোর সামনের রাস্তায় বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ওখানে পার্ক করা ছয়টা গাড়ি নষ্ট হয়েছে, বিল্ডিং তিনটের সামনের দিকের সব জানালার কাচ ভেঙেছে। যে ছেলেরা দিনে-দুপুরে এই অসম সাহসিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তাদের নামও আমি জানি না। তারও দু'দিন আগে ১৮ তারিখে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। কে করেছে, জানি না।

কিন্তু নাম না জানলেও এটা বুঝতে পারছি তারা মুক্তিবাহিনীর গেরিলা, তারা আমাদেরই প্রত্যেকটি বাঙালি ঘরের দামাল ছেলে। সেই যে রুমী একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিল :

পারলে নীলিমা চিরে বের
করতো তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।
তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছো হাত ধ'রে পরস্পর।
সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া
তুমিতো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

'গেরিলা' নামের এই কবিতাটির কথা এখন আমার মনে পড়ল।

মিনির মুখে এই দামাল ছেলেদের আরো একটা কীর্তির কথা শুনলাম : 'জানেন চাচী, এবার ১৪ আগস্ট কি হয়েছিল? বেলুনে গ্যাস ভরে বেলুনের সাথে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আর নৌকো বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। জনের বড় দুলাভাইয়ের বেলুনের ফ্যাক্টরি আছে, সেইখান থেকে অনেক বেলুন এনে বাসার মধ্যে লুকিয়ে গ্যাস ভরা হয়েছিল। কায়েদে আজম কলেজের কয়েকটা ছেলে গ্যাস নিয়ে এসেছিল। আমরা সব কাগজ দিয়ে ছোট ছোট ফ্ল্যাগ আর নৌকো বানিয়েছিলাম। ভোর রাতের দিকে আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে ওগুলো ওড়ানো হয়। নৌকো বাঁধা একটা বেলুনের সুতো নবাবপুরের একটা ইলেকট্রিক তারে আটকে গিয়ে ঝুলছিল। তাই নিয়ে সেখানে কি হৈচৈ! রাজাকাররা সেইখানে আর কাউকে দাঁড়াতে দেয় না। মোহন চাচা নবাবপুরে বাজার করতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে বাজার-টাজার ভুলে বাড়ি চলে আসেন। এই নিয়ে সেদিন সারা পাড়াতেই টেনসান! কি জানি, যদি পাড়া সার্চ করতে আসে মিলিটারি?'

'এসেছিল?'

মিনি ঝরঝর করে হেসে বলল, 'নাঃ, আসে নি।'

২৩ অক্টোবর
শনিবার ১৯৭১

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন নিয়ে ক'দিন খবর কাগজের পৃষ্ঠা সরগরম। কতগুলো আসনে কতজন প্রার্থী মনোনয়পত্র দাখিল করছে, তা বেশ ফলাও করে রোজ ছাপা হচ্ছে। কেউ কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে।

ফকির বললেন, 'এরা তো নির্বাচিত হয়ে গেল, বাকিরাও হয়তো হবে। এরা কি কখনো ভেবে দেখেছে—এরপর এদের অদৃষ্টে কি আছে?' শরীফ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কি আছে?'

'কাফনের কাপড়, লোবান আর পঞ্চাশ টাকার একটা নোট।'

আমি বললাম, 'পঞ্চাশ টাকার তো নয়, দশ টাকার নোট।'

'ওটা তো গ্রামের শান্তি কমিটির মেম্বারদের জন্য। হাজার হলেও এরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, এদের বেলায় দশ টাকা একটু কম হয়ে যায় না? মর্যাদাহানিকরও বটে।'

আজকাল শুনতে পাই মুক্তিযোদ্ধারা নাকি খুব বেশি খারাপ। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বারদের একটা কাফনের কাপড়, এক প্যাকেট লোবান আর দশটা টাকাসহ একটা চিঠি পাঠিয়ে দেয়—'যা খাবার ইচ্ছে হয়, ঐ দশ টাকায় খেয়ে নাও, তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে।'

আমি বললাম, 'এতগুলো বাঙালি মনোনয়নপত্র দাখিল করবে, আমি কিন্তু আশা করি নি।

ফকির বললেন, 'কেন আশা করেন নি ভাবী? সব বাঙালিই যে দেশপ্রেমিক নয়, সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই। নইলে রুমীর বন্ধু বদি যে সন্ধ্যার আগে দুপুরবেলা ধরা প'ড়েছিল, সে তো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি থেকে ধরা প'ড়েছিল। বন্ধুটি যে পাকিস্তানের দালাল ছিল, তাতে তো আর কোন সন্দেহ নেই। বদি দুপুরবেলা আরেক বাঙালি বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ল বলেই না পরবর্তীকালে এতবড় সর্বনাশ হল। তেমনি অনেক অযোগ্য-অকর্মা বাঙালি, যারা এতদিন কিছুই করতে পারে নি, তারা এই সুযোগে এসেম্বলি মেম্বার হতে পারছে।'

শরীফ বলল, 'তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতসব ক্যান্ডিডেট নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে দেখে একটা সন্দেহও হচ্ছে। বেশির ভাগ জায়গাতেই বেয়নেটের গুঁতোর ভয় দেখিয়ে ক্যান্ডিডেট খাড়া করা হয়েছে, একটার বেশি পাওয়া যায় নি। তাই কনটেস্টও হয় নি। ক্লাসে একটাই মাত্র ছাত্র, কাজেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

'কেন, বহু জায়গায় তো একের বেশিও মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে।'

'মনে হয়, ওগুলো সব লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য বানানো খবর। আসলে একটাই যোগাড় হয়েছে অতি কষ্টে।'

২৬ অক্টোবর
মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ সকালে হঠাৎ চৈতন্য এসে হাজির। চৈতন্য আমাদের অনেকদিনের পুরনো কাঠমিস্ত্রি। খুব সৎ আর পরিশ্রমী। তাই বন্ধুবান্ধব কারো কাঠমিস্ত্রির দরকার হলে আমরা বিনা দ্বিধায় চৈতন্যকে পাঠিয়ে দিই। বেশি সৎ আর সরল বলে চৈতন্য জীবনে তেমন উন্নতি করতে পারল না, মাঝে-মাঝেই অভাব বেশি হলে আমাদের কাছে এসে বলে কোথাও কাজে লাগিয়ে দেন।

এখন ওকে দেখে আমরা হৈহৈ করে উঠলাম, 'কি চৈতন্য? কেমন ছিলে এতদিন? কোথায় ছিলে? ইন্ডিয়া যাও নি?'

চৈতন্যরা সাতপুরুষের ভিটে ফেলে ইন্ডিয়ায় যেতে পারে নি। তাছাড়া বাড্ডার ওদিকে ওদের গ্রামে ঠিক সরাসরি মিলিটারির হামলাও হয় নি। কোনমতে লুকিয়ে-চুরিয়ে থেকেছে, প্রাণে বেঁচেছে। তবে কাজ-কারবার নেই বললেই চলে। প্রথম

কিছুদিন বসে খেয়ে কোনমতে কাটিয়েছে। এখন দুই বেলা উপোষ দেবার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাই সাহসে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি বললাম, 'খুব ভালো সময়েই এসে পড়েছ। এই বাড়িতেই বেশকিছু কাজ জমে রয়েছে তোমার জন্য।'

মাঝে-মাঝেই একবার করে গুজব ওঠে মিরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে বিহারিরা এদিকপানে আসছে সব লুটপাট করতে। তখন পাড়ায় হৈচৈ পড়ে যায়, সবাই নিজের নিজের বাড়ির দরজা-জানালার হুড়কো-ছিটকিনি ঠিক আছে কি না দেখতে থাকে। আমরাও অনেকদিন থেকে ভাবছি—আমাদের সামনের দিকের দরজা দুটোর পাল্লা বদলানো দরকার। পাল্লাগুলো এমন হালকা যে ভয় হয় এক লাথিতেই ভেঙে যাবে। তাছাড়া ডাইনিং রুম আর সিঁড়ির পাশের জানালা দুটোর কাচ বদলে কাঠ লাগিয়ে দেবার কথাও ভাবছি কিছুদিন থেকে। কাচের জানালা বন্ধ করলেও যেন নিরাপদ মনে হয় না। চৈতন্যদের খোঁজ পাচ্ছিলাম না, নিউ মার্কেট থেকে অচেনা কাঠমিস্ত্রি ডেকে কাজ করানোতেও খুব সায় ছিল না। চৈতন্য নিজে থেকে এসে পড়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

চৈতন্য ওর ভাস্তে নিরঞ্জনকে সঙ্গে এনেছে। এর আগে সবসময় চৈতন্যই দরকার মত কাঠ কিনে এনেছে। এবার বলল, 'আমার দুকানে যাইতে ডর লাগে। কাঠটা যদি সায়েবে কিন্যা আনেন।'

চৈতন্যরা যেখানে কাজ করে, সেখানেই থাকে। আগে বাড়ির উত্তরদিকে খালি গ্যারেজটায় থাকত। গেটটা এই গ্যারেজ বরাবর। গলিরাস্তা থেকে দেখা যায়। এবার ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম দক্ষিণ দিকের সারভেন্টস্ কোয়ার্টারের একটা ঘরে। বুড়া মিয়া একটা ঘরে থাকে, পাশের ঘরটা খালি।

চৈতন্যরা সারাদিন কাজ করে, দুপুরবেলা চিনি দিয়ে পাউরুটি খায়, সন্ধ্যায় বাজার করে রান্না করে। এবার চৈতন্য বলল, তাদের বাজারটাও যদি বুড়া মিয়া করে দেয়। তারা বাজারে যেতেও ভয় পায়।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তোমাদের নিজেদের রান্না করা লাগবে না। আমাদের সঙ্গেই খাবে তোমরা। কি, আমাদের হাতের রান্না খেলে জাত যাবে না তো আবার?'

চৈতন্য লজ্জা পেয়ে হাসল, 'কি যে বলেন আম্মা। এখন বলে পেরান লয়া টানাটানি—'

বাড়ির ভেতরের উঠানে ওরা কাজ করে, দুপুরে-রাতে মাছ-তরকারি-ভাত ওদের ঘরে দিয়ে আসে বুড়া মিয়া। ওরা একদমই বাইরে বেরোয় না।

২৮ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

নিরঞ্জনের একটা পা খোঁড়া। কিন্তু মুখে কথার খৈ। চৈতন্য কথা বলে কম, হাসে আরো কম, হাঁটে ধীরে। নিরঞ্জন ঠিক উল্টো। খোঁড়া পা নিয়েই তুরতুর করে চলে, অনর্গল কথা বলে, যখন-তখন হাসে।

আমি প্রায় প্রায়ই ওদের কাজ দেখার জন্য মোড়া নিয়ে বসি উঠানের একপাশে, নিরঞ্জন তার কাকার সঙ্গে হাত চালায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখও চলতে থাকে। গুলশান, বনানী, বাড্ডা অঞ্চলের সব খবর তার নখদর্পণে।

আজ বলল, 'দিদিমা, শোনছেন নি, মুনেম খাঁর লাশ নাকি কবর থনে উঠায়া ফেলছে?'

আমি চমকে গেলাম! সে কি কথা? শুনি নি তো? কারা করল? কেন?

বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব নিয়ে নিরঞ্জন বলল, 'মুক্তিরা ওঠাইছে। অর মত বেইমানের লাশ নাকি এই দ্যাশে থাকতে দিব না।'

চৈতন্য ধমক দিল, 'কি আজাইরা কথা কস্ নিরঞ্জন! এত কথা কস ক্যান?'

আমি বললাম, 'আহা, বলতে দাও, আমি শুনতে চাই। চৈতন্য, আমার কাছে কোন কথা বলাতে তোমাদের ভয় নেই। আমার ছেলেওতো 'মুক্তি' ছিল। নিরঞ্জন, তুমি মুক্তিদের কথা এত জান কি করে?'

নিরঞ্জন উৎসাহ পেয়ে বলল, 'বারে জানমু না? আমাদের উইদিগে কি কম মুক্তি আছে? হেরা অ্যাকশুন করে, হ্যাগোর হাতে ইশটিনও আমি দেখছি না?'

চৈতন্য নিরুপায়ের মত বলল, 'এই ছ্যারা ডুবাইবো আমারে। এত কথা কয়।'

'তোমার কোন ভয় নেই চৈতন্য। আমার কাছে বললে কোন ক্ষতি নেই। ওতো বাইরে কোথাও যায় না। হ্যাঁ নিরঞ্জন। তোমাদের গ্রামের মুক্তিদের কথা বল।'

'আমাগোর গেরামে তো মুক্তি নাই। তবে আশেপাশের গেরামে আছে। আমরা শুনি তাগোর কথা। অনেক পোলা আগরতলা থন টেরনিং লয়া আইছে। আমাগোর উইদিকের এক পেলাই তো মুনেম খাঁরে মারছে। আমি সব জানি।'

আমি ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'বল কি? তোমাদের ওদিককার ছেলে? তুমি ঠিক জান যারা মেরেছে, তারা মুক্তিবাহিনীর ছেলে?'

'হ, তারা আগরতলা থন টেরনিং লয়া আসছে। তাগোর হাতে ইশ্‌টিন আছে, তাগো কাছে গিরনেড আছে। একদম আনারসের লাহান দেখতে।'

'তুমি দেখেছ?'

'আমি নিজের চক্‌খে দেখি নাই। তবে শুনছি।'

'আচ্ছা নিরঞ্জন, তুমি মেলাঘর বলে কোন জায়গার নাম শুনেছ? ঐ আগরতলার কাছে?'

'শুনছি মনে লয়। মেলাঘর, আগরতলা, হ,—ঐ পোলারা মেলাঘরের পোলাই বটে।'

'বল দেখি, কিভাবে মোনেম খাঁকে মেরেছে? কি বৃত্তান্ত শুনেছ?'

'অগোর মইধ্যে এক পোলা মুনেম খাঁরে মাইরা আসার পর কথাডা চাউর হয়া যায়। গেরামে কোন কথা তো গোপন থাকে না। ঐ পোলা অনেকদিন থেইকাই চেষ্টা করতাছিল—অয় নাকি মেলাঘর থেইকাই মুনেম খাঁরে মারনের অর্ডার লয়া আইছিল। মুনেম খাঁর বাড়ির গরুর রাখাল অরে সাহায্য করছে। মুনেম খাঁর মেলাই গরু আছিল তো—তার যে রাখাল, হেই রাখাল মুনেম খাঁর উপর সন্তুষ্ট আছিল না। হেরে নাকি বেতন দিত না, বেতন চাইলেই পুলিশের ডর দেখাইত। মুনেম খাঁ লোক খুব খারাপ আছিল তো। অই রাখালের লগে কি কইরা যেন এই পোলা ভাব কইরা ফালায়। সইন্দা বেলায় রাখাল যখন গরুর পাল লয়া বাড়ির ভিতর ঢুকত, সেই সময় তার লগে ঐ মুক্তিপোলা বাড়ির ভিতর ঢুকে। তাছাড়া তো ঢুকন, একদম অসাদ্য। সামনের গেটে বন্দুক হাতে পাহারা, ভিতরে পিস্তল হাতে মুনেম খাঁর 'বোটিগাড।' ঐ পোলা একদিনে পারে নাই, দুই দিন সন্দ্যায় ঢুকছে কিন্তু সুবিধা করতে পারে নাই, মুনেম খাঁ দু'তলায় ছিল, শ্যাষে পিছনের পাচীর টপকায়া পলায় গেছে। তিন দিনের দিন মুনেম খাঁ একতলায় বসার ঘরে বইসা বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইতেছিল, হেই সময় তারে

মারছে ইশ্‌টিন দিয়া। তারপর পিছনের পাচীর টপকায়া পলাইছে। মুনেম খাঁর সেই রাখালও পলাইছে।'

নিরঞ্জনের কথায় আমি চমৎকৃত হলাম, এই সব অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত গ্রামের ছেলেদের আমরা কতই না অবহেলার চোখে দেখি, অথচ এদের বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, খবর সংগ্রহের তৎপরতায় এরা রয়টারের সংবাদদাতাকেও হার মানায়!

'তুমি ওই মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছ?'

'দেখছি, মুনেম খাঁ মরণের পরদিন তো অরে দেখতে আশেপাশের গ্রামের অনেকেই যাইতেছিল। আমিও গেছিলাম। দূর থনে দেখছি। অত লোক জানাজানি হইতে অর বাপে কাকায় অরে কই জানি পাঠায়া দিছে।'

'নাম জান ছেলেটার?'

নিরঞ্জন লজ্জিত হাসল, 'শুনছিলাম তো। ভুইলা গেছি। কেমন জানি খটোমটো নাম, জিব্বার আগায় আইতে চায় না।'

আজ শরীফ দুপুরে ফিরল অন্যদিনের চেয়ে অনেক দেরি করে। প্রায় আড়াইটায়। দেখি মুখ লাল, চোখে উত্তেজনা। ঘরে ঢুকেই বলল, 'জবর খবর! ডি.আই.টি. বিল্ডিংয়ে বোম ব্লাস্ট করেছে।'

'তাই নাকি? কখন?'

'এই তো সোয়া একটার সময়। আমাদের অফিসের কাছেই তো। একটুখানি খবরাখবর যোগাড় করে আসতে দেরি হল।'

'কি সর্বনাশ। ব্লাস্ট শুনেই তো ভেগে চলে আসা উচিত ছিল।'

শরীফ হাসতে লাগল, 'ব্লাস্ট শুনে রাস্তায় নামলে আর দেখতে হত না। মিলিটারিতে ক্যাঁক করে ধ'রে নিত। অফিসের ভেতর বসে থাকাই তো নিরাপদ। ফোনে খবরটবর নিলাম। তারপর রাস্তাঘাট একটু ক্লিয়ার দেখে তবে বেরোলাম।'

'কি রকম ভেঙেছে? কোন কোন তলা?'

'সাততলায়। টাওয়ারের একদিকে মস্ত একটা গর্ত হয়ে গেছে। আমাদের অফিসের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—সেই ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। আর ভেতরে আগুন জ্বলছিল।'

আমি তাজ্জব। কি সাংঘাতিক কাণ্ড। একতলা নয়, দোতলা নয়, একেবারে সাততলায়? এখন তো শুনেছি, প্রতি তলাতেই সিঁড়ির মুখে আলাদা আলাদা চেকপোস্ট। নিচতলায় বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখে গেটে চেকপোস্ট, বিল্ডিংয়ে উঠতে চেকপোস্ট, তারপরও প্রতি তলায়। এতগুলো চেকপোস্টে এতগুলো মিলিটারির চোখে ধুলো দিয়ে উঠলো কি করে? আর এতবড় বিস্ফোরণ ঘটাবার মত এত বিস্ফোরকই বা ভেতরে নিল কি করে? সত্যি, বিচ্ছুরা দেখাচ্ছে বটে! আমি বললাম, 'আমারো কিছু জবরখবর আছে।'

'বলো। তার বদলা আমিও আরো দুটো খবর বলতে পারব।'

আমি শরীফকে নিরঞ্জনের খবর বললাম। শরীফ বলল, গতকাল ভোর রাতে মতিঝিল গার্লস হাই স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের বাসায় বোমা ছুড়েছে মুক্তিরা। তাতে বিল্ডিংয়ের বেশ ক্ষতি হয়েছে, তিনজন জখমও হয়েছে। আর গতকাল সন্ধ্যা রাতে বিচ্ছুরা খিলগাঁওয়ে একটা জায়গায় রেললাইনের খানিকটা অংশ ধসিয়ে দিয়েছে বোমা মেরে।

খবর শুনে আমি একটু হেসে বললাম, 'রোজই এই রেটে নতুন নতুন খবর শুনতে পেলে বেশ হয়!'

শরীফও হাসল, 'আশা করি পেতে থাকব।'

৩০ অক্টোবর
শনিবার ১৯৭১

আজ থেকে ঠিক একষট্টি দিন আগে, রাত বারোটার সময়, পাক আর্মি আমার রুমীকে ধরে নিয়ে গেছে।

সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। তারই পরোক্ষ ঝাপটা গতকাল থেকে ঢাকাতেও একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে। হিমেল বাতাস দিচ্ছে। সবাই হালকা গরম কাপড় নামিয়ে ফেলেছে।

আজ শরীফের জন্মদিন। গতকাল বায়তুল মোকাররমের ফুটপাতের দোকান থেকে সুন্দর চিকনের কাজ করা সাদা একটা টুপি কিনেছি। আর কিনেছি স্পেশাল একটা তসবি—অন্ধকারে এটা থেকে একটা আলোর আভা দেখা যায়। এ দুটো দিলাম আজ সকালে—জন্মদিনের উপহার! বাগানে একটাও ফুল নেই কোন গাছে।

জামী একটু হেসে বলল, 'তোমার জন্মদিনে বিচ্ছু অ্যাকশানের একটা খবর তোমাকে উপহার দিচ্ছি।' তারপর খবর পড়ার ভঙ্গিতে বলল, 'গতকাল সন্ধ্যায় মর্নিং নিউজ অফিসের গেটে এক মুক্তিযোদ্ধা একটি গ্রেনেড ছুড়েছে। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত না হলেও এলাকায় যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।'

৩১ অক্টোবর
রবিবার ১৯৭১

আজ ফখরুজ্জামান বিলেত রওনা হবে। প্লেন দুপুরের পরে। সকাল নয়টায় আঞ্জুকে পরীবাগের শাহ সাহেবের কাছে নিয়ে গেছি ফখরুর জন্য দোয়া চাইতে। তারপর আবার সাড়ে দশটায় মা ও লালুকে নিয়ে গেছি গুলশানে, ফখরুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আঞ্জুও যাচ্ছে ফখরুর সঙ্গে। ছেলেমেয়েরা দেশেই থাকবে ওর মা'র কাছে।

দুপুরে শরীফ বাসায় ফিরল মুখ কালো করে, 'শুনছো, খুব খারাপ খবর। খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে মারা গেছে।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল, 'কি সর্বনাশ! কার কাছে শুনলে?'

'বাঁকার কাছে। বাঁকা খুব ভেঙে পড়েছে।'

আমাদেরও ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। একি নিদারুণ সংবাদ! একি সর্বনাশ হল! খালেদ মোশাররফ নেই? যুদ্ধে মারা গেছে?

রুমীদের গ্রেপ্তারের ধাক্কা একটু একটু করে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, ঢাকার বুকে গেরিলাদের বিভিন্ন অ্যাকশান মনের মধ্যে একটু একটু করে আশার সঞ্চার করছে—এর মধ্যে আবার একি বিনামেঘে বজ্রপাত!

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দোতলায় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম খালেদেরই কথা।

এই খালেদ—ক্র্যাকডাউনের সময়ই তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে তার পাঞ্জাবি বস্ তাকে কুমিল্লা থেকে সিলেটে পাঠিয়েছিল, কিন্তু আয়ু ছিল খালেদের, দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি খাটিয়ে সে নিশ্চিত মৃত্যুর ছোবল এড়ায় সে-যাত্রা। এড়িয়ে, সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, পেছনে ঢাকায় প'ড়ে থাকে তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী, ফুলের মতো

ফুটফুটে দু'টি মেয়ে। সে জানতও না, ২৫ মার্চের কালরাত্রে পাক বর্বরবাহিনী তার শ্বশুরবাড়ি তছনছ করে দিয়েছিল; শ্বশুর, শাশুড়ি, বড় শালী, ভায়রাভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে জানত না, তার স্ত্রী ও কন্যারা পাক হানাদারের হাত এড়াতে একেকদিন একেকজনের বাড়িতে লুকিয়ে থাকছিল। কিংবা সত্যি কি সে জানত না? সে নিশ্চয় জানত এরকমটাই ঘটবে তার পরিবার-পরিজনদের জীবনে। তা জেনেই সে তাদেরকে পেছনে ফেলে সামনের পথ ধরে চলে গিয়েছিল অনিশ্চয়ের দিকে। সর্বনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে সে পালিয়ে আসা বিদ্রোহী বাঙালি সামরিক বাহিনীর অফিসার জওয়ান আর যুদ্ধকামী শত শত যুবক-কিশোরদের জড়ো করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার দুরূহ কাজে মগ্ন হয়েছিল।

ঢাকা থেকে তার ফ্যামিলির খবর প্রথম সে পায় তার বন্ধুর ছোট ভাই শহীদুল্লাহ খান বাদলের মারফত। বাদল এবং তার তিন বন্ধু আসফাকুস সামাদ (অ্যাসফী), মাসুদ ও বদি ২৭ মার্চেই ঢাকা ছাড়ে, তাদের বিশ্বাস হয় পাক আর্মির এতবড় ক্র্যাকডাউনের পর নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। তারাও যোগ দিতে চায় সেই প্রতিরোধ সংগ্রামে। তারা 'যুদ্ধের' খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। তারা তখনও জানত না খালেদ মোশাররফ কোথায় আছে। কিন্তু পথে নানাজনের সঙ্গে দেখা হতে হতে এবং নানা ঘটনা ঘটতে ঘটতে শেষমেষ খালেদ মোশাররফের সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ ঘটে যায়।

খালেদ বাদলকে বলে 'এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। এর জন্য দরকার রেগুলার আর্মির পাশাপাশি গেরিলা বাহিনী। তুমি ঢাকায় ফিরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। যারা আসতে চায়, মুক্তিযুদ্ধ করতে চায়, তাদের এখানে পাঠাতে থাক।'

খালেদ আরো বলে, 'যুদ্ধ হবে তিন ফ্রন্টে—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক। সামরিক ফ্রন্টের জন্য রয়েছে নিয়মিত সেনাবাহিনী, অন্য দু'টি ফ্রন্টের জন্য প্রয়োজন সারাদেশের তরুণ সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, সাংবাদিক—সকল স্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষ। তাদেরকেও এখানে নিয়ে আসতে হবে।' এই দিকটা পুরোপুরি সংগঠনের ভার খালেদ মোশাররফ বাদলের ওপরই দেয়। এস.এস.সি ও এইচ.এস.সিতে ফার্স্ট হওয়া অসাধারণ মেধাবী ছেলে বাদল নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ একপাশে ঠেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিশ্চিত মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন কাজে।

খালেদ মোশাররফের পরামর্শ এবং প্রেরণাতেই বাদল বারে বারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা এসেছে। বন্ধু অ্যাসফী সামাদের সহায়তায় সংগঠিত করেছে ঢাকার তরুণদের—যারা 'যুদ্ধে' যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, অথচ পথ পাচ্ছে না। তাদের কাছ থেকে পথের নির্দেশ নিয়ে একে একে ছোট ছোট দলে ওপারে গেছে কাজী, মায়া, ফতে, পুলু, গাজী, সিরাজ, আনু ও আরো অনেকে। গেছে শাহাদত চৌধুরী, আহরার আহমদ, ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন সালেক, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের কাদের, এ. আর. খোন্দকার, সুলতান মাহমুদ। গেছে পি.আই.এ'র পাইলট ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার, ক্যাপ্টেন শাহাব এবং এরকম আরো বহুজন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বাদল খালেদ মোশাররফের স্ত্রী রুবী ও তার মাকে ঢাকা থেকে নিয়ে খালেদের কাছে পৌঁছে দেয় অনেক কষ্ট করে। যাবার সময় পথে ঘোড়াশালে ও ভৈরববাজারে পাক বিমানবাহিনীর বম্বিং ও স্ট্রেফিংয়ের মধ্যে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্ত রে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে, পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে করতে অবশেষে একদিন রুবী পৌঁছে যায় খালেদের কাছে। কিন্তু মেয়ে দু'টি রয়ে যায় ঢাকাতে। রুবীর ভাই দীপুর বন্ধু

মাহমুদের বাসায় ছিল মেয়েরা। পাক আর্মি দীপু ও মেয়ে দু'টিকে ধরে ফেলে। তারপর সামরিক কর্তৃপক্ষ অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস মিসেস আনোয়ারা মনসুরের হেফাজতে রেখে দেয় খালেদ মোশাররফের মেয়ে দু'টিকে।

মেজর খালেদ মোশাররফের স্ত্রীকে ঢাকা থেকে পার করে দেবার অপরাধে সামরিক সরকার হুলিয়া বের করে বাদলের নামে। তবুও এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েই বাদল কিছুদিন পর আবার ঢাকা আসে। এবার তার কাজ খালেদের মেয়ে দু'টিকে নিয়ে বাবা-মা'র কাছে পৌঁছে দেয়া। খুব কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আনোয়ারা মনসুরের বাসা হলো এলিফ্যান্ট রোডের 'নাশেমন' সরকারি ভবনে, তিনতলার ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে দু'টি বাচ্চা হাইজ্যাক করে আনা বড় সহজ কাজ নয়। বাদলের এ কাজে তার সঙ্গী হলো বদি, কাজী, স্বপন ও চুল্লু। চুল্লু নিচে গাড়িতে বসে রইল স্টার্ট দিয়ে। বাকি চারজন অস্ত্রসহ তিনতলায় উঠে গেল। কিন্তু দু'টি মেয়েকেই নিয়ে আসতে পারল না ওরা। আনোয়ারা মনসুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাড়ির অন্য কেউ একজনকে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে স্বপন পিস্তলের একটা ফাঁকা গুলি ছোড়ে দেয়ালে। তারপরই হুলস্থুল লেগে যায়। আনোয়ারা মনসুরের বড় বোন ছুটে আসলে একজন তাঁর পায়ের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলি পায়ের চামড়া ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আনোয়ারা মনসুরের মাথায় স্টেনের বাঁটের আঘাত লাগে। বড় মেয়ে বেবী বাদলকে চিনত, কিন্তু ছোটটি চিনত না। মিসেস মনসুর ছোট মেয়ে রূপনকে বুকে জাপটে ধরে বসেছিলেন। গুলির পর বাদলরা এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করে নি। বাদল বেবীকে তুলে নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে নিচে নেমে আসে। দেখে, গাড়ির কাছাকাছি লোক জমে যাচ্ছে। বদি প্রচণ্ড ধমকে কয়েকজনকে ঘাবড়ে দেয়। ওরা দ্রুত গাড়িতে উঠে উধাও হয়ে যায়। শহরে আর কোথাও দাঁড়ায় নি। গোপীবাগে গিয়ে এক জায়গায় চুল্লু ওদের নামিয়ে দেয়। বাদল আর কাজী বেবীকে নিয়ে মানিকনগর দিয়ে গিয়ে দাউদকান্দি হয়ে পথে অনেক বিপত্তি পেরিয়ে তারপর খালেদ মোশাররফের ক্যাম্পে পৌঁছায়।

এতসবের মধ্যেও খালেদ মোশাররফ মাথা ঠাণ্ডা রেখে মুক্তিযুদ্ধের কাজ চালিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে দুই নম্বর সেক্টর, মেলাঘর তার হেডকোয়ার্টার্স। নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিরাট গেরিলা বাহিনী। দেশের অন্য সব জায়গা থেকে তো বটেই, বিশেষ করে ঢাকার যত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, টগবগে, বেপরোয়া ছেলে, এসে জড়ো হয়েছে এই সেক্টর টুতে। খালেদ মোশাররফ কেবল তাদের সেক্টর কম্যান্ডারই নয়, খালেদ মোশাররফ তাদের হিরো। যতগুলো ছেলে সেক্টরে রাখার অনুমতি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে আশ্রয় দিত খালেদ। নির্দিষ্টসংখ্যক ছেলের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রেশন দুইগুণ বেশি ছেলেরা ভাগ করে খেত। খালেদ বলত, 'ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য আমার প্রচুর ছেলে দরকার। অথচ আওয়ামী লীগের ক্লিয়ারেন্স, ইউথ ক্যাম্পের সার্টিফিকেট বা ভারত সরকারের অনুমোদন পেরিয়ে যে কয়টা ছেলে আমাকে দেওয়া হয়, তা যথেষ্ট নয়।' তাই খালেদ বাদলকে বলত, 'যত পার, সরাসরি ছেলে রিক্রুট করে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। এই যুদ্ধ আমাদের জাতীয় যুদ্ধ। দলমত নির্বিশেষে যারাই দেশের জন্য যুদ্ধ করতে আসবে, তাদের সবাইকে আমি সমানভাবে গ্রহণ করব।'

বাদলরা তাই করত। ফলে, খাতায় যত ছেলের নাম থাকত, তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে খালেদ ক্যাম্পে রেখে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে ঢাকা পাঠাবার জন্য তৈরি করত। তিনশো ছেলের রেশন ছয়শো ছেলে ভাগ করতে খেত। হাত খরচের টাকাও এভাবে ভাগ হয়ে একেকটি ছেলে পেত মাসে এগারো ইন্ডিয়ান রুপি।

বহু ছেলে যুদ্ধ করার উন্মাদনায় আগরতলা এসেও কোথাও ট্রেনিং নিতে পারছিল না, বসে বসে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। খালেদ মোশাররফ এভাবে ভারত সরকারের নাকের ডগায় লুকিয়ে বেশি বেশি স্বাধীনতাকামী যুদ্ধকামী ছেলেদেরকে তার পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করার পলিসি না নিলে ঢাকার গেরিলা তৎপরতা এত সাফল্য আসত কি না, এরকম অব্যাহত গতি বজায় থাকত কি না, সন্দেহ। ২৯-৩০ আগস্টে এত বেশিসংখ্যক গেরিলা ধরা পড়ার পরেও মাত্র দেড় দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রচুর, অজস্র, অসংখ্য গেরিলা ঢাকার বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরে ঢুকছে, অ্যাকশান করছে, পাক আর্মিকে নাস্তানাবুদ করছে, সামরিক সরকারের ভিত্তি নড়িয়ে দিচ্ছে, অবরুদ্ধ দেশবাসীর মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছে—এটাও সম্ভব হচ্ছে খালেদেরই দূরদর্শিতার জন্য। আসলে খালেদ স্বপ্নদ্রষ্টা। খালেদ শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। বাংলাদেশের জন্য যা ভালো মনে করেছে, তাই কাজে পরিণত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এক্ষেত্রে সে আওয়ামী লীগের বা ভারত সরকারের নির্দেশ বিধিনিষেধের ধার ধারেনি। তার এই সাহস, দুঃসাহস, আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যতের দিকে নির্ভুল নির্ভীক দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা তাকে সেক্টর টু'র গেরিলা ছেলেদের কাছে করে তুলেছে অসম্ভব জনপ্রিয়। প্রায় দেবতার মত। খালেদের যে কোন হুকুম চোখ বন্ধ করে তামিল করার জন্য প্রতিটি গেরিলা ছেলে একপায়ে খাড়া। খালেদ মোশাররফ সেক্টর টু'র প্রাণ।

সেই খালেদ মোশাররফ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছে? নিঃসন্দেহে তার জন্য গৌরবের মৃত্যু, শহীদের সম্মান পেয়েছে সে। কিন্তু সেক্টর টু'র জন্য? মেলাঘরের উদ্দাম, দুঃসাহসী গেরিলা বাহিনীর জন্য? ঢাকায় অবরুদ্ধ আমাদের জন্য? আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর কি হতে পারে?

খালেদের মৃত্যুসংবাদে মনের মধ্যে রুমীর শোক দ্বিগুণ উথলে উঠল। মেলাঘর থেকে ফেরার পরে রুমী কতো যে খালেদের গল্প বলত। খালেদই তো ছেলেদের বলত 'কোন স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। চায় রক্তস্নাত শহীদ।' তাই কি খালেদ আজ শহীদ? লক্ষ লক্ষ ছেলেকে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়ে খালেদ কোথায় চলে গেল?

দূরে একটা গ্রেনেড ফাটল। কোন এক রুমী, এক বদি, এক জুয়েল, এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্নে মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করে কোথাও আঘাত হানল। স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খালেদ মোশাররফের হাতে গড়া গেরিলারা। ওই ছেলেরা কি জানে, ওদের নেতা আর নেই?

খালেদ নেই, রুমী নেই, বদি নেই, জুয়েল নেই কিন্তু যুদ্ধ আছে—স্বাধীনতার যুদ্ধ।

নভেম্বর

ফটোটা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। কতোদিন দেখি নি ওই প্রিয়মুখ। এই কি ছিল বিধিলিপি ? রুমী। রুমী। তুমি কি কেবলি ছবি হয়ে রইবে আমার জীবনে ? তুমি গেরিলা হতে চেয়েছিলে, গেরিলা হয়েছিলে। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র পদসঞ্চারে আঘাত হানতে শত্রুকে, নির্ভুল লক্ষ্যে। শত্রুও একদিন নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনে, রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গেল তোমাকে।

৪ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গতকাল সারাদিন কারেন্ট ছিল না। কোথায় যে কি হয়েছে এখনো কোন খবর কারো কাছে পাই নি। লুলুটা খবর আনার ব্যাপারে খুব করিতকর্মা। তাকে আমরা সব সময় 'গেজেট' বলে ডাকি, তারও আজ পাত্তা নেই।

দিনগুলো কেমন যেন নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ হয়ে কাটছে। বেশি কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। ফোনে মিনির সঙ্গে কথা বলি, রেজিয়ার সঙ্গে বলি, ডলির সঙ্গে কথা বলি। খালেদ মোশাররফের খবরে সবাই মর্মাহত। মিনির কাছে জেনেছি, খালেদের মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র ঢাকায় গেরিলাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকেই দু'জন করে গেরিলা মেলাঘরে ছুটে গেছে খবরাখবর জানবার জন্য। আশা করা যাচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেই আমরা বিস্তারিত খবর জানতে পারব।

খালেদের মৃত্যু সংবাদে গেরিলাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেলেও কেউ মনোবল হারায় নি, তা বোঝা যাচ্ছে তাদের প্রতিদিনের অ্যাকশানে। বরং বলা যায়, তারা যেন খালেদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আরো রুখে, আরো মরিয়া হয়ে, একটার পর একটা অ্যাকশান করে চলেছে।

জোনাকি সিনেমা হলের পাশে যে পলওয়েল মার্কেট আছে, গতকাল সেখানে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে বিচ্ছুরা টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। এগারোটার সময় প্রকাশ্য দিবালোকেই একই দিনে মৌচাক মার্কেটে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তিন-চারজন বিচ্ছু ঢুকে সাত হাজার টাকা নিয়ে যায়। ওটাও ওই এগারোটা-সাড়ে এগারোটার দিকেই প্রকাশ্য দিবালোকে।

খবর কাগজেই বেরিয়েছে এসব ব্যাঙ্ক লুটের কাহিনী। খবর কাগজে আরো বেরিয়েছে : ১ নভেম্বর প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিশন অফিসে বোমা বিস্ফোরণে একজন নিহত, দু'জন আহত, দুটো ঘর বিধ্বস্ত, ছাদ ধসেছে, বোমার আগুনে কাগজপত্র পুড়ে ছাই। ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় কাকরাইল পেট্রল পাম্পের ওপর গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে। রাত আটটায় আজিমপুরে আর্মি রিক্রুটিং কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে।

আজ বিকেলে পাগলাপীরের আস্তানায় সাপ্তাহিক মিলাদ। কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই আমার। ঠিক করেছি মিষ্টিসহ জামীকে পাঠিয়ে দেব। জামীর খুব আপত্তি নেই। কারণ শিমুলদের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। এমনিতেই এক পায়ে খাড়া থাকে ও বাড়িতে যাবার জন্য।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলার পর খুব ঝরঝরে লাগল। কারণ এখন আর কোন তাড়াহুড়ো নেই আমার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বারোটা বাজে।

বেশ আয়েস করে এককাপ চা নিয়ে বসেছি, হঠাৎ দরজায় বেল। জামী খুলে দিতেই হাসিমুখে ঘরে ঢুকে মিনি। ঢুকেই কল্‌কল্ করে বলে উঠল, 'চাচী সুখবর। খালেদ মোশাররফ মারা যায় নি। যুদ্ধে সাংঘাতিক জখম হয়েছে। কিন্তু বেঁচে আছে।'

খালেদ মোশাররফ বেঁচে আছে!

খোদা! তুমি অপার করুণাময়।

আমি মিনিকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসিয়ে বললাম, 'কার কাছে শুনলে? সব খুলে বল।'

মিনি বলল।

ঢাকা থেকে যেসব মুক্তিযোদ্ধা মেলাঘরে ছুটে গিয়েছিল, তাদের দু'একজন ফিরে এসেছে। তাদের কাছ থেকে মিনি শুনেছে : যুদ্ধ করার সময় শত্রুপক্ষের শেলের একটা স্প্লিটার খালেদের কপালে লেগেছে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে লক্ষ্ণৌয়ে। এর বেশিকিছু মিনি শোনে নি। না শুনুক খালেদ মোশাররফ বেঁচে আছে, এই খবরটাই আমাদের কাছে অনেকখানি।

মিনিদের বাড়িটাই গেরিলাদের একটা আস্তানা। ওরা চাচাতো, খালাতো, পাড়াতুতো ভাইরা মুক্তিযোদ্ধা, তারা এবং তাদের সুবাদে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে। সৌভাগ্যবশত ওদের বাড়িতে পাক আর্মির হামলা হয় নি, তাই গেরিলারা এখনো নিঃশঙ্কচিত্তে আসতে পারে ওদের বাড়িতে। জিগ্যেস করলাম, 'ডি.আই.টি. বিল্ডিংয়ে কারা ব্লাস্ট করছে, জানো?'

মিনির একটা বৈশিষ্ট্য হলো, কথায় কথায় ঝরঝর করে হাসা। হেসে বলল, 'ওমা চাচী—ওতো আমাদের জন আর ফেরদৌস।'

'বল কি? ওই স্কুলের ছেলে দুটো? ওইরকম কড়া সিকিউরিটি কাটিয়ে? কি করে করল?'

'ওদের কথা আর বলবেন না। ওরা যা বিচ্ছু। অনেকদিন থেকে ওরা পাঁয়তারা কষছিল কি করে ডি.আই.টি. বিল্ডিংয়ের ভেতর ব্লাষ্ট করা যায়। ডি.আই.টি'তে কাজ করে এক ভদ্রলোক, নাম মাহবুব আলী, সে আবার টিভি'তে নাটকে অভিনয়ও করে—ঐ যে সুজা খোন্দকারের সঙ্গে মাঝে-মাঝে গুরু-শিষ্য বলে একটা হাসির প্রোগ্রাম করে—ঐ মাহবুব। সে জন আর ফেরদৌসকে খুব সাহায্য করেছে। ওদেরকে ভেতরে ঢোকার পাস যোগাড় করে দিয়েছে। নিজের পায়ে নকল ব্যান্ডেজ লাগিয়ে তার ভেতর পি.কে. নিয়ে গেছে ডি.আই.টি'র সাততলায়। সাততলায় ঐ রুমটাতে মেলাই পুরনো ফাইল গাদি করে রাখা হত। ঐসব ফাইলের গাদির ভেতর ঐ পি.কে. লুকিয়ে রাখত।'

'মাহবুব আলীর খুব সাহস তো?'

'সাহস বলে সাহস? তাও একদিন তো নয় বারোদিন ধরে রোজ একটু একটু করে পি.কে. পায়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। দিনে এক পাউন্ডের বেশি নেয়া যেত না, তাহলে ব্যান্ডেজ বেশি মোটা হয়ে গেলে পাক আর্মির সন্দেহ হবে। জন-ফেরদৌসের প্ল্যান ছিল আরো বড়। ডি.আই.টি. টাওয়ারের ওপর যে টি.ভি অ্যান্টেনা টাওয়ার আছে, ওটা ব্লাস্ট করা। এর জন্য দরকার ছিল ষোল পাউন্ড পি.কে. ভেতরে নেবার। কিন্তু বারো পাউন্ড নেবার পর হঠাৎ ওরা শুনল সাততলায় ঐ ঘরের ফাইলপত্র সরিয়ে ঘরটা গোছানো হবে। অমনি ওরা ভয় পেয়ে গেল। ফাইলের পেছনে লুকানো পি. কে. একবার ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ডি.আই.টি. বিল্ডিংয়ের তাবৎ বাঙালির জান তো যাবেই, ভবিষ্যতে আর কোনদিনও ডি.আই.টি'র ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। তাই জন, ফেরদৌস আগেই অপারেশান করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। একটু অন্যরকম হবে। তা কি আর করা। তবু ওদের ব্লাস্ট করা চাই-ই। কারণ দুনিয়াকে ওরা দেখাতে চায় পাক আর্মির সিকিউরিটি দুর্ভেদ্য নয়; পাক আর্মির অত্যাচারের চাপে হাঁসফাঁস করেও বাঙালিরা একেবারে মরে যায় নি। ওরা মাহবুব আলীর ব্যান্ডেজের মধ্যে ছয় ফুট সেফটি ফিউজ দিয়ে দিল; আর একটা ফাইন্টেন পেনের ভেতরটা খালি করে তার মধ্যে একটা ডিটোনেটার ভরে দিল। মাহবুব আলী এগুলো ভেতরে নেবার সময় প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। অন্যদিন পুলিশ শুধু সার্ট-প্যান্টের পকেট চেক করে। সেদিনের পুলিশটা হঠাৎ কি মনে করে মাহবুবের

কোমর, উরু-হাঁটু এগুলোও চেক করা শুরু করল। মাহবুবের তখন যা অবস্থা! পুলিশটা আর এক ইঞ্চি নিচে হাত দিলেই ওর পায়ের ব্যান্ডেজ বুঝে ফেলত। কিন্তু মাহবুবের কপাল ভালো—পুলিশটা ঐ পর্যন্ত দেখেই ক্ষান্ত হয়েছিল। মাহবুব, জন আর ফেরদৌসকে অডিশান দেবার দুটো পাস যোগাড় করে দিয়েছিল। ওরা সেই পাস নিয়ে ডি.আই.টি. বিল্ডিংয়ে ঢুকে অপারেশান করে বেরিয়ে আসে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'উঃ, বলতে কি সহজ। কিন্তু ওরা যখন কাজটা করেছিল, তখন মোটেই সহজ ছিল না।'

'তাতো ছিলই না। ঘাপলাও কি কম হয়েছিল চাচী? এখন তো প্রত্যেক তলায়-তলায় সিঁড়ির মুখে চেকপোস্ট; ছয়তলা পর্যন্ত চেকপোস্টের পুলিশ ওদের ছেড়ে দিল। সাততলায় যাবার সিঁড়ির পুলিশটা বোধ হয় একটু বেয়াড়া ছিল। সে তো জেরা করা শুরু করল 'কেন যাবে? কার কাছে যাবে? কি কাজ?' জন আর ফেরদৌস তো কম বিচ্ছু নয়। ওরা খুব ডাঁটে বলল, 'আরে, আমরা সরকারি অফিসের লোক। সরকারের জরুরী কাজে ওপরে যাচ্ছি। তুমি আমাদের আটকালে সরকারের কাজেই ক্ষতি হবে। আমাদের কি? আমাদের পাঠানো হয়েছে, বুড়িগঙ্গার পানি কতটুকু বেড়েছে, তা টাওয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করার জন্য। দেখছ না, কদিন থেকে কি বৃষ্টি? এ বছর এত বৃষ্টির জন্যেই তো দেশে এত বন্যা, এত ঝুট-ঝামেলা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ না ঐ যে মাঠঘাট কেমন পানিতে ডুবে গেছে।' ওদের লম্বা বক্তৃতার ফাঁকে ওদের পেছনে আরো লোক এসে জমা হয়েছে ওপরে যাবার জন্য, তাদেরকেও চেক করতে হবে। পুলিশটা তো ওয়েস্ট পাকিস্তানি—জানেন তো ওরা কি রকম বুদ্ধু হয়—জনের কথার তোড়ে দিশেহারা হয়ে বলে 'আচ্ছা, আচ্ছা যাও।'

মিনি হাসতে হাসতে কথা বলছিল, এখন হাসি এত বেড়ে গেল যে কথা থামাতে হলো। আমি আর জামীও খুব হাসলাম। সত্যি বলতে কি, খালেদের মিথ্যে মরার খবর শোনার পর এই প্রথম প্রাণ খুলে হাসলাম। একটু পরে হাসি থামিয়ে বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি? ওরা সাততলায় সেই ঘরে গিয়ে যা যা করা দরকার—সব পি.কে. একত্রে টাল করা, ফিউজওয়ার লাগানো, ডিটোনেটার ফিট করা—সব দু'জনে মিলে করে, ফিউজওয়ারের মুখে আগুন ধরিয়ে বেরিয়ে এল। ফিউজওয়ার পুড়ে ব্লাস্ট হতে তিন মিনিট লাগবে, এই সময়ের মধ্যে ওদেরকে ডি.আই.টি. বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে বেরোতে না পারলে ওরা আটকা পড়ে যাবে। কারণ ব্লাস্ট হওয়া মাত্রই তো আর্মি পুরো বিল্ডিং ঘিরে ফেলবে, কাউকে বেরোতে দেবে না। তিন মিনিটে সাততলা থেকে নেমে রাস্তায় বেরোনো কি চাট্টিখানি কথা চাচী? দৌড়োতেও পারে না, পুলিশ দেখে ফেললে সন্দেহ করবে। আবার হেঁটে গেলেও সারতে পারবে না। তাই যেখানে কেউ নেই, সেখানে ওরা দৌড় দেয়, আবার পুলিশ দেখলে ভালো মানুষের মতো মুখ করে হাঁটে। ওদের কপাল ভালো, ব্লাস্ট হবার আগের মুহূর্তে ওরা বেরিয়ে যেতে পেরেছিল।'

আমি আবারো নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'বড্ডো বেপরোয়া ওরা। আল্লা বাঁচিয়েছেন ওদের। বাঘের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।'

মিনি বলল, 'চাচী, কাল আমাদের ওদিকে সারাদিন কারেন্ট ছিল না। আপনাদের এ দিকে?'

'এদিকেও ছিল না। ভোর ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত। চৌদ্দ ঘণ্টা। জানো কালকেই প্রথম টিউবওয়েলটা ব্যবহার করতে পারলাম। এটা বসানোর পর একদিনও কারেন্ট যায় নি। বড্ডো দুঃখ ছিল মনে—পয়সাগুলো গচ্চা গেল।'

মিনি আবার হেসে কুটিকুটি হলো, 'কাল কিছুটা উসুল হলো তাহলে?'

'তা হল। কিন্তু কারা কোথায় কি করল, তা তো জানতে পারলাম না।'

জামী খাবার টেবিলে বসে খবর কাগজগুলো ওল্টাচ্ছিল, সে বলল, 'কেন? কাগজে বেরিয়েছে, দেখ নি?'

'তাই নাকি? কি লিখেছে?' জামী পড়ল, 'সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউসে বোমা বিস্ফোরণ।

গতকাল বুধবার ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউসে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে পাওয়ার হাউসের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং চারটি জেনারেটরই বিকল হয়ে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী ও শহরতলি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।' শুনতে শুনতে আমি উদাস হয়ে গেলাম। রুমীরা এই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার প্ল্যান নিয়ে মেলাঘর থেকে ঢাকা এসেছিল। তারা তা করবার আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল। রুমী, বদি, জুয়েল চিরতরে হারিয়ে গেল। কিন্তু রুমীদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার জন্য আরো অনেক রুমী, অনেক বদি, অনেক জুয়েল সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

৭ নভেম্বর
রবিবার ১৯৭১

আজ ডলির বাসায় দেখা হলো নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর সঙ্গে। ওর কাছে শুনলাম খালেদ মোশাররফ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত খবর।

খালেদের মৃত্যুর খবর ওদের বেস ক্যাম্পে এসে পৌঁছায় অক্টোবরের ২৮/২৯ তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কারবালার মাতম পড়ে যায় ছেলেদের মধ্যে। এই সব দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা তাদের স্বপ্নের নায়ক বীর নেতার মৃত্যুসংবাদে একেবারে ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গেরিলা ছেলেকে মেলাঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয় বিস্তারিত খবর আনার জন্য। গতকালই তারা ফিরেছে সব খবরাখবর নিয়ে।

কসবা যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় খালেদ মোশাররফ জখম হয়েছে। শেলের স্প্লিন্টার খালেদের কপাল ফুটো করে মগজের ওপরদিক ঘেঁষে লেগেছে। অবস্থা খুব গুরুতর তবে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠবে, আশা আছে। লক্ষ্ণৌ শহরের যে হাসপাতালে খালেদকে নেয়া হয়েছে, সেটা খুবই উন্নতমানের হাসপাতাল।

খালেদের আহত হবার খবরে মেলাঘরে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। সবাই ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে। বহু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ম ভেঙে ক্যাম্প ছেড়ে আগরতলার দিকে ছুটে যায় খালেদের খবর নেবার জন্য। খালেদ মোশাররফ মেলাঘরের ছেলেদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। খালেদ শুধু তাদের সেক্টর কমান্ডার নয়, সে তাদের গার্ডিয়ান এঞ্জেল। তবে এত বড় সর্বনাশের মধ্যেও একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, যে কসবার যুদ্ধে খালেদ জখম হয়েছে, সেই কসবা মুক্তিবাহিনী ঠিকই দখল করে নিতে পেরেছে।

কসবার যুদ্ধ? অক্টোবরের ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ চারদিনই কাগজে কসবার যুদ্ধ নিয়ে খবর ছাপা হয়েছে পরপর। খুব ফলাও করেই হয়েছে কিভাবে 'ভারতীয় চররা' কামান,

ফিল্ডগান, ভারি মর্টার, অ্যান্টিট্যাঙ্ক গান নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে, কিভাবে পাক আর্মি বহু 'ভারতীয় চর' মেরেছে; কিন্তু কোথাও বুঝতে দেয়নি যে মুক্তিবাহিনী তাদের কাছ থেকে কসবা কেড়ে নিয়েছে।

খালেদ মোশাররফ জখম হওয়ার পর এখন হায়দার সেক্টর টু'র চার্জে আছে।

ইতোমধ্যে বাচ্চুর বাড়িতেও বিপদের ঝড় বয়ে গেছে। ওর বাবা-মা-ভাইবোনরা ঢাকায় যে বাড়িতে থাকে, সেখানে হঠাৎ অক্টোবরের ২৩ তারিখে পাক আর্মি গিয়ে ওর পাঁচ ভাইকে ধ'রে নিয়ে যায়। ওর বাবাকে বলে তোমার যে ছেলে মুক্তিযোদ্ধা, তাকে এনে দিলে তবে এই পাঁচ ছেলেকে ছেড়ে দেব। বাচ্চুর বাবা বলেন, সে ছেলের কোন খোঁজই আমি জানি না—তাকে কি করে এনে দেব? সামরিক কর্তৃপক্ষের কথামতো বাচ্চুকে উদ্দেশ্য করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। যাই হোক, সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন বোঝে যে সত্যিই বাচ্চুর খোঁজ তার বাবা জানে না, তখন তারা পাঁচ ভাইকে ছেড়ে দেয় ২৯ তারিখে।

বাচ্চু বলল, 'এত বিপদের মধ্যে আমরা কিন্তু মনের বল হারাই নি। এর মধ্যেও আমরা অ্যাকশান করে গেছি। সেপ্টেম্বরের শেষে আমরা যখন আসি তখন খালেদ মোশাররফ আর হায়দার ভাই বলেছিল শিগগিরই প্রবলেম বাঁধতে পারে, তোমরা পারলে কিছু টাকা পয়সা যোগাড় করে পাঠায়ো। গত সপ্তাহে আবারো একটা চিঠি পেলাম হায়দার ভাইয়ের কাছ থেকে। শিগগিরই যেন কিছু টাকা পাঠাই। সেই জন্য আমরা কয়দিন আগে পলওয়েল মার্কেটে একটা ব্যাঙ্ক লুট করে সেই টাকা সেক্টরে পাঠিয়েছি।'

'পলওয়েল মার্কেটের ব্যাঙ্ক তাহলে তোমরাই—'

বাচ্চু হাসল, 'হ্যাঁ আমরাই।'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না এখান থেকে সেক্টরে টাকা পয়সা পাঠাতে হবে কেন?'

'ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেক্টর টু-তে আর্মস দেওয়া বন্ধ করেছে, টাকা আর রেশনও দিচ্ছে না। তাই। আপনি জানেন না—সেক্টর টু'র সঙ্গে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটা প্রবলেম প্রথম থেকেই ছিল। সেটা গত দু'মাস থেকে বেশি হয়ে উঠেছে। ওরা তো সেক্টর টু'কে রেড সেক্টর বলে। ওদের ধারণা—এখানে নাকি নকশালদের হেল্প্ করা হয়। তাছাড়া আমারো একটা ঘটনা আছে। আমি ভাসানী ন্যাপ রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, তাই আমাকে দু'তিনবার ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্টারোগেশানের জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিল, খালেদ মোশাররফ দেয় নি। আমাদের দলের লিডার মানিক, সে ছাত্রলীগ করে, সেও আমাকে কয়েকবার বাঁচিয়েছে। দু'জন দুই রাজনীতির সমর্থক কিন্তু দেখুন যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা এক সঙ্গে যুদ্ধ করছি। মানিক লিডার, আমি ডেপুটি লিডার। এখানে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ এটা আমাদের জাতীয় যুদ্ধ, আমাদের বাঁচামরার ব্যাপার। ওপর দিকে যারা বসে আছে, তারাই খালি ক্ষমতা কি করে দখলে রাখা যায় তার পাঁয়তারা কষছে।'

'তোমরা ব্যাঙ্ক লুট করলে কিভাবে বল না।'

বাচ্চু হেসে ফেলল, 'সে এক মজার ব্যাপার, সাত-আটদিন আগে হায়দার ভাইয়ের পাঠানো একটা চিঠি ফেলাম—ওখানে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকার দরকার। তখন ঠিক করলাম সাভারে আমাদের বেস ক্যাম্প যেখানে সেখানকার পিস কমিটির মেম্বারদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করব আর ঢাকার একটা ব্যাঙ্ক লুট করব। জোনাকি সিনেমা হলের পাশের এই মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কটা টার্গেট করলাম। অ্যাকশানে গেল আসাদ, মুনীর, ফিরোজ, জন, আরিফ আর ফেরদৌস। আসাদ নিল

একটা স্টেনগান, মুনীরের হাতে তার খেলনা রিভলভার। দেখতে একদম আসল রিভলভারের মত। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই খেলনা রিভলবার দিয়েই ওরা পঁচিশ হাজার টাকা তুলে এনেছিল। আরিফ তার বাবার গাড়িটা একটা বাহানা করে নিয়ে এসেছিল। আমরা নওরতন কলোনিতে জলিদের বাসায় বসে গাড়িটার নম্বর-প্লেট বদলালাম। আরিফের বাবা পীর সাহেব তো, তাই তার গাড়িটাও সবাই চেনে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'পীর সাহেব!'

'পীর সাহেব কিন্তু ওঁর গাড়িতে আর্মস অ্যামুনিশান লুকোনো থাকে। পীর সাহেব বলেই তো সুবিধে। গাড়ির নম্বর-প্লেট বদলে ওরা তো গেল সকাল এগারোটায়। আরিফ গাড়ি চালাচ্ছিল, জন আগেই গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। ওরা ব্যাঙ্কের সামনে যেতেই জন 'অলক্লিয়ার' ইশারা দিল। আসাদ, মুনীর আর ফিরোজ নামল। ঢুকেই প্রথমে দারোয়ানকে কাবু করল, তার রাইফেল কেড়ে নিল। ওদিকে বাইরে কিন্তু আর্মির দুটো লরি দাঁড়িয়ে আছে, তারা বুঝতে পারে নি ভেতরে কি হচ্ছে। আসাদ ভেতরে স্টেন তুলে সবাইকে বলল, 'হ্যান্ডস আপ।' মুনীর তার খেলনা পিস্তল উঁচিয়ে সবাইকে ক্যাশ কাউন্টারের পেছনে নিয়ে দাঁড় করাল। ম্যানেজারকে যখন বলা হলো, 'টাকা দেন।' উনিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই যে টাকা নিয়ে যান। আপনারা মুক্তিবাহিনী, জানি টাকা আপনাদের দরকার।' সবাই খুব কো-অপারেট করল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, টাকা নেবো কিসে, ওরা তো টাকার বাণ্ডিল এগিয়ে দিলেন, টাকা নেবার মতো কোন ভাণ্ড আমাদের নেই, তখন ফিরোজ তার সার্ট খুলে দিল। তার মধ্যে সব টাকা রেখে মুড়িয়ে ওরা যখন বেরোচ্ছে, তখন দেখা গেল সার্টের হাতার ফাঁক দিয়ে টাকা পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়।'

হাসতে হাসতে বিষম খেল বাচ্চু, 'সে এক মজার ব্যাঙ্ক লুট বটে! পাকিস্তান আর্মি ততক্ষণে টের পেয়ে গেছে।'

'টের পেয়ে গেছে? টাকা পড়ে যাচ্ছে দেখে?'

'না। রাস্তার লোকের তালি দেওয়া দেখে। এখন ঢাকার লোকের অভ্যেস হয়ে গেছে, মুক্তিরা কোনো অ্যাকশান করলে তারা তালি দেয়, জয় বাংলা বলে ওঠে। এখন তারা আর আর্মিকে ভয় পায় না। ওই তালি শুনেই আর্মি টের পেয়ে যায়। কিন্তু কিছু করতে পারে নি। আরিফ প্রথম থেকেই গাড়িতে বসেছিল ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে। আসাদ, মুনীররা বেরিয়েই গাড়িতে উঠে ভোঁ দৌড়। আর্মির ওই ভারি লরি ঘুরিয়ে ধাওয়া করতে করতে ওরা হাওয়া। ওরা আবার জলিদের বাসাতেই ফিরে আসে। এই বাসার মেইন গেটটা বেইলি রোডে। ওরা বেইলি রোড দিয়ে বাসায় ঢুকেই ফল্‌স্‌ নম্বর-প্লেটটা খুলে ফেলে পেছনের আরেকটা গেট দিয়ে শান্তিনগরের রাস্তায় পড়ে অনেক ঘুরে ধানমণ্ডিতে আরিফদের বাসায় চলে যায়। বিকেলে যখন রাস্তায় বেরোই তখন দেখি প্রত্যেকটি রাস্তায় কালো মরিস মাইনর চেক করা হচ্ছে। পীর সাহেবের গাড়িটা কালো মরিস মাইনর কি না।'

'তোমরা কত টাকা পাঠিয়েছ মেলাঘরে?'

'ব্যাঙ্কের ২৫ হাজার আর পিস কমিটির ২৫ হাজার—মোট ৫০ হাজার টাকা।'

'তোমরা যে এত টাকা পাঠিয়ে দিলে, তোমাদের চলে কি করে?'

'আমাদের? আমাদের চিন্তা কি? আমরা যেখানে থাকি, সব্বাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দিয়ে যায়। যে যা পারে। জেলেরা মাছ দেয়, চাষীরা ক্ষেতের তরিতরকারি, একটু ধনী চাষী আস্ত গরু পাঠিয়ে দেয়। নদীর ঘাটে জেলেরা একটা বড় ডুলা বেঁধে দিয়েছে—সকালে নদী দিয়ে যাবার সময় নিজ নিজ নৌকো থেকে যার যা সাধ্যমত মাছ ঐ ডুলাতে দিয়ে যায়। দিনের শেষে দেখা যায় বিশ-ত্রিশ সের, কোনদিন এক

মণ পর্যন্তও মাছ জমেছে। ঐ মাছ দিয়ে আমাদের দু'বেলার খাওয়া চলে যায়। এ ছাড়াও সবাই নিয়মিত চাঁদা দেয়—তা থেকে দলের প্রত্যেককে একশো টাকা করে মাসোহারা দিই। আমরা প্রথম যখন রোহা গ্রামে বেস্ ক্যাম্প করি, তখন মেলাঘর থেকে এসেছিলাম মাত্র ৫২ জন। আসার পর বহু লোকাল ছেলেপিলে এসে দলে ভর্তি হয়ে গেল। জানেন, মাত্র দশদিনের মধ্যে আমরা ৪৫০ জন হয়ে গেলাম।'

৮ নভেম্বর
সোমবার ১৯৭১

হ্যারিসের বাসায় গিয়েছিলাম রুমীর একটা ফটোর নেগেটিভ আনতে। বছর দুয়েক আগে ওরা দু'জনে ওয়েস্ট পাকিস্তান বেড়াতে গিয়েছিল আমার দুই বোনের কাছে। তখন হ্যারিসই তুলেছিল ছবিটা। আমার কাছে একটা কপি আছে। কোমরে চিশতীর পিস্তল আর কাঁধের ওপর দিয়ে গুলির বেল্ট ঝুলিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ লাগিয়ে কোমরে দুই হাত রেখে রুমী কি যেন বলছে—এমনি অবস্থায় তোলা ছবিটা। খুবই জীবন্ত মনে হয়। গতকাল হঠাৎ হ্যারিস নিজেই ফোন করে বলেছিল তার কাছে রুমীর কয়েকটা ছবির নেগেটিভ আছে। আজ গিয়ে নিয়ে এলাম। ক'দিন থেকে রুমীর ফটো খুঁজছিলাম বাসার সব অ্যালবাম খুলে। ইদানীং রুমী একেবারেই ফটো তুলতে চাইত না। ফটো যা আছে, সব দু'তিন বছর আগের তোলা। হ্যারিসের কাছ থেকে নেগেটিভ এনে দোকানে একটু বড় করে প্রিন্ট করতে দিলাম।

পুরনো ছেলেপিলেরা মাঝে-মধ্যে হঠাৎ এসে দেখা করে যায়। সেলিম এসেছিল গতকাল। আজ এসেছিল মনু অর্থাৎ মনিরুল আলম।

১০ নভেম্বর
বুধবার ১৯৭১

মাসুম আজ বাড়ি গেল। ভোরে গাড়ি করে কোচ স্টেশনে দিয়ে এসেছি।

ঈদের কেনাকাটা খুব জমে উঠেছে। তবে তা এক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই। যাদের বাড়ির মেয়েদের জামাকাপড় আর ছেলেদের টুপি-জুতোতে বেশি বেশি জরি, চুমকির বাহার দেখা যায়—সেই সব বিহারি আর বাড়িতে উর্দু বলা 'বাঙালি'দের মধ্যেই ঈদের কেনাকাটার সমারোহটা বেশি দেখা যাচ্ছে। আমাদের কোন ঈদের কোনাকাটা নেই। আমাদের মতো আরো অনেক পরিবারেরই নেই। কোথা থেকে কারা যেন সাইক্লোস্টাইল করা হ্যান্ডবিল ছেড়েছে—দেশের এই দুর্দিনে ঈদের খুশি বলে কিছু নেই। সুতরাং ঈদ উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় কেনা, উৎসরের আয়োজন করা অনুচিত। অন্যদিকে সামরিকজান্তা প্রচার করছে ঈদের খুশি সামনে—প্রাণভরে সবাই আনন্দ করো, কাপড় কেনো, পোলাও কোর্মা সেমাই ফিরনির আয়োজন করো। এক শ্রেণীর লোক মেতেও উঠেছে তাই করতে। নিউ মার্কেটে, বায়তুল মোকাররমে, জিন্না এভিনিউতে গেলে লোকের এই আনন্দ-উল্লাস দেখে মনের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ফুঁসে ওঠে।

১২ নভেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

চারদিকে কেমন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। দৈনিক কাগজগুলো ভারতীয় আগ্রাসন, ভারত কর্তৃক যুদ্ধের হুমকি, সীমান্তে ভারতীয় তৎপরতা ইত্যাকার খবরে সয়লাব। পাঁচ তারিখে হঠাৎ সরকারি আদেশে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রাত সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত ব্ল্যাক আউটের মহড়া হল। আজ আবার কাগজে দেখছি সরকারি-বেসরকারি সব বাড়িঘরের পাশে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

দেশের অভ্যন্তরেও লম্ফঝম্প কম হচ্ছে না। পি.ডি.পি'র চেয়ারম্যান নুরুল আমিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন রাজাকারদের সংখ্যা এবং তাদেরকে দেওয়া অস্ত্র—দুই-ই বৃদ্ধি করা হোক। উপনির্বাচন শুরু হবার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যে হারে 'ভারতীয়' ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে গেছে, তাতে রাজাকারদের শক্তিশালী করা খুবই প্রয়োজন।

কেরোসিনের দর হঠাৎ করে এক লাফে প্রতি টিন ১১ টাকা থেকে ১৮ টাকায় চড়ে গেছে। কি ব্যাপার? সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে বিচ্ছুদের ধাক্কার জের মনে হচ্ছে!

এতদিন কাগজে শুধু রাজাকার বাহিনীদের কথাই পড়তাম। এখন দেখছি আরো নতুন দুটো বাহিনীর নাম—আল-শামস আর আল-বদর। শব্দ দুটোর মানে কি? কাগজে দিচ্ছে—রাজাকারদের আল-শামস ও আল-বদর বাহিনী। তার মানে এরা রাজাকার বাহিনীরই দুটো অংশ? একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর?

গতকাল বায়তুল মোকাররমের দোকানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। আজকাল ঢাকায় এরকম কোথাও কিছু হলে আমার বিস্তারিত খবর জানতে কোন অসুবিধা হয় না। মিনিকে ফোন করলেই সব জানা যায়। ওর কাছে থেকেই জানতে পারলাম এই দলটার মধ্যেও জন আর ফেরদৌস ছিল। আরো ছিল আসাদ, ফিরোজ, বাবু, সহর, মুনীর, জাহেদুল। ওদের ঘটানো বিস্ফোরণে ফ্যান্সি হাউস বলে শাড়ির দোকানের ভেতরে একজন পাঞ্জাবি মেজর, আর কয়েকজন মহিলা জখম হয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়ানো তিনজন খানসেনা মরেছে, আরো কয়েকজন জখম হয়েছে। ফল হয়েছে বাকি দিন দোকানপাট সব বন্ধ, লোকের ঈদের কেনাকাটায় ছাই পড়েছে। বেশ হয়েছে।

১৭ নভেম্বর
বুধবার ১৯৭১

আজ একখানা দিন গেল বটে। গত রাতটা ছিল শবে কদরের রাত, শরীফ আর বুড়া মিয়া পাড়ার প্লেনওয়ালা মসজিদে গিয়েছিল নামাজ পড়তে। গতকাল রাতে কারফিউ ছিল না। শবে কদরের রাত বলেই। মুসল্লিরা সারারাত ধ'রে মসজিদে এবাদত-বন্দেগি ক'রে ফজরের নামাজ প'ড়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন। জামী আর আমি বাড়িতে নামাজ পড়েছি, মাঝরাতে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েও নিয়েছি। পাঁচটার সময় হঠাৎ নিচে কলিং বেল বাজল! বুক ধড়াস করে উঠল। এই ভোর রাতে কলিং বেল? ফজরের নামাজ না পড়ে

তো শরীফদের ফেরার কথা নয়। তাহলে? ভাবতে ভাবতেই আবার কলিং বেল। দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে আস্তে করে বললাম, 'কে?'

শরীফের গলা শোনা গেল, 'আমি।'

অবাক হয়ে নিচে নেমে দরজা খুলে দিলাম, 'এখনো তো ফজরের সময় হয় নি। চলে এলে যে?'

'কারফিউ দিয়ে দিয়েছে সাড়ে পাঁচটা থেকে। মাইকে করে বলে বেড়াচ্ছে। মুসল্লিরা সবাই হুড়মুড়িয়ে বাড়ির পানে দৌড় দিয়েছে। ফজর নামাজ পর্যন্ত থাকার উপায় কি? তাহলে তো মসজিদেই আটকা পড়ে থাকতে হবে।'

তা ঠিক। ফজরের আজান পড়বে পৌনে ছ'টায়। আর কারফিউ সাড়ে পাঁচটা থেকে। কাজেই ফজর নামাজ পর্যন্ত মসজিদে থাকার কোন উপায় নেই।

আজ ছুটি। শবে কদর বলেই। কাল সারারাত জেগে শবে কদরের নামাজ পড়েছেন মোমিন মুসলমানরা, আজ দিনে একটু ঘুমোবেন।

শরীফ ন'টার দিকে গোসলখানায় ঢুকতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ মাইকে কিছু ঘোষণার মতো শোনা গেল। কি আশ্চর্য, আমাদের গলিতে! সবাইকে যার যার বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল আর লাইসেন্স নিয়ে মেইন রোডে যেতে বলছে।

এ আবার কি ব্যাপার? শরীফ গেটের কাছে বেরিয়ে দেখল হোসেন সাহেব, ডাক্তার সাহেব, রশীদ সাহেব সবাই গেটের কাছে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। গলিতে দু'জন মিলিশিয়া পুলিশ। কারফিউয়ের মধ্যে বন্দুক, পিস্তল নিয়ে মেইন রোডে গেলে কারফিউ ভঙ্গ করার অপরাধে পড়তে হবে কি না এ নিয়ে সবার মনে ভয়। মিলিশিয়া দু'জন অভয় দিয়ে বলল, কারফিউয়ের মধ্যেই তো অর্ডার দেওয়া হয়েছে, ভয়ের কিছু নেই।

আমাদের একটা বারো বোর শটগান, একটা টুটু বোর রাইফেল আর একটা অ্যাশট্রা পিস্তল। শরীফ জামী এগুলো হাতে নিয়ে মেইন রোডের দিকে হাঁটা দিল সাড়ে ন'টায়। আমিও গেটের কাছে বেরিয়ে দেখলাম অন্য সব বাড়ি থেকে সবাই নিজের অস্ত্র আর লাইসেন্স হাতে নিয়ে গুটিগুটি চলেছে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে।

ওরা ফিরল—তখন প্রায় চারটে। খালি হাতে। অস্ত্র এবং লাইসেন্স দুই-ই রেখে দিয়েছে, শুধু কয়েকটা টুকরো কাগজে রসিদ দিয়েছে। শরীফের সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দুই চোখ লাল। গতকাল সারারাত জাগা, তারপর সারাদিন গোসল, বিশ্রাম কিছু নেই—অস্ত্র হাতে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা। শীতের রোদ হলেও রোজা রেখে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর। জামীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওর জ্বর এসেছে।

১৯ নভেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

সকলেরই মনের অবস্থা খুব খারাপ। দুঃখ, হতাশা, ভয়, ভীতি, নিষ্ফল ক্রোধ—সব মিলে আমাদেরকে যেন পাগল বানিয়ে ছাড়বে। শরীফের ওজন খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। আমারও কমেছে। তবে আমাকে নিয়ে নাকি ভয় নেই। আমি কাঁদি, হাহুতাশ করি, কথা বলি, মনের বাষ্প বের করে দেই। শরীফ এমনিতেই কথা কম বলে, এখন আরো কম—তার ওপর সে কাঁদেও না, হাহুতাশ করে না, মনের বাষ্প বের করার কোন প্রক্রিয়া তার ভেতর দেখি না। প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিপুণতায় সে তার সব কাজ করে

যায়—সকালে উঠে শেভ, গোসল, ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনা, তারপর অফিস, বিকেলে টেনিস, সন্ধ্যায় আবার স্বাধীন বাংলা বেতার, বন্ধু বান্ধব নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা—ওকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই দুঃখ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

শহরে একটি নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। বিহারিরা সবাই মাথা ন্যাড়া করে একটা লাল ফেটি বেঁধে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখাদেখি অনেক বাঙালিও। ন্যাড়া মাথা দেখলেই খানসেনারা ছেড়ে দেয়, তাই বোধ হয় অকারণ হয়রানির হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক ভীরু বাঙালি যুবকও মাথা ন্যাড়া করেছে।

রুমীর এনলার্জ করা ফটোটা দোকান থেকে এনেছি। বেশি বড় করি নি, মাত্র আট বাই দশ। ঐ মাপের একটা ফটোস্ট্যান্ডও কিনে এনেছি। ফটোটা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। কতোদিন দেখি নি ওই প্রিয়মুখ। এই কি ছিল বিধিলিপি? রুমী। রুমী। তুমি কি কেবলি ছবি হয়ে রইবে আমার জীবনে? তুমি গেরিলা হতে চেয়েছিলে, গেরিলা হয়েছিলে। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র পদসঞ্চারে আঘাত হানতে শত্রুকে, নির্ভুল লক্ষ্যে। শত্রুও একদিন নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনে, রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গেল তোমাকে। আর কি ফিরে পাবো না তোমাকে? তুমি যে সব সময় জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাষায় বলতে :

আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়/হয় তো মানুষ নয়—হয়তোবা শঙ্খচিল শালিখের বেশে/হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়/হয়তোবা হাঁস হবো—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়/সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে/আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে/জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।

রুমী, তোমাকে আসতেই হবে আবার ফিরে।

চোখ মুছে ছবিটার নিচে একটুকরো কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম : আবার আসিব ফিরে—এই বাংলায়। ফটোটা রাখলাম নিচতলায় বসার ঘরের কোণার টেবিলে। আগামীকাল ঈদ। অনেক মানুষ আসবে ঈদ মিলতে। তারা সবাই এসে দেখবে—রুমী কেমন কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করছে—আবার আসিব ফিরে—এই বাংলায়।

২০ নভেম্বর
শনিবার ১৯৭১

আজ ঈদ। ঈদের কোন আয়োজন নেই আমাদের বাসায়। কারো জামাকাপড় কেনা হয় নি। দরজা-জানালার পর্দা কাচা হয়নি, ঘরের ঝুল ঝাড়া হয় নি। বসার ঘরের টেবিলে রাখা হয় নি আতরদান। শরীফ, জামী ঈদের নামাজও পড়তে যায় নি।

কিন্তু আমি ভোরে উঠে ঈদের সেমাই, জর্দা রেঁধেছি। যদি রুমীর সহযোদ্ধা কেউ আজ আসে এ বাড়িতে? বাবা-মা-ভাই-বোন, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন গেরিলা যদি রাতের অন্ধকারে আসে এ বাড়িতে? তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য আমি রেঁধেছি পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কাবার। তারা কেউ এলে আমি চুপিচুপি নিজের হাতে বেড়ে খাওয়াবো। তাদের জামায় লাগিয়ে দেবার জন্য একশিশি আতরও আমি কিনে লুকিয়ে রেখেছি।

২৬ নভেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

ঘটনা যেন একটু দ্রুতই ঘটছে কিছুদিন থেকে। পূর্ব বাংলার চারধারে সবগুলো বর্ডারে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চাপ যতই বাড়ছে, ঢাকার কাগজগুলোকে 'ভারতীয় হামলার' খবর ততই বড় কলামে ছাপা হচ্ছে। ২৩ তারিখ সকালে দৈনিক পাকিস্তান খুলে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম। আট কলামজুড়ে বিরাট হেডলাইন : ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ।

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক মাস ব্যাপী ছোট ছোট হামলা, ছোট বড় সংঘর্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সুপরিকল্পিতভাবে বারোটি পদাতিক ডিভিশন মোতায়েনের পর এই হামলা চালানো হচ্ছে।

তাই বুঝি চারদিকে এমন সাজসাজ রব প'ড়ে গেছে। ২৪ তারিখে পাকিস্তান সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ঐদিনই সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ আর টঙ্গীসহ শহরের আশপাশের এলাকায় এক নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের সর্বত্র পরিখা যে খোঁড়া হচ্ছে, সে খবরটাও ছবিসহ কাগজে ফলাও করে দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিদিন বক্স করে কাগজে ছাপা হয়ে চলেছে বিভিন্ন আপ্তবাক্য। যেমন : 'যুদ্ধকালে নীরবতাই উত্তর আর বাচালতা বিষবৎ।' 'শান্ত থাকুন, নীরব থাকুন, আপনার গোপন কথা আপনার মধ্যে রাখুন।' 'গুজব তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের চাইতেও ক্ষতিকর।' ইত্যাদি।

যুদ্ধ-যুদ্ধ করে পাকিস্তান সরকার বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছে। কি করবে, কি না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। গতকালের কাগজে ঘোষণা দেখলাম পরপর সাতদিন সন্ধ্যায় একঘণ্টা করে নিষ্প্রদীপ মহড়া হবে। আজকের কাগজেই সেটা বাতিল করে নতুন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ২৪ তারিখ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় হঠাৎ কারফিউ দেওয়া হল। শরীফ আর জামী ঢাকা ক্লাবে টেনিস খেলতে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর শরীফের একটা মিটিংও ছিল ক্লাবে। হঠাৎ দেখি সোয়া পাঁচটায় বাপবেটা বাসায় এসে হাজির। কি ব্যাপার? না, কারফিউ সাড়ে পাঁচটা থেকে! সেই সময় আইডিয়াল লাইব্রেরি থেকে রিয়াজ সাহেব এসেছে বইয়ের লিস্ট নিয়ে। ঢাকা ক্লাব লাইব্রেরির জন্য বেশ কয়েকশো টাকার বই কেনা হবে। শরীফের মুখে কারফিউয়ের খবর পেয়ে ভদ্রলোক পড়িমরি করে ছুটলেন এলিফ্যান্ট রোডেই ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি। আর কি আশ্চর্য। রাত সাড়ে ন'টাতেই কারফিউ উঠে গেল! এসব কি তামাশা হচ্ছে?

গতকাল সাড়ে বারোটার দিকে আবার শোনা গেল—বেলা একটা থেকে কারফিউ! অমনি সবখানে সব লোকে অফিস-আদালত ছেড়ে, দোকানপাট বন্ধ করে ছুটল বাড়ির দিকে। শেষে আর কেউ রিকশাও পায় না। ওরাও তো ছুটছে বাড়ির দিকে। আমি এগারোটার দিকে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। সাড়ে বারোটায় ভাবলাম মা'র বাসা হয়ে তারপর ফিরব। রাস্তায় দেখি সব কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, খালি রিকশা ছুটে যাচ্ছে, সওয়ারীর হাঁকডাক কানে নিচ্ছে না। লোকজন প্রায় দৌড়ের মত ছুটে যাচ্ছে। আমি আর মা'র বাড়ি গেলাম না, গাড়ি ঘুরিয়ে চলে এলাম। কিন্তু খানিক পরেই শুনি কারফিউ নাকি দেওয়া হয় নি। ওটা মিথ্যে গুজব! মাইক দিয়ে সে কথা

ঘোষণা করা হল, রেডিওর বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে সেকথা প্রচার করা হল। কিন্তু তাতেও খালি জনপদ আর ভরে উঠল না! বেশ মজাই হল। একদিন সরকার বেটাইমে চার ঘণ্টার জন্য কারফিউ দেয়, পরদিন লোকে গুজবটাকেই সত্যি বলে ধরে নেয়। লোকের আর দোষ কি?

২৮ নভেম্বর
রবিবার ১৯৭১

জীবন যে কতো অনিশ্চিত, আক্ষরিক অর্থেই পদ্মপত্রে নীর—তা যেন এই সময়ই মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছি। কতো বছর ধ'রে কতো সুন্দর সুন্দর চাদর, ওয়াড়, তোয়ালে, প্লেট, গ্লাস, কাপ, ডিস, কাঁটাচামচ আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি, ভবিষ্যতে কখনো কোন বিশেষ উপলক্ষে বের করব বলে। রুমী-জামীকে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতাম, 'তোদের বউ এলে বের করব।' সেইসব বিশেষ উপলক্ষ আর কখনো আসবে কি? এখন যে প্রতিটি দিন বেঁচে রয়েছি, এটাই তো একটা বিশেষ ঘটনা। এর চেয়ে বড় উপলক্ষ আর কি হতে পারে? তাই আজ আলমারি খুলে সুন্দর সুন্দর চাদর, ওয়াড় বের করে সব ঘরের বিছানায় পেতেছি। দামী, সুদৃশ্য প্লেট, গ্লাস, কাপ, ডিস, কাঁটাচামচ সব বের করে টেবিলে রেখেছি। শরীফ-জামী অবাক চোখে তাকাতে হেসে বললাম, 'মরে গেলে সাত ভূতে লুটে খাবে তার চেয়ে নিজেরাই ভোগ করে যাই।'

আগামীকাল 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' দিবসের কথা ভেবে অনেকেই উদ্বিগ্ন। মিরপুর মোহাম্মদপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে এর প্রস্তুতি নিয়ে যেরকম জোশ দেখা যাচ্ছে তাতে বাঙালিরা অনেকেই ভয় পাচ্ছে। তাদের 'ভারত বিদ্বেষের' লাভা-স্রোতে ঢাকার বাঙালিরাও শেষমেষ তলিয়ে যায় নাকি, কে জানে? বহু অবাঙালির গাড়ির কাচে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' লেখা স্টিকার জ্বলজ্বল করছে। অনেক অবাঙালির দোকানে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' লেখা পোস্টার শোভা পাচ্ছে।

২৯ নভেম্বর
সোমবার ১৯৭১

যতটা ভয় পাওয়া গিয়েছিল, ততটা খারাপ কিছু ঘটে নি। সকাল থেকে গাড়ি-রিকশা-বাস চলে নি। দোকানপাট বন্ধ ছিল—অবাঙালিদের-গুলো জোশে, বাঙালিদের-গুলো ভয়ে। এগারোটার দিকে লুলুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আজিমপুরে এক বাসায় গেলাম। পথে দুটো মিছিল দেখলাম। উর্দু, ইংরেজিতে 'ভারত বিধ্বস্ত' করার বেশ কয়েকটা শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে মোহাম্মদপুরের দিক থেকে আসা মিছিল।

বারোটায় হরতাল শেষ। দেড়টার সময় বাসায় ফিরলাম রিকশা চড়ে।

মিছিল, মিটিং নাকি সন্ধ্যে পর্যন্ত চলেছে।

আজ থেকে ঠিক তিরানব্বই দিন আগে পাক হানাদাররা রাত বারোটার সময় এসে আমার রুমীকে ধরে নিয়ে গেছে।

ডিসেম্বর

সারা ঢাকার লোক একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে। স্বাধীনতার জন্য হাসি। কিন্তু হাসিটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। এত বেশি রক্তে দাম দিতে হয়েছে কান্নার স্রোতেও হাসি ডুবে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে।

১ ডিসেম্বর
বুধবার ১৯৭১

আজ খুব ভোরে উঠতে হয়েছে। আট-দশদিন হল কেরোসিন উধাও বাজার থেকে। কোন কোন দোকানে নাকি কেরোসিন নিয়ে মারপিটও হয়েছে। সরকার তাই কেরোসিনের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলেছে। বুড়া মিয়াকে সকাল বেলাতেই ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে মিরপুর রোডের ন্যায্য মূল্যের দোকানে পাঠিয়েছি লাইন দিতে। শেষ পর্যন্ত তেল পেলে হয়। আমার আর দু'দিন চলার মত তেল আছে।

শরীফ অফিসে যাবে ন'টায়। আমি ওর সঙ্গে যাব। আমার সঙ্গে যাবে লুলু আর জামী। শরীফকে মতিঝিলে ওর অফিসে নামিয়ে আমরা স্টেডিয়াম-বায়তুল মোকাররমে কিছু কেনাকাটা করব। আজ ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে আসতে বলা হয় নি। শরীফ অফিস পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর সেখানে থেকে আমি। যেতে যেতে গাড়ির ভেতর আলোচনা করে নিলাম কে কিভাবে কি কি কিনব। আমি প্রথমে দুটো সোয়েটার কিনব। তারপর আমি ঢুকব ওষুধের দোকানে। লুলু আর জামী আলাদা হয়ে অন্যদিকে অন্য দুটো ওষুধের দোকানে ঢুকে ওষুধ কিনবে। ওদের দু'জনকে দুটো প্রেসক্রিপসান দিলাম। ওরা ওষুধ কেনা শেষ করে দু'জনে দুটো আলাদা দোকান থেকে দুটো করে সোয়েটার কিনবে। তারপর গাড়ির কাছে যাবে। গাড়ি থাকবে স্টেডিয়ামে পাবনা স্টোরের সামনে।

এতসব ষড়যন্ত্রের কারণ গত সপ্তাহে এক সঙ্গে ছ'টা সোয়েটার কিনতে গিয়ে প্রায় ধরা প'ড়ে গিয়েছিলাম। জিন্না এভিনিউয়ে লম্বা ফুটপাত জুড়ে ছোট ছোট দোকানীরা চাদর বিছিয়ে তাদের দোকান সাজিয়ে বসেছে। ওদের কাছ থেকে মোটামুটি সস্তায় হাতকাটা সোয়েটার-মাফলার-মোজা এগুলো কিনতে শুরু করেছি সপ্তাহ খানেক থেকে। আগে শুধু ওষুধ, সিগারেট আর টাকা পাঠাতাম। এখন শীত এসে গেছে। গরম কাপড় দরকার। শরীফ বলেছে খুব ছোট ছোট প্যাকেট করতে। যাতে ছেলেদের নিতে সুবিধে হয়। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। তাই আমি খুব ছোট ছোট প্যাকেট করি—একটা সোয়েটার, একটা মাফলার, একজোড়া মোজা। অবশ্য মোজা যে খুব কাজে লাগে, তা নয়। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার জুতোই নেই। তবু মোজাও কিনি। মোজা দিই। অন্তত নিজেকে তো ভোলানো যায়—আমার ছেলেরা এই শীতে জুতো-মোজা পরে যুদ্ধ করছে।

গত সপ্তাহে একসঙ্গে ছ'টা সোয়েটার দর করছি, এমন সময় ফুটপাতে টহল দিতে দিতে এক মিলিটারি আমার পাশে দাঁড়িয়ে গেল, 'এত্‌না সুয়েটার খরিদিতা মা'জী? কেয়া, জওয়ান লোগোঁকে লিয়ে?'

আমার হৃৎপিণ্ড গলার কাছে লাফিয়ে উঠে এল, তবু মুখে হাসি টেনে বললাম, 'জি বাবা, আখবার মে বেগম লিয়াকত আলী কহা হ্যায় না—জওয়ান লোগোঁকে লিয়ে সুয়েটার, টাওয়েল, সাবুন, বিলেড, টফি, চুয়িংগাম—ইয়ে সব খরিদ করকে আপওয়া অফিস মে ভেজনা। আপ জান্‌তে হো, আপওয়া কিস্‌কা আপিস হ্যায়? উয়ো যো অল পাকিস্তান উইমেন্স এসোসিয়েশান—'

'অল পাকিস্তান' শব্দটার ওপর বেশ জোর দিয়ে বললাম। বেটা কি বুঝল জানি না, 'জরুর জরুর' বলে মাথা নড়তে নাড়তে চলে গেল।

আমার বুক ধড়ফড় করছিল। তবু ভাগ্যি, কয়েকদিন আগে খবর কাগজে বেগম লিয়াকত আলীর এই খবরটা দেখেছিলাম। আরো ভাগ্যি যে, কথাটা ঠিক সময়ে মনেও পড়েছিল।

সেদিন আমার আর সোয়েটার কেনা হয় নি।

২ ডিসেম্বর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সারাদিন বেরোই নি। গতকালকার কেনা জিনিসপত্রগুলো দিয়ে ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়েছি কিন্তু কেউ আসে নি কিছু নিতে। অবশ্য আজকেই কেউ আসবে, এমন কথাও তো কেউ দিয়ে রাখে নি। তবু ভেতরে ভেতরে কে যেন বলছিল, কেউ আসবে। আমার অনুমান সত্য হল না। আতিকুল ইসলামের সাথে ফোনে কথা হল দুপুরে। ওর কিছু ওষুধের প্যাকেট নিয়ে যাবার কথা ছিল। ও-ও জানাল বেশ কিছুদিন হয় ওর কাছেও কেউ আসছে না। আমি বললাম, 'অন্তত আমার কাছ থেকে প্যাকেটগুলো নিয়ে তোমার বাসায় রাখ। হঠাৎ এসে পড়লে যাতে দিতে পার।'

'আচ্ছা বুবু, তাই করব।' বলে ফোন রেখে দিল আতিক। কিন্তু আসে নি।

৩ ডিসেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

আজকেও কেউ আসে নি। না আসার কারণও একটা অনুমান করছি। দেশের আবহাওয়া বড়ই উত্তপ্ত। চারধারে বর্ডার ঘিরে যুদ্ধও বেশ জোরেশোরে লেগেছে। সবগুলো খবর কাগজে মোটা হেডলাইন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্তে 'ভারতের আক্রমণের' নিন্দাসূচক খবর ফলাও করে বেরোচ্ছে। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি'র খবর শুনে সব খবর চালাচালি করে বুঝে নিই মুক্তিবাহিনী কোথায় কতটা এগোচ্ছে, পাকবাহিনী কোথায় কতটা মার খাচ্ছে। শরীফ রোজ ইংরেজি বাংলা চার-পাঁচটা খবর কাগজের খবর বিশ্লেষণ করে। সে ক'দিন ধরেই বলে চলেছে, 'দ্যাখো না, ঢাকাতেও যুদ্ধ বাঁধলো বলে। রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, ফেনী, সিলেট—সব জায়গায় যেভাবে যুদ্ধ চলছে, তাতে মুক্তিবাহিনীর ঢাকায় ঢুকে পড়তে আর দেরি নেই।'

শরীর ভালো ছিল না। তাই রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। আমার দেখাদেখি বাড়ির অন্যরাও। রাত দুটোর দিকে হঠাৎ বিমান-বিধ্বংসী কামানের ট্রেসার মারার ফটাফট শব্দে জেগে গেলাম। কি হচ্ছে, ঠিক যেন বুঝতে পারছিলাম না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—শূন্যে আলোর ফুলঝুরি। বুঝলাম সারাদিন যে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা নিয়ে সবাই চনমন করেছে, তাই সত্যি হতে চলেছে। খুব উত্তেজনা বোধ করলাম মনের ভেতরে, সে অনুভূতি যেন ছড়িয়ে পড়ল শরীরেরও পরতে পরতে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে বাবার ঘরে গেলাম, সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে। উনি ঘুমোচ্ছেন, জামী জেগে খাটে বসে আছে। আমাকে দেখে নিঃশব্দে উঠে আমার সঙ্গে এ ঘরে এল। দুই ট্রেসারের অগ্নিঝলকের মধ্যবর্তী সময়টা কি নিকষ কালো। হঠাৎ খেয়াল হল, গভীর রাতে ঢাকা তো কখনো এত অন্ধকার থাকে না। রাস্তার বাতির জন্য

একটা আবছা আলোময় আভা ফুটে থাকে ঢাকার আকাশে। আজ কি হল? তখন লক্ষ্য করলাম, আমাদের বাসায় সামনের বাতিগুলো জ্বলছে না। পেছনের ঘরের জানালা দিয়ে বলাকা বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালাম, সেদিকেও কোন আলোর আভা নেই। তাহলে কি ব্ল্যাক আউট দেওয়া হয়েছে?

বাকি রাতটা আর ঘুম এল না। শরীফ, জামী, আমি তিনজনে বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন জানালা ও বারান্দাতে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম।

৪ ডিসেম্বর
শনিবার ১৯৭১

ছয়টা বাজতে না বাজতে ফকিরকে ফোন করলাম। এসব ব্যাপারে সে গেজেট। তার কাছে জানলাম : গত রাতেই ঢাকা রেডিওতে ব্ল্যাক আউটের কথা ঘোষণা করেছে। গতকাল বিকেল সাড়ে চারটেয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট, চাম্ব, লাহোর, রহিমইয়ারখান, পুঞ্জ, উরি সেক্টর—এসব জায়গায় স্থল ও বিমান আক্রমণ শুরু করে। সুতরাং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকেও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় সীমান্তবর্তী স্থানসমূহে পাল্টা আক্রমণ করতে হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও অবশ্য বলেছে, পাকিস্তানই প্রথম আক্রমণ করেছে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। তারা সুলেমানকি, খেমকারান, পুঞ্জ, অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, যোধপুর, আম্বালা, আগ্রা—এসব জায়গায় স্থল ও বিমান হামলা চালিয়েছে।

প্রথম আক্রমণ যেই করে থাকুক না কেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

তাহলে সত্যি সত্যি যুদ্ধ লেগেছে? প্রমাণও পেয়ে গেলাম সকাল একটু ফুটতে না ফুটতেই। ভয়ানক কড় কড় কড় কড় শব্দে দশদিগন্ত ঝালাপালা করে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে এয়ার রেইড সাইরেন বাজছে, রেডিওতে নানারকম ঘোষণা, সাবধানবাণী প্রচারিত হয়ে চলেছে।

আজ আর অন্য কোন কাজ নয়। রেডিও, টেলিফোন আর খবর কাগজ। রেডিও শুনছি আর একে একে ফোন করছি। একজনের কাছে পুরো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বিভিন্নজনকে ফোন করে টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করছি। কেউ আকাশবাণী শুনেছে, কেউ বিবিসি, কেউ রেডিও অস্ট্রেলিয়া, কেউ রেডিও পাকিস্তান।

গতকাল সন্ধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল মধ্যরাতের কিছু পরে এক বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানান যে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আজ এক বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়েছে যে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কে যে কার বিরুদ্ধে 'প্রথম' যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও 'যুদ্ধ' যে লেগেছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। জলজ্যান্ত প্রমাণ : ঢাকার আকাশে ভারতীয় বিমানের কর্ণবিদারী আনাগোনা।

ন'টার দিকে লুলু এল, উত্তেজিত গলায় বলল 'মামী কি যে অবাক কাণ্ড! এয়ার রেইড সাইরেন শুনে লোকে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে।'

আমি অবাক হলাম, 'সে কি? সাইরেন শুনে তো সিঁড়ির নিচে মাথা গুঁজে বসার কথা।'

'সবাই কি বলেছে জানেন, ইন্ডিয়ার প্লেন নাকি সিভিলিয়ানদের ওপর বোমা ফেলবে না। ওদের লক্ষ্য কেবল ক্যান্টনমেন্ট আর এয়ারপোর্ট। তাই সবাই 'যুদ্ধ দেখতে' রাস্তায় বেরিয়ে আসছে।'

জামী ছাদে গিয়েছিল, নেমে এসে বলল, 'কি অবাক কাণ্ড! চারদিকে সবগুলো বাড়ির ছাদে লোক বোঝাই। সবাই প্লেন দেখছে।'

লুলু চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনলেন মামী? শুনলেন? যা যা বলেছি, ঠিক কি না? সবাই যুদ্ধ দেখতে ছাদে দৌড়াচ্ছে, রাস্তায় নামছে।'

সত্যি, আজব ব্যাপার! আমিও সারাদিন ধ'রে রান্নাবান্নার ফাঁকে ফাঁকে আকাশযুদ্ধই দেখলাম। শরীফ আর জামী একবার বেরোতে চেয়েছিল, আমি দিই নি। যতই লোকে বলুক যে, ভারতীয় বিমান সিভিলিয়ানের ওপর বোমা ফেলবে না, তবু, অত উঁচু থেকে কি সিভিলিয়ান-মিলিটারি হিসাব করে বোমা ফেলা যায়? আমার একটি ছেলে পাক আর্মির খপ্পরে গেছে, বাকিটাকে আর বোমার ঘায়ে হারাতে চাই না। যুক্তি দিয়ে ওদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করলাম বটে কিন্তু আমি নিজেরই যে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে।

এই প্লেনের কড়কড়ানির মধ্যেই বুড়া মিয়া বাজার করে এনেছে। রান্নাঘরে গেলাম ওকে সাহায্য করতে। ও বেচারা আজ একা পড়ে গেছে। রেণুর মা, রেণু, কেউই আসেনি। বোধ হয় বাড়ি বসে সবার সাথে মজা করে প্লেন দেখছে। শরীফ আর জামী বাইরে যেতে না পেরে আবার ছাদে উঠে গেছে। রান্নার কাজ কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আমিও ছাদে গেলাম। আমাকে দেখে জামী উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মা মা, এমন একটা ডগ ফাইট হয়ে গেল না!'

'ডগ ফাইট কি?'

'ডগ ফাইট? ডগ ফাইট হল—মানে—দুটো প্লেন আকাশে একে অন্যের সঙ্গে ফাইট করে। রাস্তায় যেমন দুটো ছেলে মারামারি করে, সেই রকম আর কি! প্লেন দুটো একে অন্যকে জখম করে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।'

'তা আমাকে ডাকলি না কেন?'

'হুঁ! তোমাকে ডাকতে নিচে যাই আর ডগ ফাইটটা মিস্ করি আর কি!'

'তা কি হল শেষ পর্যন্ত? কে মরল?'

'কেউ না। পাকিস্তানি প্লেনটা না পেরে ভয়ে পালিয়ে গেল যে!'

এরপর ডগ ফাইট দেখার প্রত্যাশায় আমিও কয়েকবার ছাদে উঠলাম কিন্তু আর চোখে পড়ল না। কারণ ডগ ফাইট তো ঘনঘন হয় না। সব পাইলট করতে পারে না। খুব বেপরোয়া, দুঃসাহসী, জেদী পাইলটরাই জীবনবাজি রেখে ডগ ফাইটে লাগে। কারণ ঐ পাইলটরা জানে—প্লেন জখম হওয়া মানেই প্লেনে আগুন ধরে যাওয়া, আর প্লেনে আগুন ধরে গেলে সব পাইলট যে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে বের হতে পারবে, তারো কোন নিশ্চয়তা নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্লেনের সঙ্গে পাইলটও ধ্বংস হয়ে যায়।

তিনতলার ছাদে বারবার উঠতে হাঁপ ধ'রে যায়। শরীফ আর জামী কেমন সকালের নাশতাটা খেয়েই রেডিওটা বগলে করে, গুটিগুটি ছাদে উঠে গিয়েছিল। দুপুরে ভাত খেয়েও তাই করল। আমার তো হাজারটা কাজ—শ্বশুরের দেখাশোনা, তার ওপর বাল্বে কাগজের টোপর পরাতে হবে—কারণ 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্প্রদীপ পালিত হবে।'—খবর কাগজে সরকারি নির্দেশ। জানালার কাচে কাগজের ফালি আঠা দিয়ে সাঁটতে হবে, বোমা পড়লে যাতে

কাচ ভেঙে ছিটকে ঘরে ছড়িয়ে লোকজন জখম না করে। এসব কাজ কি একা হাতে করা সম্ভব? ওরা নামে না। ওদের স্বার্থপরতায় রাগ হয় কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না।

লুলু এসেছে। ভাত খাবার পর ওকে নিয়েই কাজে ডুবে গেলাম। ও রান্নাঘরে গিয়ে ময়দার লেই বানাল, আমি খবর কাগজের ফালি কাটলাম, তারপর দু'জনে মিলে বসার ঘরের জানালার কাচে সাঁটলাম। দেয়ালে বসানো র‍্যাকেট থেকে বাল্‌বগুলো খুলে শুধু দুটো সিলিং থেকে ঝোলানো বাল্‌ব রাখলাম। সেখানে পঁচিশ পাওয়ারের বাল্‌ব লাগিয়ে খবর কাগজের টোপর বানিয়ে পরিয়ে দিলাম। এসব কাজ শেষ হতে হতে দিনের আলো ফুরিয়ে এল। আজ আবার রেডিওতে বলেছে—সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফিউ, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া অবধি। লুলুকে বললাম, 'এখন বেরোন সেফ হবে না। আজ থেকে যা।' লুলু রাজি হল না, 'না মামী, ভাই-ভাবী তাহলে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। ফোনও নেই যে জানিয়ে দেব। ভাববেন না, কাছেই তো, ঠিক চলে যাব। এখনো খানিক দেরি আছে অন্ধকার হতে।' লুলু প্রায় দৌড়েই চলে গেল। ভূতের গলিতে ওর ভাইয়ের বাসা।

৫ ডিসেম্বর
রবিবার ১৯৭১

বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। চোখে দেখেন না বলে কানে শোনেন বেশি, অনুভূতি আরো বেশি। গতকাল থেকে বারবার বলছেন, 'তোমরা কি পাগল? এয়ার রেইড সাইরেনকে এভাবে উপেক্ষা করছ? একতলায় সিঁড়ির নিচের না গিয়ে ছাদে ছুটছ?'

সুতরাং আজ সকালেই শরীফকে বললাম, 'শোনো, আজ রোববার ছুটির দিন। একতলার সিঁড়ির নিচে সবার শোয়ার ব্যবস্থাটা আজই করে ফেলি। এখন তো যুদ্ধ কেবল শুরু, পরে সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। আমরা তো দরকার হলে দুদ্দাড় সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারব, বাবাকে তো নামানো যাবে না।'

অতএব, শরীফ জামীকে ছাদের মায়া ছেড়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য নিচে কাজ করতে হল। রুমী-জামীর সিঙ্গল খাট দুটো নিচে নামিয়ে পাশাপাশি পাতা হল, সিঁড়ির নিচে। বেশ চওড়া বিছানা হল, ওপাশে দেয়ালের দিকে বাবা, তারপর শরীফ, এ পাশে আমি থাকব—এই রকম ঠিক হল। বসার ঘরের ডিভানটা টেনে এনে খাটের মাথার কাছে কোণাকুনি পাতা হল—ওটায় জামী।

খাবার টেবিলটা আগে মাঝখানে ছিল, এখন ওটাকে সরিয়ে ঘরের অন্য পাশের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হল। আগের সেই তক্তপোশটা সরিয়ে দিয়ে এখানে পাতা হল বাবার ইজিচেয়ারটা।

এগুলো করতে প্রায় দুপুর। গতকালই দু'দিনের মত বাজার করে বুড়া মিয়া সব রেঁধে রেখেছে। গত তিন-চার মাস থেকে এরকমই করা হয়। ফ্রিজে প্রচুর রান্না করা খাবার থাকে। কারণ প্রায় প্রায়ই 'অনাহূত' (কিন্তু অতি-বাঞ্ছিত) অতিথি এসে পড়ে। আমরা জানি, তারা দিনে রাতের যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে। এসে পড়লে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে পেটভরে খাইয়ে দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। তাই ফ্রিজে সব সময় রান্নাকরা খাবার মজুত, মিটসেপে বিস্কুট, রুটি, মাখন, পনির।

সিঁড়ির নিচের কাজ শেষ হবার আগেই বলে নিলাম এখন আর ছাদে উঠো না। গোসল করে খেয়ে নাও।

ওরা বিনা বাক্যে আমার কথামত কাজ করল। ওরা আজ আমাকে একটু বেশি মান্য করছে। গতকাল রাত থেকেই আমার মন মেজাজ খুব খারাপ পাড়ার বিহারি পাহারাদারের গাল খেয়ে। গাল সে সবাইকে দিয়েছে। আমার যেন বেশি লেগেছে মনে হচ্ছে।

খেতে বসেছি, এমন সময় লুলু এল। এসেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বুড়া মিয়া একটা প্লেট নিয়ে এল। তাকে আজকাল বলতেও হয় না। সে জানে।

খেতে খেতে বললাম, 'লুলু, কাল যে এত খাটলাম কাজে লাগল না। এই খবরের কাগজের শেডে হবে না। কালরাতে পাহারাদার চেঁচিয়েছে বাতির আলো বোঝা যাচ্ছে দেখে।'

লুলু বলে উঠল, 'ও তো বাতির আলো বুঝবেই। নিয়মটা হল শেড না থাকলে যে আলোটা জানালা গলিয়ে মাটিতে পড়বে সেইটা ঢাকতে হবে। কারণ প্লেন থেকে সেইটা বোঝা যায়। শেডে পরানোর পর বাইরে আলো না পড়লেই হল। জানালার বাইরে মাটিতে দাঁড়িয়ে পাহারাদার বেটা ঘরের ভেতর বাতির আলো বুঝলে ক্ষতি তো নেই।'

'সেটা ঐ পাকিস্তানের খয়ের খাঁ পাহারাদারকে বোঝাবে কে? কাল বোঝাতে গেছিলাম, বহুত গালমন্দ করেছে। সে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চায়।'

লুলু খানিকক্ষণ নীরবে ভাত খেল, তারপর বলল, 'নিউ মার্কেটে কালো মোটা ড্রয়িংশিট পাওয়া যায়, কিন্তু দাম যে বড্ডো বেশি।'

আমি শক্ত মুখে বললাম, 'হোক বেশি। ঐ কুত্তাদের গাল শুনতে পারব না। খেয়ে উঠে চল নিউ মার্কেটে যাই।' জামী এতক্ষণে মুখ খুলল, 'অলক্লিয়ার সাইরেন দেয় নি কিন্তু এখনো।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'না দিক, আমি এর মধ্যেই বেরোব।'

খুব মোটা কুচকুচে কালো ড্রয়িংশিট কিনে আনলাম একগাদা। পুরো একেকটা শিট গোল করে সুইসুতো দিয়ে দুই প্রান্ত সেলাই করে লম্বা চোং বানিয়ে বাল্‌বের গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। বাতি এবার জানালার বাইরে থেকে বোঝা তো দূরের কথা, ঘরের মেঝেতেই পড়ে কি না সন্দেহ। কাচের জানালাতেও বড় বড় শিট ছোট বোমাকাঁটা ঠুকে এঁটে দিলাম। এত মোটা শিট, আঠাতে শানাবে না।

সন্ধ্যার পর জানালা বন্ধ করে বাতি জ্বালালাম। বাল্‌বের ঠিক নিচে মেঝেতে চোঙের মাপে গোলাকার একটা আলোর চাকতি; কিন্তু কালো শিট যেন সব আলো শুষে নিয়েছে। এর চেয়ে মোমবাতি জ্বাললে যে বেশি আলো হয়! শরীফ, জামী একে একে বাইরে গিয়ে দেখে এসে রিপোর্ট দিল—একদম আঁধার। এবার পাহারাদারকে আমাদেরই গাল দেওয়া উচিত।

৬ ডিসেম্বর
সোমবার ১৯৭১

সকালে বুড়া মিয়া আর রেণুকে দিয়ে রেশন আনিয়ে দশটায় যেই মা'র বাসায় যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, অমনি বিপদ সঙ্কেত সাইরেন। শরীফ, জামী পড়িমরি ছাদে ছুটল। বাবা অস্থির হয়ে কি সব বলছেন, কান না দিয়ে আমিও আস্তে আস্তে ছাদে দিকে পা বাড়ালাম। রেণুকে ডেকে বলে গেলাম, 'অ্যাই রেণু। দাদার কাছে বসে থাক।'

একতলায় আসার পরও বাবা অস্থিরতা কমে নি। দোতলায় নিজের বিছানা, নিজের ইজিচেয়ার, পাশেই সংলগ্ন বাথরুম—সব জায়গা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, অনকে সময়

একাই দেয়াল ধরে ধরে বাথরুমে যেতে পারেন। আমরা যদিও যেতে দিই না, সব সময়ই কেউ না কেউ ওঁকে ধরি, তবু উনি যে একা পারেন, সেটাই ওঁর মস্ত মনস্তাত্ত্বিক জোর। একতলার বাথরুমটা খাবার ঘর পেরিয়ে ভেতরের বারান্দা পেরিয়ে গেস্টরুমের পাশে। প্রতিবারই ওঁকে হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে যাত্রাপথ ও বাথরুমের অবস্থান বোঝাতে হয়, তবু জায়গাটা ওঁর চেনা হচ্ছে না। এ কারণেই মনে মনে বেশ অস্থির হয়ে রয়েছেন। কিন্তু কি করা? আমাদেরও নিজের ঘর, নিজের বাথরুম ছেড়ে নিচে খুব একটা স্বস্তি লাগছে না। তবে সবকিছু একতলার এই খাবার ঘর ও সিঁড়ির নিচে হওয়াতে একটা সুবিধে হয়েছে, স-ব হাতের কাছে। বেশ কমপ্যাক্ট ভাব। আবার অসুবিধেও আছে। সব রকম আলোচনা করার যে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা ছিল খাবার টেবিল, সেখানে বসে এখন বাবার কান বাঁচিয়ে কথা বলা যায় না। ফিসফিস করলে সন্দেহ করেন। ওঁকে আবার সব কথা বলাও যায় না। হাই ব্লাড প্রেসার!

তাই নিচের আসার পর থেকে দেখছি খাওয়া শেষ হতে না হতে বাপবেটা বসার ঘরের দূরতম কোণায় চলে যায়। আমি সবসময় হাতের কাজ ফেলে ওদের সঙ্গে গিয়ে বসতে পারি না। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই কান খাড়া করে ওদের আলাপ-আলোচনায় অংশ নেবার চেষ্টা করি।

সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার জন্যও আমরা বসার ঘরে চলে যাই। বাবাকে বলি, মেহমান এসেছে। খুব অল্প ভলিউমে বেতারের কথা শুনি। বাবা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে ভাববেন, মেহমানরা কথা বলছে। তখন আমরাও কিছু কথাবার্তা বলতে পারি।

আজ দুপুরে আকাশবাণীর খবরে জানলাম ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শরীফ দুপুরে অফিস থেকে ফিরেই গত কয়েকদিনের একগাদা খবর কাগজ নিয়ে খাবার টেবিলে বিছিয়ে বসল। আমি বাবার গোসল, খাওয়া তদারকির ফাঁকে ফাঁকে দেখছি, বাপবেটা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন কাগজ উল্টেপাল্টে কি কি যেন দেখছে, তারপর কি সব যেন একটুকরো কাগজে লিখছে, আবার খবর কাগজ দেখছে, আবার লিখছে।

বাবার খাওয়া শেষ হলে ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খাবার টেবিলের কাছে এলাম, 'এবার তোমাদের কাগজপত্র গোটাও। খাবার লাগাব, দুটো বাজে। কি করছ এগুলো?'

কাগজপত্র গোটাতে গোটাতে শরীফ গলার স্বর নিচু করল, 'খাবার পর সব বলব।'

কোনমতে নাকেমুখে গুঁজে খেয়ে উঠেই ওরা দু'জন বসার ঘরে দূরতম কোণে গিয়ে আবার ঐ কাগজপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আজকাল রেণু, তার মা বারোটা-একটার মধ্যে আগাম ভাত-তরকারি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। আমি টেবিল সাফ করতে করতে ওদের কথাবার্তার দিকে কান খাড়া রাখলাম।

জামীর উত্তেজিত গলা একটু চড়ে গেল, পরিষ্কার শুনতে পেলাম, 'তাতো বুঝলাম, কিন্তু আর্মস আসবে কোত্থেকে?'

আমি কাজ ফেলে ওদিকে চলে গেলাম। শরীফ জামীকে বলছে, 'আর্মস ঠিক সময়ে এসে যাবে।'

আমি ওদের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। 'কিসের আর্মস? কি জন্য? আমাকে একটু বল না।'

'তোমাকে তো বলতেই হবে। জামী আর আমি হিসাব করছিলাম আর ক'দিন আন্দাজ লাগতে পারে ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর এসে পৌঁছোতে। তখন কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখনকার জন্য তৈরি হতে হবে এখন থেকেই।'

আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল, 'রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ?'

শরীফ জ্বলজ্বলে চোখে বলতে লাগল, 'মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ক'টা দল বিভিন্ন দিক দিয়ে ঢাকার পানে এগোচ্ছে। ক'দিনের মধ্যেই তারা ঢাকায় ঢুকবে। তখন আমরা যারা শহরের মধ্যে আছি, আমাদেরকে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াং ছেলেরা ওদের সঙ্গে যোগ দেবে স্ট্রিট ফাইটে, আমরা যোগান দেব খাবারের, ওষুধের, চিকিৎসার। তুমি এখন থেকেই চাল, ডাল, আলু, বিস্কুট এসব কিনে রাখতে শুরু কর। একসঙ্গে বেশি কিনবে না, দফায় দফায়, একটু একটু করে—যাতে লোকে সন্দেহ না করে। ওই সঙ্গে টিংচার আয়োডিন, বেঞ্জিন, তুলো, ব্যান্ডেজের কাপড়।'

আমি হাসলাম, 'এসব জিনিস এমনিতেই কম কেনা হয় নি। গেস্টরুমে টাল লেগে আছে। সোয়েটার, মাফলার, মোজা, ওষুধপত্রও তো আর কেউ নিতে এল না। সব প'ড়ে রয়েছে।'

'প'ড়ে থাকবে না, প'ড়ে থাকবে না। ঢাকায় কতোদিন যদ্ধ চলবে, কে বলতে পারে? তোমার সোয়েটার, মোজা, মাফলার, ওষুধপত্র সব কাজে লেগে যাবে, দেখো।'

হঠাৎ আকাশ থেকে প্লেনের ভীষণ কড়্ কড়্ শব্দে বাড়িঘর যেন ঝনঝন করে উঠল। এত নিচু দিয়ে প্লেন যাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে শরীফও কথা বন্ধ করে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিল। যেন সব আলাপ-আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জামীও। আমি কোমরে দুই হাত চেপে ওদের দিকে কটমট করে তকিয়ে রইলাম।

৭ ডিসেম্বর
মঙ্গলবার ১৯৭১

বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে।

নয়াদিল্লী, ছয়ই ডিসেম্বর। এপিপি/রয়টার

ভারত আজ বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের খবরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ। একটি স্বাধীন জাতি। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। রুমী এখন কোথায়? তাকে পাক আর্মি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে, এটা সমর্থিত খবর। কিন্তু তাকে মেরে ফেলেছে কি না এটার কোনো সমর্থিত খবর তো আজো পাই নি। পাগলাপীর বলেন রুমী বেঁচে আছে। পাগলাপীরের কাছে যারাই যায়—মোশফেকা মাহমুদ, মাহমুদা হক, ঝিনু মাহমুদ, রাঙামা, নুহেল-দীনু-খনু-লীনু, শিমুল, জেবুন্নেসা, জাহাঙ্গীর, নাজমা মজিদ সবাইকেই পাগলা বাবা ঐ একই কথা বলেন, 'আছে, আছে, তোর স্বামী বেঁচে আছে। তোর ছেলে মরে নি। তোর ভাই শিগগিরিই ফিরে আসবে।'

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল মামুন মাহমুদ, শাহ আবদুল মজিদ, শামসুল হক, আলতাফ মাহমুদ, রুমী, জাহাঙ্গীর, বদি, জুয়েল, আজাদ, বাশার, বাকের—ওরা আজ কোথায়? সবাই বলে পাগলা বাবা খুব শক্তিশালী পীর, নিশ্চয় তার কথা সত্য হবে। ওরা যদি সত্যি সত্যি বেঁচে থাকে তাহলে যে যেখানে আছে, এখানে কি গতকাল রেডিওর খবর শুনতে পেয়েছে? আজকের কাগজ দেখতে পেয়েছে? ওরা কি জেনেছে পৃথিবীর অন্তত একটি দেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে? যাদেরকে গাদ্দার ব'লে, কাফের ব'লে, পাকিস্তানিরা পিঁপড়ের মতো পিষে মারছে, তাদেরকেই একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে পৃথিবীর অন্তত একটি দেশ? এটা কি ওরা জানতে পেরেছে?

আর যদি ওরা সবাই শহীদ হয়ে থাকে, তাহলে কি ওদের আত্মা জানতে পেরেছে এই খবর? জেনে কি শান্তি পেয়েছে ওদের আত্মা?

কাগজের ওপর মাথা নুইয়ে আমি কি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম? জামী এসে আমাকে ধরে তুলল। তুলে আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিল, 'জান মা, আর দেরি নেই। খুব শিগগিরই ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ঢুকবে। তবে যুদ্ধটা বড় সহজ হবে না। ঢাকায় পাক আর্মির ঘাঁটি তো কম শক্ত নয়। জান মা আমি আর আলী না, আজিমপুর কলোনির ওখানে ডিউটি পাব। আব্বুকে বলেছি, আমাকে আর আলীকে যেন দুটো চাইনিজ স্টেন দেয়। ভাইয়ারা আগস্টে ঢাকায় অ্যাকশান করে বাসায় যে স্টেনগুলো এনেছিল, তোমার মনে আছে মা? কি সুন্দর ঝকঝকে অথচ ছোট্ট দেখতে অস্ত্রগুলো। ওর মধ্যে চাইনিজ স্টেনটাই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। ভাইয়াও কিন্তু একটা চাইনিজ স্টেনের জন্য পাগল ছিল। ওদের দলের মধ্যে কেবল আলম ভাইয়েরই একটা চাইনিজ স্টেন ছিল, আর কারো ছিল না। ভাইয়া না, সুযোগ পেলেই আলম ভাইয়ের স্টেনটা নাড়াচাড়া করত।'

জামীর উদ্দেশ্য সফল হল। আমার চোখ থেকে পানি পড়া বন্ধ হল। বললাম, 'মায়ের বাসায় যেতে হবে। ওঁদের বাজার নেই। বুড়া মিয়া আজ বাড়ি যাবে, তাই বেশি করে বাজার করিয়েছি।'

'চল দিয়ে আসি।'

রান্নাঘরে গিয়ে বুড়া মিয়াকে বললাম, 'তুমি রান্না শেষ করতে করতে আমি এসে যাব। মায়ের বাজারটা দিয়ে আসি।'

ধানমণ্ডি ছ'নম্বর রোডে মা'র বাসায় বাজার দিয়ে দু'চারটে কথাবার্তা বলে বাড়ি ফিরে আসতে না আসতে এক পশলা আকাশযুদ্ধ হয়ে গেল। এরকম আকাশযুদ্ধ শুরু হলেই রাস্তাতে লোকজন, গাড়িঘোড়া সব দাঁড়িয়ে যায়। এয়ার রেইড সাইরেন আর অল ক্লিয়ার সাইরেনের তফাৎটা লোকে ভুলে গেছে মনে হয়। সবাই ঊর্ধ্ব মুখে চেয়ে দেখে।

আজ একটা ব্যতিক্রম দেখলাম। আর্মির লোক রাস্তায় দাঁড়ানো ঊর্ধ্বমুখ লোকজনকে গালাগালি করছে। মনে পড়ল আজকের দৈনিক পাকিস্তানে 'বিমান হামলাকালে বাইরে থাকা নিজেদের জন্যই বিপজ্জনক'—এই শিরোনামে একটা খবর দেখেছি বটে। আহা, বাঙালিদের জন্য ওদের কি মায়া। ভারতীয় বিমানের বোমায় বাঙালি মরলে ওদের কত যে কষ্ট হবে, তাই রাস্তার লোক পিটিয়ে ওদের নিরাপত্তার সুরক্ষা করছে।

বাসায় এসে বুড়া মিয়াকে ছুটি দিলাম। বারবার করে বললাম, 'ঠিক দু'দিন পরে চলে এসো কিন্তু বুড়া মিয়া। দেখছই তো অবস্থা, এদিকে অন্ধ শ্বশুর, ও বাড়িতে মা একলা।'

বুড়া মিয়া তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আল্লা ভরসা।'

৮ ডিসেম্বর
বুধবার ১৯৭১

আজ আবার রেডিওতে বলল, সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউট—পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত। ছিলইতো বাপু সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফিউ, আবার নতুন করে এত ঘোষণা দেবার কি আছে? সন্ধ্যাও আজকাল পাঁচটাতেই হয়। এদের দেখছি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের মতো হয়েছে।

আজ রেণু নিজে থেকেই এখানে রাতে থেকে যাবার কথা বলল। বুড়া মিয়া নেই, রেণুকে থাকবার কথাটা বলব বলব ভাবছিলাম, ছোট মেয়ে থাকতে পারবে কি না, তাও ভাবছিলাম, এখন ওর দিক থেকেই আগ্রহ দেখে স্বস্তি পেলাম। রেণুর বয়স আট-নয় বছর হলে কি হবে, কাজে ও পনের-ষোলদের হারিয়ে দিতে পারে। আমি খুব খুশি মনে আমাদের খাটের পায়ের দিকে আমার বিশ্রাম করার সেই চৌকিটা আবার এনে পাতলাম। রেণুর শোবার জন্য। উঃ। বাঁচা গেল। রেণু থাকা মানেই বাবার জন্য কোন দুশ্চিন্তা রইল না। আমি যখন-তখন দৌড়ে ছাদে যেতে পারব।

আজ সকাল সাড়ে আটটাতেই একবার আকাশযুদ্ধ হয়ে গেছে।

৯ ডিসেম্বর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আমাদের চেনাজানা প্রায় সবাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে রাখছে। আর ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কে জমা রেখে তার বদলে নগদ টাকা 'ধার' নিচ্ছে। সবাই বলছে, কখন কি হয়, শেষে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারি কি না। ব্যাটাদের দিন তো ঘনিয়ে এল। হয়তো বা যাবার আগে ব্যাঙ্কের সব টাকাও জ্বালিয়ে দিতে পারে, প্লেনে করে ওদিকে নিয়েও যেতে পারে। তার চেয়ে যতটা পারা যায় নগদ টাকা কাছে থাকুক।

কিন্তু এত নগদ টাকা ঘরে রাখাও তো খুব সহজ নয়। যে কোন সময় পাক আর্মি বাসায় ঢুকে সার্চ করে নিয়ে যেতে পারে। বাড়ির চাকরেও নিয়ে পালাতে পারে। তাই অনেকেই টাকা বয়ামে বা কৌটোয় ভরে মাটিতে পুঁতে রাখছে।

শরীফও তার সবগুলো ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা 'ধার' নিয়েছে। তাছাড়াও চার দফায় পাঁচ হাজার করে মোট বিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়েছে। দশ হাজার অফিসের সেফে রেখেছে, দশ হাজার বাড়িতে এনেছে। আমি টাকাগুলো ছোট ছোট বান্ডিলে চালের বস্তার ভেতরে, জুতোর বাক্সের তলায়—এরকম সব জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। অন্যদের মতো মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে পোঁতার হাঙ্গামা আর করতে ইচ্ছে হয় না।

তাছাড়া এসব টাকা তো কয়েকদিন পরে কাজেই লেগে যাবে, রাস্তাযুদ্ধ শুরু হলে।

দুপুরে ভাত খেতে খেতে শরীফ বলল, 'আজ বাঁকারা ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে উয়ারী চলে যাচ্ছে।'

'কেন ?'

'উয়ারীতে মিসেসের এক বোন থাকেন, সেখানে থাকবে। ধানমণ্ডির বাড়ির পুরো পেছনটা তো ই.পি.আর-এর এলাকা। ওখানে একটা এন্টি এয়ার ক্র্যাফট গান বসানো আছে।'

'তার জন্যে ?'

'ওটার জন্যই বাঁকাদের বাড়িটা আমাদের দরকার হবে। তাই ওকে বলেছিলাম অন্য কোথাও সরে যেতে।'

জামীর দু'চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। সে রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলল, 'আব্বু আমাকে আর আলীকে বাঁকা চাচার বাড়িতে—'

শরীফ হেসে ধমক দিল 'চো-প! ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করছ। তোমরা আজিমপুর কলোনির তিনতলার ছাদে পজিশন নেবে। যোদ্ধারা কখনো অর্ডার অমান্য করে না।'

আমার সারা শরীর শিরশির করছে। কারফিউ মোড়া এই অবরুদ্ধ শহরে ব্ল্যাকআউটের কালো কাগজ মোড়া এই কবরের মত ঘরে বাস করতে করতে, স্বাধীন বাংলা বেতার আর চমপত্র শুনে শুনে কোনমতে মনোবল খাড়া রাখি। যতই দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে আর পারছি না। এর মধ্যেও এ ধরনের যুদ্ধের প্রস্তুতির কথাবার্তা নিঃসন্দেহে সারা শরীরে জীবনীশক্তি প্রবাহিত করে দিচ্ছে।

১০ ডিসেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

বুড়া মিয়ার আজ ফেরার কথা কিন্তু এখনো ফেরে নি। ড্রাইভারকে দিয়ে বাজার করিয়ে রেণুর মাকে কুটতে বসিয়ে দুই হালি ডিম আর এক শিশি গ্লিসারিন নিয়ে মা'র বাসায় গেছি। সেখান থেকে জুবলীর বাসা হয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে বাসায় ফেরার পথে লক্ষ্য করলাম বহু লোক রিকশায়, বেবিতে বোঁচকা-বুঁচকি, সুইকেস নিয়ে চলেছে। অনেকে ঘাড়ে-মাথায়-হাতে পুঁটলি নিয়ে হেঁটেও যাচ্ছে। কি ব্যাপার! আরেকবার লোকজন ঢাকা ছাড়ছে নাকি?

বাসায় ঢুকতেই দেখি ঘর ভর্তি করে মেহমানরা বসে আছেন—ফকির, আমীর হোসেন, বাবলু, চান্মু, হোসেন সাহেব, ডাঃ এ.কে.খান। সবার মুখে একই আলোচনা—গতকাল ও পরশু রাতে তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও এতিমখানায় যে বোমা পড়েছে, তা নাকি ইচ্ছাকৃত সেমসাইড।

আমি বললাম, 'রাস্তায় দেখলাম লোকজন সব ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

এ.কে. খান বললেন, 'ঢাকায় জোর গুজব, মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ঢাকার সিভিলিয়ানদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বলছে—এখানে নাকি খুব ফাইট হবে?'

আমীর হোসেন বললেন, 'কই আমি তো শুনিনি...'

হোসেন সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কিছু বলেছে এ বিষয়ে?'

'সে রকম ঘোষণার মত করে বলে নি। তবে কথিকায়, চরমপত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে।'

'ঢাকার অবস্থাও খুব ভালো নয়। কাল থেকে তো সব স্কুল-কলেজ বন্ধ দিয়ে দিয়েছে।'

—'তাই নাকি?'

'কেন, আজকের কাগজে দেখেন নি? সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা।'

—'অবস্থা তাহলে সত্যি কুফা?'

আলোচনা চলতেই থাকে। আমি চা বানিয়ে নাশতা ধরি মেহমানদের সামনে। প্রায় দুটো বাজে। কারো ওঠার নাম নেই।

রেণুর মা অস্থির হয়ে উঠেছে বাড়ি ফেরার জন্য। ওর বাড়ি সেই কামরাঙ্গীর চরে। হেঁটে যেতে যেতেই বেলা ফুরিয়ে আসবে।

বসার ঘরে তর্কমুখর মেহমানদের রেখে আমি রান্নাঘরে গেলাম রেণুর মাকে আগাম ভাত বেড়ে দিতে।

১১ ডিসেম্বর
শনিবার ১৯৭১

বুড়া মিয়া আজো ফেরে নি। রেণু একরাত থেকেই আবার বাড়ি চলে গেছে, ফলে কাজের চাপ পড়ে গেছে বড্ডো বেশি। শরীফ-জামী আগে ঘরের কাজে বেশ সাহায্য করত, চার তারিখ থেকে ওরা দু'জন একদম বদলে গেছে। খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া প্রায় সবসময়ই ছাদে। অফিসে যাওয়ার সময়ও অনিয়মিত হয়ে গেছে চার তারিখের পর থেকে।

বুড়া মিয়া সব সময় কথা ঠিক রেখেছে। এবার আর পারল না দেখছি। যা পরিস্থিতি দেশের, তারই বা কি হয়েছে কে জানে!

আমি রোজই কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, আটা, চিনি, সুজি, বিস্কুট—অল্পে অল্পে বিভিন্ন দোকান থেকে কিনে কিনে গেস্টরুমটায় টাল করছি।

আজ হঠাৎ বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে কারফিউ! না জেনে নিশ্চিন্তে বাজার করে পৌনে চারটেয় বাসায় ফেরার পথে দেখি লোকজন, রিকশা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে!

কি যে উল্টোপাল্টা সব কারবার আরম্ভ হয়েছে। কখন কারফিউ দিচ্ছে আর কখন তুলছে কোনো মাথামুণ্ডু নেই। আর মাথা ঠিক থাকে কি করে? দেশের সবখানে যা অবস্থা! আজকের দৈনিক পূর্বদেশে একটা খবর পড়লাম : লাকসাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, হালুয়াঘাট, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনায় প্রচণ্ড লড়াই।

এটা হল একটা হেডিং। এর চেয়ে ডবল মোটা হেডিং দিয়ে এর নিচেই আবার লেখা : স্থলে-জলে অন্তরীক্ষে হানাদার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

পড়ে খানিকক্ষণ একা একা হাসলাম। এই হানাদার বাহিনী, কোন হানাদার বাহিনী, বুঝতে আর বাকি নেই। তাইতে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

১২ ডিসেম্বর
রবিবার ১৯৭১

আজ সারা দিন কারফিউ ওঠে নি। আজো কিছু কেনাকাটা করতে বেরুবো ভাবছিলাম, তা আর হলো না। এয়ার রেইড সাইরেন অগ্রাহ্য করে রাস্তায় বেরোনো যায়। কিন্তু কারফিউ থাকলে সবাই নাচার।

যেন খুব একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, এমন একটা ভাব করে শরীফ-জামীর দিকে চেয়ে বললাম, 'এই সুযোগে গেস্টরুমটা গুছিয়ে ফেলি।' ওরা রেডিও বগলে সিঁড়ির দিকে মুখ করেছিল, আমার কথায় আবার ঘুরে দাঁড়াল। ওদের নিয়ে আমি গেস্টরুমের তালা খুলে ঢুকলাম। এটা অবশ্য এখন স্টোররুম—কেউ বেড়াতে এসে হঠাৎ যাতে এ ঘরে এত জিনিসপত্র দেখে না ফেলে, তার জন্য তালা। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি সব জিনিসই এখনো ছোট ছোট চটের থলে, কাগজের ঠোঙ্গা, পলিথিনের ব্যাগে রয়েছে, তুলো, ব্যান্ডেজ, ডেটল, এস্পিরিন আরো অন্যান্য ওষুধ সব ছোট ছোট বাদামী প্যাকেটে। শরীফ সারা ঘরের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'এসব গুছিয়ে রাখা ঠিক নয়। এভাবেই ক্যামাফ্লেজড হয়ে থাকা ভালো, হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে যেন টের না পায়!' বলেই অ্যাবাউট টার্ন করতে উদ্যত হল। আমি খুব মিষ্টি করে তীক্ষ্ণ গলায় বললাম, 'ঠিক আছে, কিন্তু এমার্জেন্সির সময় চট করে যাতে ঠিক

জিনিসটি তুলে নিতে পারি, তার জন্য একটু সিজিল করে রাখা উচিত নয় কি? ধরো গুরুতর জখম একটা মুক্তিযোদ্ধাকে ব্যান্ডেজ করতে হবে, তখন যদি এই একশোটা প্যাকেটের মধ্যে তুলো খুঁজতে পনের মিনিট লেগে যায়...'

জামী একলাফে আমার পাশে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'প্রমিস করছি মা, সন্ধ্যাবেলা স-ব প্যাকেট সিজিল করে দেব। এখন তুমিও চল ছাদে, কেন কারফিউ ওঠায় নি আজ, সেটা ছাদে না গেলে টের পাওয়া যাবে না।'

আমি ভেঙচে উঠলাম, 'তুমিও চল ছাদে! দাদাকে একা ফেলে—'

জামী বেশ সাহসী আর একটু কুটকচালে হয়ে উঠেছে আজকাল। আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে খাবার ঘরের দিকে নিতে নিতে গলা চড়িয়ে বলল, 'দাদা, খানিকক্ষণ একা বসে থাকুন। মাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি—আলমারি খোলাতে হবে। আব্বু বাথরুমে গেছে।' (আব্বু পাশেই দাঁড়িয়ে।)

বাবা চুপ করে খাটের পাশের ইজিচেয়ারে পড়ে রইলেন। তিনিও এ কয়দিনে বাড়ির সবার হালচাল বুঝে গেছেন। সেদিন ছেলে ও নাতিকে এয়ার রেইড প্রিকশানের কথা বোঝাতে গিয়ে নিজেই যেন অন্যরকম বুঝে গেছেন। আর কাউকে কিছু জিগ্যেস করেন না।

আমি ওদের দু'জনের সঙ্গে ছাদে গেলাম বটে, কিন্তু খানিক পরেই নিচে নেমে এলাম। বাবাকে সত্যি সত্যি তো বেশিক্ষণ একা ফেলে রাখা যায় না।

তবু বাবাকে দেখা ও রান্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আজ বহুবার ছাদে গেলাম।

এয়ারপোর্টের দিকে দেখা যাচ্ছে তিনটে প্লেন বারবার করে নিচে নামার চেষ্টা করছে, আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমাদের ছাদের ঘরের উত্তরের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। জাতিসংঘের কর্মচারীদের ঢাকা থেকে অপসারণের জন্য ওই চেষ্টা। কিন্তু ভারতীয় বিমান বোমা ফেলে রানওয়েটা বেশ ভালো জখম করে রেখেছে। সকাল থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করে প্লেনগুলো নামল, খানিক পরে উঠেও গেল। ওরা উড়ে চলে যাবার পরপরই ফটাফট দুটো বোমা রানওয়েতে মেরে দিয়ে গেল ভারতীয় প্লেনগুলো।

আরো ভালো করে দেখার জন্য সিঁড়িঘরের ছাদের টঙে জামী একবার উঠেছিল। ওখানে উঠলে এলিফ্যান্ট রোডের বুকটাও দেখা যায়। জামী নেমে এসে বলল, 'আচ্ছা মা, সারাদিন কারফিউ অথচ এ্যাতো মাইক্রোবাস যাচ্ছে কেন রাস্তা দিয়ে? এগুলো তো মিলিটারি গাড়ি নয়।'

১৩ ডিসেম্বর
সোমবার ১৯৭১

আজ আটটা-দুটো কারফিউ নেই। আমার বাজার ও রান্না দুই-ই সারা আছে, তবু শরীফের কথামত আরো চাল, ডাল, লবণ, তেল, বিস্কুট ইত্যাদি কেনার জন্য বাজারে বেরুলাম। শরীফ গাড়ি নিয়ে অফিসে গেল, জামী বাবার কাছে থাকল, আমি লুলুকে নিয়ে প্রথমে মা'র বাসায় যাবার জন্য বেরিয়ে দেখি রিকশা পাওয়া মুশকিল। সব রিকশাই বোঁচকা-বুঁচকি-সুইকেসসহ যাত্রী নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। কোথায়

ছুটছে, কে জানে। বেশ খানিকটা হেঁটে একটা খালি রিকশা পেলাম। ওটাকে আর ছাড়লাম না।

মা'র বাসায় গিয়ে দেখি ওঁর খালি একতলাটায় লালুর বান্ধবী আনোয়ারা সপরিবারে এসে উঠেছে। ওরা পোস্তগোলার দিকে থাকে, ওখান থেকে ভয় পেয়ে এ পাড়াতে চলে এসেছে। ওদের দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। যাক মা'র জন্য আমাকে আর অত ভাবনা করতে হবে না।

ওই রিকশা নিয়েই বাজার সেরে বাসায় আসতে আসতে বারোটা। যদিও ফ্রিজে রান্না করা মাছ-তরকারি আছে, তবু আরো মাছ-গোশত্ কিনে এনেছি। আবার কখন চব্বিশ ঘণ্টার কারফিউ দেয়, কে জানে। রান্নাঘরে তিনটে চুলো ধরিয়ে গোশত, মাছ আর ভাত বসালাম। একটু পরে শরীফ এলো অফিস থেকে। রান্নাঘরে একবার মাত্র উঁকি দিয়েই ছাদে চলে গেল। দেখেই আমার রাগ হল। চেঁচিয়ে জামীকে ডেকে বললাম, 'দাদাকে গোসলখানায় নিয়ে যাও। গোসল হলে ভাত খাওয়াও। খবরদার এখন ছাদে যাবে না। খুনোখুনি হয়ে যাবে তাহলে।'

দুপুরে টেবিলে খেতে বসে আমি একটাও কথা বললাম না। ওরাও সব চুপ। দেড়টা বেজে গেছে। দুটোয় কারফিউ শুরু। খেয়ে উঠেই লুলু চলে গেল।

আমি দু'হাতে ডাল ও গোশতের বাটি তুলে প্যান্ট্রিতে রেখে আবার এঘরে আসতেই দেখি, রেডিও বগলে শরীফ গুটিগুটি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। তার পিছু পিছু জামী। দিনে দিনে ওদের স্বার্থপরতা বাড়ছে। আগে তবু নিচে থাকত, সাইরেন বাজলে কিংবা প্লেনের শব্দ পেলে তখন দুদ্দাড় উঠে যেত এখন তাও করে না। আগে থেকেই উঠে গিয়ে বসে থাকে। দাঁত কিড়মিড় রাগের মধ্যেই হঠাৎ খেয়াল হল আরে! আমিই তো শরীফকে বলেছি সব সময় অমন দুদ্দাড় করে জোরে সিঁড়ি না ভাঙতে—ভাত খাওয়ার পর তো নয়ই। ওতে শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

একা একাই হেসে ফেললাম। কি যে ছেলে মানুষের মত রাগ করি। যুদ্ধের টেনশান আমারও মন মাথায় ঢুকে গেছে দেখছি।

তাছাড়া শরীফেরও তো কষ্ট কম নয়। আগস্ট মাসে পাক আর্মি ওর ওপর যে টর্চার করেছিল, তারপর থেকে ওর শরীরটা আর আগের মত নেই। যদিও অফিস করছে, আমার সঙ্গে পাগলা বাবার বাসায় যাচ্ছে, টেনিস খেলছে, শত্রুর নাকের ডগায় বসে বিপজ্জনক কাজ-কারবারের বিলি বন্দোবস্ত চালিয়ে যাচ্ছে, তবু ক্রমাগত ওঁর ওজন কমে যাচ্ছে। আজকের দুপুরে খাবার সময় ওর মুখটা খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে দোতলায় উঠে বাথরুমে ঢুকলাম। দু'দিন গোসল করা হয় নি, গোসলটা সেরেই ছাদে রোদে গিয়ে বসবো। যদিও সব ব্যবস্থা নিচেই, তবু নিজের বাথরুমে গোসল না করলে আমার তৃপ্তি হয় না। তাই প্লেনের কড়কড়ানি থাকলেও সেটা খানিকক্ষণের জন্য উপেক্ষাই করি।

বেডরুমে আমাদের ডবল খাটে ছোবড়ার জাজিম উদোম হয়ে পড়ে রয়েছে। ওপরের পাতলা তোষক, চাদর, বালিশ, সব নিচে। আজ ভোরে ফজরের নামাজের পরে আমরা দু'জনে খানিকক্ষণের জন্য এই খসখসে ছোবড়ার গদির ওপর এসে শুয়েছিলাম।

গোসল সেরে বেডরুমে পা দিয়েই চমকে গেলাম। শরীফ ছোবড়ার গদির ওপরে এলোমেলোভাবে উবুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। ছুটে ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'কি হয়েছে? এখানে এমনভাবে শুয়ে কেন?'

শরীফ খুব আস্তে বলল, 'বুকে ব্যথা করছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না।'

পিঠে হাত দিয়ে দেখলাম ঘামে গেঞ্জি-সার্ট ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। ওগুলো খুলে গা মুছিয়ে শুকনো জামা পরিয়ে দিলাম। তারপর ফোন তুলে ডাঃ এ. কে. খানকে ডাকলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে চলে এলেন।

স্টেথেস্কোপ দিয়ে শরীফকে পরীক্ষা করতে করতে জিগ্যেস করলেন, 'পা ঝিনঝিন করছে কি? ঘাম হয়েছিল?'

শরীফ বলল, 'পা ঝিনঝিন করছে।'

আমি বললাম, 'ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছিল। এই দেখুন আবার ঘামছে।

এ. কে. খানের মুখ গম্ভীর হলো। ব্যাগ থেকে একটা অ্যামপুল বের করে শরীফকে ইনজেকশান দিলেন। তারপর বললেন, 'এটা ওর প্রথম হার্ট অ্যাটাক। এটার জন্য যে ওষুধ দরকার, তা আমার কাছে ছিল, দিয়েছি। কারো কারো দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক খুব তাড়াতাড়ি হয়। সে রকম হলে আমার কাছে আর ওষুধ নেই। সুতরাং সময় থাকতে হাসপাতালে রিমুভ করাই ভালো।'

বাঁ পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ডাঃ রশীদ পিজি-র সুপারিন্টেন্ডেন্ট। ওঁকে ফোন করে পি.জি.তে শরীফের ভর্তির ব্যবস্থা এবং এম্বুলেন্সের জন্য অনুরোধ করলাম।

কে জানে ক'দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। এ. কে. খান বললেন, 'কিছু কাপড়জামা, বিস্কুট, এক বোতল পানি, মোমবাতি, টর্চ এগুলো গুছিয়ে সঙ্গে নিন।'

শরীফ বলল, 'বাঁকা আর মঞ্জুরকে ফোন করে খবরটা দাও। বাঁকা কিন্তু উয়ারীতে থাকছে না। ওকে অফিসের তিনতলার ফোনে পাবে।'

ফোন ঘুরালাম। মঞ্জুরের ফোন এনগেজড, বাঁকার ফোন কেউ ধরছে না। এম্বুলেন্স এসে গেছে। এ. কে. খানও আমাদের সঙ্গে হাসপাতালে যাবেন বলছেন। সানু এসে রাতে এ বাড়িতে থাকবে। কারণ বাবা বেশি বুড়ো, অথর্ব। আর জামী ছেলেমানুষ। রাতে আবার যদি কিছু হয়, জামী একা সামাল দিতে পারবে না।

এখন বিকেল পাঁচটা। এলিফ্যান্ট রোডের নির্জন রাস্তা দিয়ে এম্বুলেন্স ছুটে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত চারদিক ঢেকে ফেলেছে। এরই মধ্যে পশ্চিম আকাশের লালচে রঙটা কেমন যেন ভয়াবহ দেখাচ্ছে। চারদিকে ফুটফাট শব্দ হচ্ছে—বন্দুকের, গ্রেনেডের। মাঝে-মাঝে ঠাঠাঠাঠা—মেশিনগানের। প্লেনের আনাগোনা কেন জানি খানিকক্ষণ নেই বললেই চলে। মাঝে-মাঝে জীপ বা মাইক্রোবাস হুশ করে চলে যাচ্ছে।

শরীফকে পি.জি.র তিনতলায় ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের সামনে তোলা হয়েছে। ভেতরে বেড রেডি করা হচ্ছে, শরীফ বারান্দার মেঝেয় স্ট্রেচারের ওপর শুয়ে। তার বাঁ পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে আমি তার হাত ধরে রয়েছি। ডান পাশে দাঁড়িয়ে এ. কে. খান আর পি.জি.র ডিরেক্টর প্রফেসর নুরুল ইসলাম।

প্রফেসর ইসলাম আমাদেরও বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচিত। উনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বলে দিচ্ছেন : ধোপার ধোয়া চাদর যেন বের করে পাতা হয়, কম্বল যেন পরিষ্কার দেখে দেওয়া হয়। কোনদিক দিয়ে যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।

ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডের ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ড বয়দের স্পেশাল কেয়ার নেবার নির্দেশ দিয়ে প্রফেসর নুরুল ইসলাম দোতলায় নেমে গেলেন। দোতলার কেবিনগুলোতে পি.জি.র অনেক ডাক্তার সপরিবারে এসে উঠেছেন। প্রফেসর ইসলামও তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে একটা কেবিনে আছেন।

দেখতে দেখতে গোধূলির আবছায়া মুছে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ইনটেন্‌সিভ্‌

কেয়ার ওয়ার্ডের কাচের জানালাগুলো বিরাট বিরাট—সব দরজার মাপের। কোন কাচে কাগজ লাগানো নেই, পর্দাগুলো টেনে ঠিকমত ঢাকা যায় না—কোনখানে পর্দাও নেই।

শরীফকে তার পরিষ্কার চাদরপাতা বেডে তোলা হয়েছে। এর মধ্যেও শরীফ আমাকে বলছে, 'মঞ্জুরকে ফোন করে খবরটা দাও।' এ. কে. খান বলছেন, 'শরীফ একদম কথা বলবে না। চুপচাপ রেস্টে থাক।'

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি আমার ব্যাগ থেকে একটা মোমবাতি বের করে জ্বালাতেই পি.জি.র কর্তব্যরত ডাক্তার হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'বন্ধ করুন। নিচের গার্ডরা দেখলে চিল্লাচিল্লি করবে।'

আমি হকচকিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বললাম, 'কিছু যে দেখা যাচ্ছে না, কাজ করবেন কি করে?'

'টর্চ আছে? টর্চ থাকলে দিন।' অন্য একজন ডাক্তার বললেন, 'গার্ডগুলো এমন হারামী না, বাতি দেখলেই ওপর মুখ করে গুলি ছুড়ে বসে।'

শরীফ বলল, 'আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অক্সিজেন...'

'অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে গেছে। বুঝলেন, অক্সিজেনের একটু ঘাটতি আছে।'

এখন প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। এখনো অক্সিজেন এল না। শরীফের শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ডাঃ এ. কে. খান ওর নাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। শরীফ বলল, 'অক্সিজেনের জন্য মঞ্জুরকে ফোন কর। ও যোগাড় করে দিতে পারবে। ডা. এ. কে. খান বললেন, 'কথা বোলো না। একদম চুপচাপ রেস্টে থাক।'

অক্সিজেন সিলিণ্ডার একটা নিয়ে এল ওয়ার্ড বয়। কিন্তু সিলিণ্ডারের মুখের প্যাঁচটা খোলার রেঞ্চটা আনে নি।

'রেঞ্চ কই? রেঞ্চ আনো, শিগরির।' একজন ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন।

'রেঞ্চ তো স্যার দুইতলায় নিয়া গেছে।'

হাত দিয়ে সিলিণ্ডারের মুখের প্যাঁচটা ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কর্তব্যরত ডাক্তার আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ ওয়ার্ডের রেঞ্চ কেন দোতলায় দেওয়া হয়েছে? দৌড়াও, রেঞ্চ নিয়ে এস।'

অন্ধকারে সাবধানে হোঁচট বাঁচিয়ে ওয়ার্ড বয়টা দৌড়াল।

শরীফ খুব ছটফট করছে। এ. কে. খান তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বারবার মৃদুকণ্ঠে বলছেন, 'একটু ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকো শরীফ। একদম কথা বলো না, নোড়ো না। এখনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

শরীফ ছটফটানির মধ্যেই আবার জিগ্যেস করল, 'মঞ্জুরকে ফোন করতে পেরেছ।'

আমার কান্না পাচ্ছে। এই অন্ধকারে কোথায় ফোন কোনদিকে যাব? আমার আনা টর্চটা নিয়েই ডাক্তাররা কি কি যে করছে, কিছুই বুঝি না।

একজন ডাক্তার হঠাৎ এ. কে. খানকে বলল, 'স্যার পেশেন্টকে পাশের ছোট ঘরটাতে নিয়ে যাই, ওখানে জানালা নেই, মোমবাতি জ্বালানো যাবে। ওখানে ডিফিব্রিলেটার মেশিনটা আছে।'

অতএব, আবার শরীফকে স্ট্রেচারে তুলে টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে পাশের ছোট ঘরে নেওয়া হল। ঘরটা আসলে অন্য একটা ঘরের কিছুটা অংশ পার্টিশন করা—সরু অংশ। একটি মাত্র বেড, বেডের পাশে একটা মেশিন। দু'পাশে এত কম জায়গা দু'তিনজন লোক কোনমতে দাঁড়াতে পারে। এখানে এসে একটা মোমবাতি জ্বালালাম।

শরীফকে বেড়ে তোলা হল। আমি ফোনের খোঁজে দরজা দিয়ে বারান্দায় এসে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দেখে হতাশ হয়ে আবার ঘরের ভেতর ঢুকে তাকিয়েই আঁতকে উঠলাম। পি.জি.র কর্তব্যরত ডাক্তার দু'জন শরীফের বেডের দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতে করে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিচ্ছেন। আমি এ. কে. খানকে জিগ্যেস করলাম, 'মেশিনটা? মেশিনটা লাগাচ্ছেন না কেন?'

শরীফের বুকে হাতের চাপ দিতে দিতে একজন ডাক্তার বললেন, 'লাগাব কি করে? হাসপাতালের মেইন সুইচ বন্ধ। ব্ল্যাক আউট যে।'

'হাসপাতালের মেইন সুইচ বন্ধ রেখে ব্ল্যাক আউট? এমন কথা তো জন্মে শুনি নি। তাহলে মরণাপন্ন রোগীদের কি উপায় হবে? লাইফসেভিং মেশিন চালানো যাবে না?'

১৪ ডিসেম্বর
মঙ্গলবার ১৯৭১

শরীফকে বাসায় আনা হয়েছে সকাল দশটার দিকে। মঞ্জুর, মিকি—এরা দু'জনে ওদের পরিচিত ও আত্মীয় পুলিশ অফিসার ধ'রে গাড়িতে আর্মড পুলিশ নিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা পিকআপ যোগাড় করে হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।

সকালবেলায় প্লেনের আনাগোনা একটু কমই ছিল। আজ কারফিউ ওঠে নি। তবু আমাদের গলিটা কানা বলে, খবর পেয়ে সব বাড়ির লোকেরা এসে জড়ো হতে পেরেছেন। খবর পেয়ে আনোয়ার তার বোর্ড অফিসের মাইক্রোবাসটা অনেক ঝঞ্ঝাট করে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে এসেছে শেলী আর সালাম। ওই মাইক্রোবাস পাঠিয়ে মা আর লুলুকে আনা হয়েছে ধানমণ্ডির বাসা থেকে। মঞ্জুর তার গাড়িতে কয়েকটা ট্রিপ দিয়ে এনেছেন বাঁকাকে, ফকিরকে, আমিনুল ইসলামকে। ডাব্লিউ. আর. খান যোগাড় করে দিয়েছেন কাফনের কাপড়।

বাড়ির পাশের খালি জায়গাটাতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক দুপুর সাড়ে বারোটায় জানাজায় শামিল হলেন। চার-পাঁচটা গাড়িতে করে জনাকুড়ি লোক গোরস্থানে গেলেন। সানু, খুকু, আর মঞ্জু আমার কাছে রইল। বাবা একেবারে নির্বাক হয়ে তাঁর ইজিচেয়ারে পড়ে রয়েছেন।

দেড়টা থেকে হঠাৎ প্লেনের কড়কড়ানি বেড়ে গেল। বারেবারে খুব নিচু দিয়ে প্লেন এলিফ্যান্ট রোড এলাকার ওপর ভীষণ শব্দ করে উড়ে যেতে লাগল। যারা গোরস্থানে গেছে তাদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। দুটোর মধ্যে সবাই ফিরে এলেন। জামীকে পৌঁছিয়ে আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে যে যার বাসায় চলে গেলেন। আমার দুই ভাগিনী ইভা ও সুরত, জামীর বন্ধু আলী, মা আর লুলু এ বাসায় রয়ে গেল।

গত রাত থেকে কিছু মুখে তুলতে পারি নি, আলসারের ব্যথা নিয়ে নিঃসাড়ে বিছানায় পড়েছিলাম। ওধারে মা বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদছেন, লালু বাবার হাত ধরে মৃদুকণ্ঠে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। জামী এসে সামনে দাঁড়িয়ে হুহু করে কেঁদে উঠে বলল, 'মা আমার আর যুদ্ধ করা হল না।'

আমি উঠে বসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, ও কান্নার সঙ্গে চিৎকার করে হাত-মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ওদের দেখে নেব। ওরা ভাইয়াকে কেড়ে নিয়েছে, ওরা আব্বুকে খুন করেছে, ওদের ছেড়ে দেব না।'

আলী এসে জামীকে ধরে ওপাশে নিয়ে গেল, মা কান্না থামিয়ে ওর কাছে গেলেন।

হঠাৎ ভীষণ কড়কড় শব্দে প্লেন উড়ে গেল, মনে হল যেন আমাদের বাড়ির ছাদ ধসিয়ে দিয়ে গেল। তার পরপরই ভীষণ আর্তনাদে চারদিক ছেয়ে গেল। আমরা সবাই চকিত হয়ে উঠলাম। কি ব্যাপার! আশপাশে কোথাও বোমা পড়ল নাকি?

সকাল থেকেই বহুজনের মুখে গুজব শুনছি নিয়াজী নাকি এলিফ্যান্ট রোডের একটা হলুদ রঙের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। আরো শুনছি, মোহসীন হলে, ইকবাল হলে, সলিমুল্লা হলে পাক আর্মিরা পজিশান নিয়েছে। তাই এ পাড়ায় এত ঘনঘন, এত নিচু দিয়ে ইন্ডিয়ান প্লেন উড়ছে।

একটু পরেই আমাদের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ভয়ে শিটিয়ে গেলাম। কিন্তু তা মুহূর্ত মাত্র। ধাক্কার সঙ্গে বহু কণ্ঠের কান্না ও কথার শব্দ ভেসে আসতেই আমরা সবাই দৌড়ে দরজার দিকে গেলাম। জামীর দরজা খুলতেই দেখি বারান্দায় রক্তাক্ত দেহ এলিয়ে পড়ে আছে সামনের বাঁদিকের বাড়ির আকবর, ওকে ঘিরে ওদের বাড়ি সবাই—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে মাতম করছে। ওদের পাশের বাড়ির আমির হোসেনরাও সবাই ভয়-বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে।

কান্না, আর্তনাদ এবং টুকরো কথার ভেতর দিয়ে ঘটনা জানা গেল। আকবরদের বাড়িতে বোমা পড়েছে। ওরা প্লেনের শব্দ শুনেই ছাদে দৌড়েছিল, বোমা পড়বে ভাবতে পারে নি। বোমার আঘাতে আকবরদের বাড়ির পেছনের অংশ এবং আমির হোসেনদের বাড়ির কোণা ধসে গেছে। দুটো ছোট ছেলেমেয়ে ছাদে মারা গেছে, আকবর গুরুতর জখম। ও বাড়ির সবাই আকবরকে তুলে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

জামী আর আলী রক্তাক্ত আকবরকে তুলে ভেতরে এনে ডিভানটার ওপর শুইয়ে দিল। বাকিরা কেউ সোফায়, কেউ চেয়ারে, কেউ মেঝেতে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। আমার দু'দিনের না-খাওয়া শরীরে কোথা থেকে জোর এল জানি না। বাড়িতে তিনজন সদ্য পাস করা ডাক্তার ইভা, সুরত ও খুকু। আমি ওদেরকে বললাম, 'তোরা প্রথমে দেখ কার কতটা জখম হয়েছে। আমি মেডিক্যালে ফোন করছি এম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য।' ভাগ্যক্রমে একবার ডায়াল করেই মেডিক্যাল হাসপাতাল পেয়ে গেলাম। বাসার ঠিকানা ও ডিরেকশান দিয়ে এম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলাম।

আকবর ছাড়াও দু'চারজনের জখম বেশ গুরুতর। যারা জখম হয় নি তারাই বেশি কান্নাকাটি করছে। এক শিশি ভ্যালিয়াম-টু ইভার হাতে দিয়ে বললাম, 'প্রত্যেককে পাইকারি হারে দুটো করে খাইয়ে দাও। ওদের একটু শান্ত হওয়া দরকার। খুকু তুমি পানির জগ আর গ্লাস নাও।'

ভ্যালিয়াম খাওয়ানো শেষ হলে খুকু, ইভা ও সুরতকে কিছু তুলো, আয়োডিন, ডেটল, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি দিয়ে বললাম, 'যতটা পার ফার্স্ট এইড দাও।'

সাড়ে চারটে বাজে। আরেকটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি, আমির হোসেন, বাবলু, সাজ্জাদ ও আরো কয়েকজনকে বললাম, 'তোমরা প্লেনের শব্দ কমলেই দৌড়ে বাড়ি গিয়ে রান্নাকরা খাবার, বাচ্চার দুধের টিন, চালের টিন, আটার টিন, একএক করে নিয়ে এসো। রাতে মেঝেয় শোয়ার মত লেপ-তোষকও নিয়ে এসো।'

গেস্টরুমের তালাটা ঠিকমত লাগানো আছে কিনা, একফাঁকে দেখে এলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে রসদ জমিয়েছি, তা কিছুতেই এখন খরচ করব না। তাছাড়া ওদের ঘরে তো আছেই। ওগুলো নষ্ট করার দরকার কি?

পাঁচটার সময় এম্বুলেন্স এল। আকবরসহ বাদবাকি আহত সবাই এবং তাদের দেখাশোনার জন্য সুস্থ কয়েকজন এম্বুলেন্সে চড়ে মেডিক্যাল হাসপাতালে চলে গেল।

দশ মিনিট পরেই আরেকবার ভীষণ শব্দে চারপাশ কেঁপে উঠল। এবার মনে হল আমাদের পেছন দিকের গলিতে বোমা পড়েছে। ফট্ করে কারেন্ট চলে গেল। ফোন তুলে দেখি ওটাও ডেড! ব্যস, এবার ষোলকলা পূর্ণ হল। ফ্রিজ চলবে না, পানির পাম্প চলবে না। কোরোসিন ফুরোলে ইলেকট্রিক হিটার দিয়ে কাজ সারা যাবে না। কারফিউর সময় ফোনটাই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। এটাও গেল। এখন সত্যি সত্যি কবরখানা।

সারা মেঝেজুড়ে বিছানা পাতা হয়েছে। সিঁড়ির ঠিক নিচে খাটে প্রথমে বাবা, তারপর জামী ও আলী। নিচে মেঝেয় খাট ঘেঁষে আমি, ইভা, সুরত, মা, লালু। আমাদের পরে প্রথমে আকবরের ভাবীর মেয়েরা, তারপর ওদের বাড়ির পুরুষরা। ওদের পরে আমির হোসেনদের বাড়ির পুরুষরা, তারপর ওদের বাড়ির মেয়েরা। ওদের বিছানা ঘরের ওপাশের দেয়ালে খাবার টেবিলের পা পর্যন্ত গেছে।

রাত দুটোর সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কারা যেন ডাকাডাকি করছে জামীর নাম ধরে। উঠে টর্চ জ্বালালাম, জামী জানালার কাছে গিয়ে একটা পাল্লা খুলল। আমাদের বাড়ির একদম নাক বরাবর সামনের বাড়ির হোসেন সাহেবের গলা। ওঁদের পেছনের বাড়ির কোণায় আগুন জ্বলছে। কি করে আগুন ধরেছে কে জানে। কিন্তু এখন যদি ওপর থেকে দেখে কোন প্লেন বোমা ফেলে?

আমি বললাম, 'জামী আলী বাবলু আর সাজ্জাদ তোমরা গরম জামা পরে নাও। হোসেন সাহেবের বাড়ির ছাদে উঠে দেখবে কিভাবে আগুনটা নেভানো যায়।'

মা'র গলা শোন গেল, 'এর মধ্যে আবার জামী কেন? ও ছোট ছেলে, ওর যাবার দরকার নেই।' বাবলু সায় দিল 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জামীর যাবার দরকার নেই।' আমি ধমকের সুরে বললাম, 'না, জামী অবশ্যই যাবে।'

আমি গেস্টরুম থেকে মোটা দড়ির একটা বান্ডিল আর মাঝারি একটা বালতি এনে রাখলাম। ওরা গরম কাপড় পরে দড়ি-বালতি নিয়ে হোসেন সাহেবের বাড়ি গেল।

১৫ ডিসেম্বর
বুধবার ১৯৭১

আজ হোসেন সাহেব এবং ওঁর নিচতলার ভাড়াটে আসলাম সাহেব সপরিবারে আমাদের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন ছেলে-বুড়ো মিলে পঁয়তাল্লিশজন লোক আমার বাসায়।

আজ সারাদিন কান ঝালাপালা করে রকেটিং এবং স্ট্রেফিং চলেছে। সারাদিন কানে তুলো, ঘাড়ে লেপ, মাথা বিছানায় গোঁজা।

আজ সাড়ে আটটা-সাড়ে বারোটা কারফিউ নেই। খবর পেলাম গতকাল পেছনের গলির এক বাড়িতে বোমা পড়ে শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে মারা গেছে। ঐ বোমার আঘাতেই গতকাল ইলেকট্রিক এবং টেলিফোনের তারও ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে।

আজ সারাদিন কোলকাতা রেডিও খোলা আছে। বারবার শুনতে পাচ্ছি—পাক আর্মিকে সারেন্ডার করার নির্দেশ। এজন্য আজ বিকেল পাঁচটা থেকে আগামীকাল সকাল নয়টা পর্যন্ত আকাশযুদ্ধ বন্ধ থাকবে—বলা হচ্ছে।

এই রকম মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণের মধ্যেই সারা সকাল ধরে এসেছে ইলা, বাদশা, আতা ভাই, কলিম, নজলু, হুদা, রেণু, মঞ্জুর, আতিক, হামিদা, জুবলী, রফিক, মাসুমা। সবাই এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর আমি সবাইকে বকছি এরকম স্ট্রেফিংয়ের মধ্যে কেন বেরিয়েছে? মাথার ওপর প্লেনের শব্দ হলেই ওদেরও দু'হাতে কান চেপে বিছানায় মাথা গুঁজে বসতে বলছি। মঞ্জুর বললেন যে গভর্নমেন্ট হাউসে হেভি বম্বিং হয়েছে। বাঁকাকে তাই মতিঝিলের অফিস থেকে তুলে ধানমণ্ডিতে তার ভাগনে প্রিন্সের বাড়িতে দিয়ে এসেছেন। গভর্নর মালেক হোটেল ইন্টারকনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ইন্টারকনকে এখন ইন্টারন্যাশনাল জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

লুলু গত দু'দিন আসতে পারেনি। আজ এগারোটার দিকে এসে ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না মাত্র দেড় দিনের ব্যবধানে শরীফের হার্ট এটাক, মৃত্যু, জানাজা এবং দাফন পর্যন্ত শেষ! বিছানায় মাথা গুঁজে অবোধ শিশুর মত কাঁদতে লাগল সে।

এর মধ্যে রান্নাঘরের দিকটাও সামলাতে হচ্ছে। ছয়টি বাড়ির ছয়টি বিভিন্ন পরিবারের পঁয়তাল্লিশজন লোকের রান্নার দায়িত্ব কেউই আগ বাড়িয়ে নিচ্ছে না। অগত্যা লক্ষৌয়ি আদব-কায়দা বিসর্জন দিয়ে আমাকেই আগ বাড়াতে হল। একেবারে নাম ধরে ধরে ডেকে সকালের নাশতা ও চা বানানো থেকে শুরু করে দুপুর ও রাতের রান্না ও পরিবেশনের ডিউটি বন্টন করে চার্ট বানিয়ে দিলাম।

এই ডামাডোলের মধ্যে বাবার জন্য স্পেশাল রান্না করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জু সমাধান করে দিল এ সমস্যার। ওদের বাসা থেকে বাবার জন্য সকালে নরম রুটি, দুপুরে নরম ভাত, কম মশলার মাছের ঝোল, এসব করে বয়ে এনে বাবাকে খাওয়াচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সকাল ন'টা পর্যন্ত যে আকাশযুদ্ধ বিরতির কথা ছিল, সেটা বিকেলে তিনটে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুপুর থেকে সারা শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। পাক আর্মি নাকি সারেণ্ডার করবে বিকেলে। সকাল থেকে কলিম, হুদা, লুলু যারাই এল সবার মুখেই এক কথা। দলে দলে লোক জয় বাংলা ধ্বনি তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কারফিউ উপেক্ষা করে। পাকসেনারা, বিহারিরা সবাই নাকি পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে পথেঘাটে এলোপাতাড়ি গুলি করে বহু বাঙালিকে খুন-জখম করে যাচ্ছে। মঞ্জুর এলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, গাড়ির ভেতরে বাংলাদেশের পতাকা বিছিয়ে। তিনিও ঐ এক কথাই বললেন। বাদশা এসে বলল, এলিফ্যান্ট রোডের আজিজ মোটরসের মালিক খান জীপে করে পালাবার সময় বেপরোয়া গুলি চালিয়ে রাস্তার বহু লোক জখম করেছে।

মঞ্জুর যাবার সময় পতাকাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'আজ যদি সারেণ্ডার হয়, কাল সকালে এসে পতাকাটা তুলব।'

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ.কে. খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

জেনারেল নিয়াজী নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আজ বিকেল তিনটের সময়।

যুদ্ধ তাহলে শেষ? তাহলে আর কাদের জন্য সব রসদ জমিয়ে রাখব?

আমি গেস্টরুমের তালা খুলে চাল, চিনি, ঘি, গরম মসলা বের করলাম কুলখানির জর্দা রাঁধবার জন্য। মা, লালু, অন্যান্য বাড়ির গৃহিণীরা সবাই মিলে জর্দা রাঁধতে বসলেন।

রাতের রান্নার জন্যও চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এখান থেকেই দিলাম। আগামীকাল সকালের নাশতার জন্যও ময়দা, ঘি, সুজি, চিনি, গরম মসলা এখান থেকেই বের করে রাখলাম।

১৭ ডিসেম্বর
শুক্রবার ১৯৭১

আজ ভোরে বাসায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হল। মঞ্জুর এসেছিলেন, বাড়িতে যাঁরা আছেন, তারাও সবাই ছাদে উঠলেন। ২৫ মার্চ থেকে ফ্ল্যাগপোলটায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আবার নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেই ফ্ল্যাগপোলটাতেই আজ আবার সেদিনের সেই পতাকাটাই তুললাম।

সবাই কাঁদতে লাগলেন। আমি কাঁদতে পারলাম না। জামীর হাত শক্ত মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গত তিনদিন থেকে জামীকে নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তায় আছি। শরীফের মৃত্যুর পর থেকে ও কেমন যেন গুম মেরে আছে। মাঝে-মাঝেই খেপে ওঠে, চেঁচামেচি করে, ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়, বলে পাঞ্জাবি মারবে, বিহারি মারবে, আব্বুর হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ওকে যত বোঝাই এখন আর যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবি মারলে সেটা হত শত্রুহনন, এখন মারলে সেটা হবে মার্ডার—ও তত ক্ষেপে ওঠে। কি যে করি! ওর জন্য আমিও কোথাও বেরুতে পারছি না। তাছাড়া এই যে গুষ্ঠি রয়েছে বাড়িতে! গত রাতেই হোসেন সাহেব ও আসলাম সাহেবরা নিজেদের বাড়িতে চলে গেছেন। কিন্তু বাকিরা নড়তে চাইছে না। কি এক দুর্বোধ্য ভয়ে এই ঘরের মেঝে আঁকড়ে বসে আছে!

আত্মীয়-বন্ধু পরিচিতজন কত যে আসছে সকাল থেকে স্রোতের মত। তাদের মুখে শুনছি রমনা রেসকোর্সে সারেণ্ডারের কথা, দলে দলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় আসার কথা, ইন্ডিয়ান আর্মির কথা, লোকজনের বিজয়োল্লাসের কথা। এরই মধ্যে রক্ত-হিম করা একটা কথাও শুনছি। মুনীর স্যার, মোফাজ্জল হায়দার স্যার, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আলিম চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার এবং আরো অনেকেরই খোঁজ নেই। গত সাত-আটদিনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কারফিউয়ের মধ্যে এঁদের বাসায় মাইক্রোবাস বা জীপে করে কারা যেন এসে এঁদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে পড়ল গত সাত-আটদিনে যখন-তখন কারফিউ দেওয়ার কথা। কারফিউয়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে বেসামরিক মাইক্রোবাস ও অন্যান্য গাড়ি চলাচলের কথা। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে উঠল।

বিকেল হতে হতে রায়েরবাজারের বধ্যভূমির খবরও কানে এসে পৌঁছল। বড় অস্থির লাগছে। কি করি? কোথায় যাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। রুমী! রুমী

কি বেঁচে আছে? আমি কি করে খবর পাব? কার কাছে খবর পাব? শরীফ এমন সময়ে চলে গেল? দু'জনে মিলে রুমীর জন্য কষ্ট পাচ্ছিলাম, রুমীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন একাই আমাকে সব করতে হবে, একাই সব কষ্ট বহন করতে হবে।

ফোন ও ইলেকট্রিকের লাইন এখনো ঠিক হয় নি। কে ঠিক করবে? সারা ঢাকার লোক একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে। স্বাধীনতার জন্য হাসি। কিন্তু হাসিটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। এত বেশি রক্তে দাম দিতে হয়েছে যে কান্নার স্রোতে হাসি ডুবে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি জ্বেলে ভূতুড়ে আলোয় জামীকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। তার আগে বাসার সামনে জীপগাড়ী থামবার শব্দ পেয়েছি। উঠে দরজা খুললাম। কাঁধে স্টেনগান ঝোলানো কয়েকটি তরুণ দাঁড়িয়ে। আমি দরজা ছেড়ে দু'পা পিছিয়ে বললাম, 'এসো বাবারা, এসো।'

ওরা ঘরে ঢুকে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিল 'আমি মেজর হায়দার। এ শাহাদত, এ আলম। ও আনু, এ জিয়া ও ফতে আর এই যে চুল্লু।'

হায়দার আর আনু ছাড়া আর সবাইকেই তো আগে দেখেছি।

চুল্লু এতদিন সেন্ট্রাল জেলে ছিল। ওকে জেল থেকে বের করে এনে রুমীর অনুরাগী এই মুক্তিযোদ্ধারা রুমীর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আমি ওদেরকে হাত ধরে এনে ডিভানে বসলাম। আমি শাহাদতের হাত থেকে চাইনিজ স্টেনগানটা আমার হাতে তুলে নিলাম। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। তারপর *সেটা জামীর হাতে দিলাম। চুল্লু মাটিতে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসল। আমার দুই* হাত টেনে তার চোখ ঢেকে আমার কোলে মাথা গুঁজল। আমি হায়দারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জামী পারিবারিক অসুবিধার কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারে নি। ও একেবারে পাগল হয়ে আছে। ওকে কাজে লাগাও।'

মেজর হায়দার বলল, 'ঠিক আছে জামী, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার বডিগার্ড হলে। এক্ষুণি আমার সঙ্গে আমার অফিসে চল, তোমাকে একটা স্টেন ইস্যু করা হবে। তুমি গাড়ি চালাতে পার?'

জামী সটান এ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে ঘটাং করে এক স্যালুট দিয়ে বলল, 'পারি।'

'ঠিক আছে, তুমি আমার গাড়িও চালাবে।'

জামীর পাশেই আলী দাঁড়িয়ে ছিল। জামী বলল, 'স্যার, আমার বন্ধু আলী—'

মেজর হায়দার গম্ভীর মুখে বলল, 'ইনফ্যাক্ট আমার দু'জন বডিগার্ড দরকার— তোমার বন্ধুকেও অ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া গেল। কিন্তু ভেবে দেখ, পারবে কি না। এটা খুব টাফ জব। চব্বিশ ঘন্টার ডিউটি।'

পাঁচদিন পর জামী এই প্রথমবারের মত দাঁত বের করে হাসল,

'আটচল্লিশ ঘন্টার হলেও পরোয়া নেই।'

সমাপ্ত

উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
QAEP

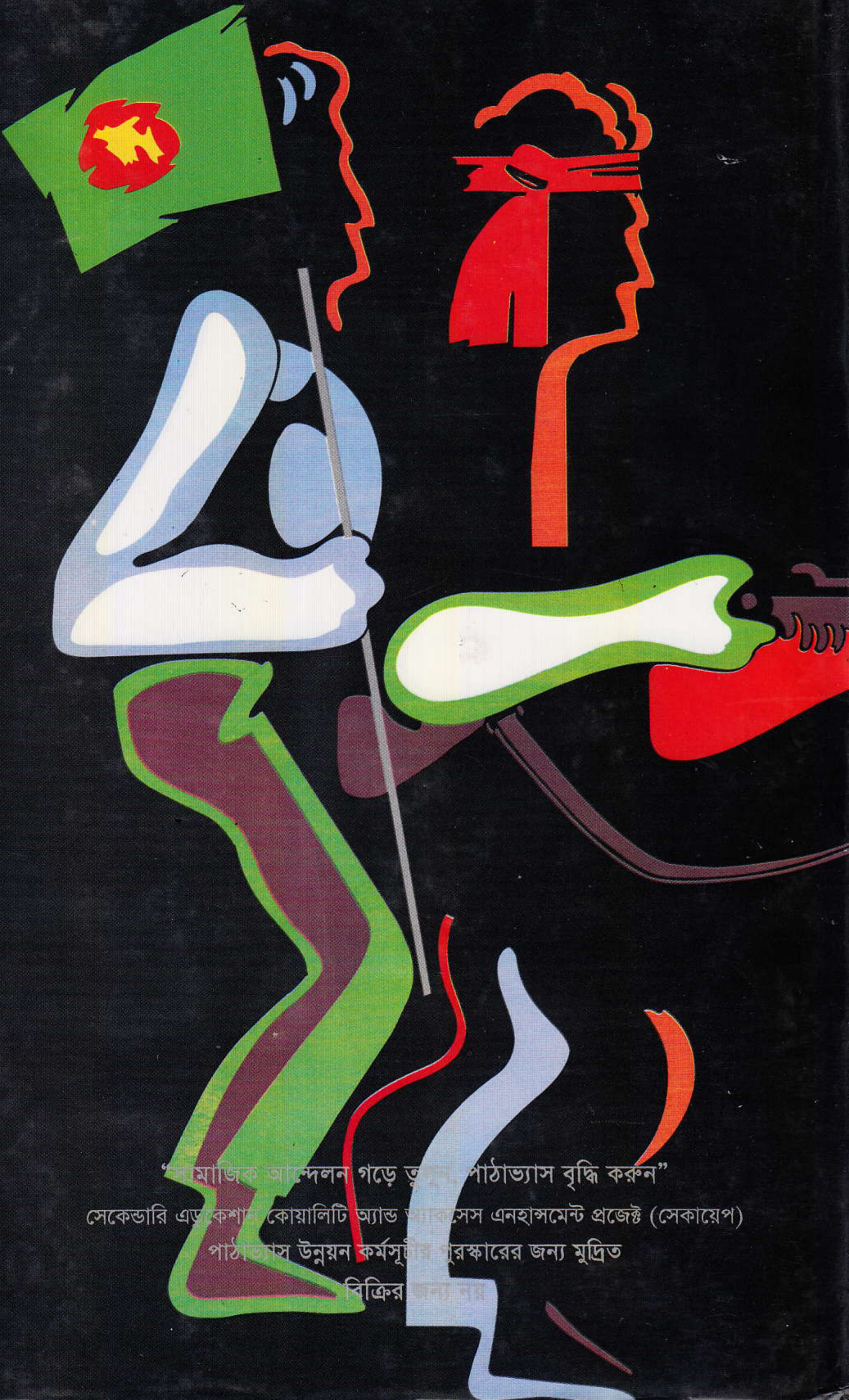

"সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করুন"

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচীর পুরস্কারের জন্য মুদ্রিত

বিক্রির জন্য নয়